ইসলাম ও মুসলিম পারিবারিক জীবন

এম. ফিল. (আরবী) ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষক

আবু নোমান মো. আবদুর রহিম
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
400620

400620

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২০০২ইং

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আবু নোমান মো. আবদুর রহিম "ইসলাম ও মুসলিম পারিবারিক জীবন" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আরবী বিষয়ে এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত। এটি বা এর কোন অংশ অন্য কোথাও কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি বা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

400620

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

৩০/১১/০২

(প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক)
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে "ইসলাম ও মুসলিম পারিবারিক জীবন" শিরোনামে রচিত এই অভিসন্দর্ভ খানা উপস্থাপন করা হল। অভিসন্দর্ভের অধ্যায়, উপধ্যায় বিন্যাস, উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে যার সুচিন্তিত অভিমত ও মূল্যবান পরামর্শে অভিসন্দর্ভকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়েছে, যাঁর যথাযথ নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি সেই সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদ প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি চির ঋণী ও কৃতজ্ঞ এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর ঐকান্তিক উৎসাহ আমাকে এই অভিসন্দর্ভটি দ্রুত প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রেরণা যুগিয়েছে।

আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড.এ.বি.এম.ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী আমাকে বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে দুস্প্রাপ্য তথ্যাদী প্রদান করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রদ্ধেয় অগ্রজ ও শিক্ষক ড. জাফর আহমদ ভূইয়া, চেয়ারম্যান ফার্সী ও উর্দ্দু বিভাগ, ঢাবি, উপ-রেজিষ্ট্রার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আমাকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, আমি তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান তাঁর ব্যক্তিগত বহু মূল্যবান পান্ডুলিপী ও গ্রন্থ সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ব্যাবহার করার সুযোগদান, বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের সন্ধান দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে একান্ত ভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

অনুজপ্রতীম বন্ধু আশরাফুল হক সেতু এবং আমার অনুজ মো. আব্দুল খালেক উপাত্ত সংগ্রহ, অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত, কম্পিউটার কম্পোজ ও অলংকরণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঈমান ও সফলতার সাথে দীর্ঘজীবী করুন।

400620

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী,বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, দারুল ইফতা বাংলাদেশ ও বিভাগীয় সেমিনার অন্যতম। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নানাবিধ সমস্যায়, অন্তরা, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মাঝেও যে সকল বন্ধু বান্ধব, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ ও আপনজনেরা আমার গবেষণা কর্ম চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ।

আবু নোমান মো: আবদুর রহিম
২৫/১১/০২

(আবু নোমান মো. আবদুর রহিম)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

অধ্যায় সমূহ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	ভূমিকা :	১-৬
১ম অধ্যায়:		
	বিবাহ : সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, বিয়ের পূর্বে বর-কনের মতামত গ্রহণ।	৭-২৯
২য় অধ্যায়:		
	একাধিক বিবাহ: একাধিক স্ত্রী গ্রহণ।	৩০-৫৩
৩য় অধ্যায়:		
	পরিবার : পরিচয়, বাস্তবতা, কার্যাবলী।	৫৪-৮৩
৪র্থ অধ্যায়:		
	দাম্পত্য জীবন : স্বামীর কর্তব্য বা স্ত্রীর অধিকার, স্বামীর ক্ষমতা, স্ত্রীর কর্তব্য বা স্বামীর অধিকার।	৮৪-১৫৫
৫ম অধ্যায়:		
	মুসলিম পারিবারিক জীবন : লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন, পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার অধিকার।	১৫৬-১৯৬
	গ্রন্থপঞ্জি:	১৯৭-২১০

ভূমিকা

ইসলাম নিছক কোন ধর্মের নাম নয়, মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও শ্বাশত জীবন ব্যবস্থা। যুগ জিজ্ঞাসার সঠিক সমাধান। ব্যক্তি, পরিবার,সমাজ,রাষ্ট্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়,বরং প্রত্যেক যুগে স্থান,কাল,পাত্রভেদে বর্ণ, গোত্র সকল মানুষের জন্য লেটেষ্ট পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতি বা জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) ও হাওয়াকে দিয়ে এই বিশ্বভূবনে ইসলামী আদর্শের সূচনা করেন। আর মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (স.) এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা বিধান করেন। বর্তমান বিকৃত ব্যক্তি-জীবন, অধ:পতিত পারিবারিক জীবন,বিপর্যস্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সার্বিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মহানবী (স.) এর আগমনের পূর্বে আরব তথা বিশ্ববাসী ছিল এক অন্ধকারময় জীবন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় নিমজ্জিত। যৌবন এবং শক্তিই ছিল যাদের মূলমন্ত্র। সুসংবদ্ধ ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্রীয় জীবন ছিল অকল্পনীয়। ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন, “War, women and wine were the three absorving passing of the Arabs.” নারী পুরুষদের মধ্যে কোন পবিত্র বন্ধন ছিলনা, যত খুশি তত বিবাহ করত এবং ত্যাগ করত। Play grady and play and dry. মাওলানা আকরাম খাঁ বলেন- “The master war very rude with their servents or slaves, they have no own power to do their works and deeds.” মহানবী (স.) মাত্র ২৩ বছরের নিরলস সংগ্রামের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন এক অনুপম কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার। যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রবাহিত হয় শান্তির ফলগুধারা। যার মূল সংবিধান হল মহাগ্রন্থ আল কুরআন । ইসলামী আদর্শ বা শরী'আতের কৌশল হল আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে স্থান,কাল, পাত্রভেদে উপস্থাপন।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার হল মূলভিত্তি, বিবাহের মাধ্যমে যার সূচনা। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, একটি মাত্র সত্তা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জুড়িকে এবং সেই দুইজন থেকেই (বিশ্বময়) ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুলসংখ্যক পুরুষ ও নারী"[১]।

"তিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন"[২]।

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ"[৩]। "তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনিই তোমাদেরকে একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার কাছে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পার"[৪]।

"স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক স্বরূপ, আর তোমরা হচ্ছ তাদের জন্যে পোশাক"[৫]।

"তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা তোমাদের কাছে পরম শান্তি-স্বস্থি লাভ করতে পারে এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও দয়া অনুকম্পাও জাগিয়ে দিয়েছেন"[৬]।

"এবং তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি পানির উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পরে মানুষকে বংশ ও শ্বশুর সম্পর্ক জাতরূপে ধারাবাহিক বানিয়ে দিয়েছেন।"[৭]

"হে মানুষ! আমরা নি:সন্দেহে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদের সজ্জিত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্ররূপে, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার"[৮]। উদ্ধৃত প্রথম আয়াতটি প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে মানবতার আগমনের সূচনা হয়েছিল একজন মাত্র মানুষ দিয়ে। পরে তারই অংশ থেকে তার জুড়ি বা স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন। আর এ দুজনের পারস্পরিক যৌন সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে অসংখ্য নারী পুরুষের অস্তিত্ব লাভ সম্ভব হয়েছে। এতে প্রমাণিত হল যে, মানব বংশ বিস্তার একটি অপ্রতিরোধ্য স্বাভাবিক প্রবণতা।

---

[১] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ৩।
[২] আল কুরআন, সুরা শুরা ৪২ : ১১।
[৩] আল কুরআন, সুরা বাকার ২ : ২২৩।
[৪] আল কুরআন, সুরা আ'রাফ ৭ : ১৮৯।
[৫] আল কুরআন, সুরা বাকারা ২:১৮৭।
[৬] আল কুরআন, সুরা রূম ৩০:২১।
[৭] আল কুরআন, সুরা ফুরকান ২৫: ৫৪।
[৮] আল কুরআন, সুরা হুজরাত ৪৯: ১৩।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক বা যৌনতার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি ও বংশ ধারার স্থায়িত্ব। তৃতীয় আয়াত বলছে যে, স্ত্রী লোক মানব বংশের উৎসস্থল। ক্ষেত বা খামার এবং তাতে চাষাবাদ ও বীজ বপনের লক্ষ্য হচ্ছে ফসল উৎপাদন, বিশেষ একটি ফসলের বংশ বৃদ্ধি ও বংশের ধারা রক্ষা।

এই তিনটি আয়াতে একসাথে প্রমাণিত হল যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দুই লিঙ্গে বিভক্ত এবং এই বিভক্তি উদ্দেশ্যহীন নয়। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বিস্তার লাভ। এতে আর ও পরিস্কার হয়ে যায় যে, নারী মানবতার অর্ধেক। পুরুষ মানবতার একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে আর অপর অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। নারীকে উপেক্ষা করে মানবতার জন্য যে কর্মসূচীই তৈরী করা হবে তা হবে অসম্পূর্ণ। নারী- পরুষ সমানভাবে পরস্পর মুখাপেক্ষী। নারী যেমন পুরুষের প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়, তেমনি পুরুষ ও নারীর প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়। একে অপরের পরিপূরক এবং একে অপরের পোশাক বা লজ্জা নিবারক।

৪র্থ ও ৫ম আয়াতে একথা বুঝানো হয়েছে যে, মানবীয় যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক শান্তি-স্বস্থি ও পরিতৃপ্তি লাভ। তবে এক্ষত্রে উভয়কে ভিন্ন আঙ্গিকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পুরুষ জীবন সংগ্রামে লৌহ প্রকৃতির প্রদর্শন করার পর প্রেম ভালোবাসার কুসুমাস্তীর্ণ কাননে রূপ পিয়াসী মুক্ত বিহঙ্গ হওয়ার জন্য বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ঐকান্তিকভাবে নিবেদিত হওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠে। এটা মানব স্বভাবের স্বাভাবিক ও অনস্বীকার্য দাবী।

পুরুষ জীবনের উষর-ধূসর মরুভমিতে লু- হাওয়ার চপোটাঘাত খেয়ে খেয়ে অর্ধাংশের বুকে শীতল মধুর পানীয় পান করে তার স্বভাবের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠে। এটি তার স্বাভাবিক প্রবণতা মাত্র।

৬ নং আয়াতের মূল কথা হল, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি-স্বস্থি লাভের জন্য দাবী হচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রেম- ভালোবাসা, কল্যাণ কামনা ও পরম বিশ্বস্থতা, নির্ভরযোগ্যতার সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে উঠা। ৭ ও ৮ নং আয়াতে ভাষ্য হল- মানব প্রজাতি সংরক্ষণের জন্যে অন্যান্য উপায়-পন্থার পরিবর্তে যৌনতার পথকেই অবলম্বন করে থাকে। এরই মাধ্যমে মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, শ্বশুর-শ্বাশড়ী, ভাই-বোন ইত্যাদি আত্মীয়তায় রূপ লাভ করে। এই প্রকৃতিই মানুষকে সুসংবদ্ধ বা পরিবার গড়ে তুলতে আগ্রহী করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

"তিনি হলেন আমাদের রব, যিনি প্রতিটি জিনিসের মূল কাঠামো দান করেছেন। অত:পর তাকে পথ নির্দেশনা দান করেছেন"[৯]। তিনি আর ও ইরশাদ করেন:

"আর প্রতিটি জিনিসেরই আমরা জোড়া সৃষ্টি করেছি। সম্ভবত এ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে"[১০]।

এই আয়াতদ্বয়ে পরিবার গঠনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। অতএব মানব জীবনের মূল ভিত্তি হল পরিবার বা বীজতলা। পরিবারের সুসংবদ্ধতার উপর নির্ভর করে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা। ইসলামী দাম্পত্য আইনে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের অধিকার কর্তব্যের সঠিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। স্বামী- স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার, মাতা-পিতা ও সন্তানের দায়িত্ব ও অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করাই ইসলামী দাম্পত্য আইনের প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। তাছাড়া পরস্পরের সম্পদ বন্টন ও মিরাসী আইন ইসলামের পারিবারিক জীবনের অন্যতম প্রধান অংশ। ইসলামী দাম্পত্য আইনই ইহার একমাত্র সমাধান। অন্য কোন ধর্ম- গোত্রে এর সফল সমাধান নেই।

বিবাহ হচ্ছে দাম্পত্য জীবন তথা পারিবারিক জীবনের প্রবেশদ্বার। আর ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর মতামত, শারীরিক, মানুষিক আর্থিক, দ্বীন ও সমতার গুনাবলীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। ইসলাম মোহরানার মাধ্যমে বিবাহকে বৈধতা দান করে। স্বামী মোহরানার পাশাপাশি স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে বদ্ধপরিকর। এদুটো দায়িত্বের বিনিময়ে স্বামী শ্বাসন ও তালাক দেয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। তবে ইসলামী জীবনাদর্শে তালাক হল যাবতীয় বৈধ কাজ গুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন ও নিকৃষ্ট, অপছন্দনীয় কাজ। বস্তুত তালাক এমন বিধান যা অনুপায়ের উপায়।

ইসলামে পারিবারিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি হল: স্বামী পরিবারের কর্তা বা রাজা আর স্ত্রী তার সহযোগী বা রাণীর ভূমিকায় থাকবে। এটি নারী - পুরুষের স্বাভাবিক প্রবনতাও। বিবাহ বহির্ভূত সকল যৌনাচার ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই ইসলাম বিবাহের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। আর পরিবারের শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই স্বামী- স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্য, নারী-পুরুষের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা ঘোষণা করে। আল কুরআন পুরুষদেরকে নারীদের শাসন কর্তা হিসেবে উল্লেখ করে, যেহেতু তারা নিজেদের ধন - মাল ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি ও মোহরানার বিনিময়ে

---

[৯] আল কুরআন, সুরা ত্ব-হা ২০ : ৫।

দৃঢ় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। তবে নারীকে মা হিসেবে চিহ্নিত করে পিতার উপর তিনগুন মর্যাদা দেয়া হয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে ঐ ব্যক্তি অধিক প্রিয় যে তার স্ত্রীর নিকট প্রিয়।

তথাকথিত আধুনিকতার প্রভাবে হাজার বছরের গড়া পারিবারিক ঐতিহ্য আজ শুধু আনুষ্ঠানিকতা ও বইয়ের পাতায় আশ্রয় নিয়েছে । ছেলে- মেয়েরা আজ পরিবারের পরম মাতৃস্নেহে লালিত পালিত হচ্ছেনা। ইউরোপে বিবাহ প্রথা অনেকটা নাম সর্বস্ব। বিয়ের পূর্বে লিভটুগেদার, বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, বড় বড় নেতা-নেত্রী, নায়ক- নায়িকাদের বিয়ের পূর্বেই সন্তানের জন্মদানের খবর পত্র-পত্রিকায় ভেসে আসছে। জারজ সন্তানদের মিছিল আজ সভ্যতা-মানবতার দাবীদার আমেরিকা ও ইউরোপের রাজপথে দেখা যাচ্ছে। হোটেল-রেস্তোরায় সন্তান,পিতা-মাতা ইত্যাদিতে তেমন পার্থক্য দেখা যাচ্ছেনা। এটি জাহেলী যুগের নতুন সংস্করণ মাত্র। বস্তুত তাদের সামাজিক এই অবক্ষয়ের জন্য একমাত্র দায়ী বল্গাহীন জীবন, অতিমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ, পরিবার বিমুখতা, পরিবারের সদস্যদের জওয়াবদিহীতা ও দায়িত্বশীলতায় উদাসীনতা। আমরা মুসলমানরা আধুনিকতার নামে নিজেদের আদর্শিক অস্তিত্বকে ভূলে গিয়ে তাদের পঁচা দুগন্ধময় সংস্কৃতি ও তথাকথিত সভ্যতাকে অর্থনৈতিক বিপ্লব ও স্াংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে অনুস্বরণ ও আমদামী করে যাচ্ছে।

ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, ক্ষুদ্র নাগরীক থেকে রাষ্ট্রপতি, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও সমাধান ইসলামের সুমহান শ্বাশত আদর্শেই বিদ্যমান রয়েছে।

পরিবার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। ইসলামে বা মুসলিম পারিবারিক জীবন এক অনুপম আদর্শে ভরপুর। ইসলামী দাম্পত্য আইনে নিছক যৌন তৃপ্তি লাভই বিয়ের উদ্দেশ্য নয়, বরং বিয়ের উদ্দেশ্য হল- মানুষের স্বাভাবিক যৌন উত্তেজনাকে সুশৃংখল, পুত-পবিত্র পন্থায় পরিচালিত করা ও বিশ্ববাসীর জন্য এক আদর্শ যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরীক উপহার দেয়া। দুনিয়ার জীবনেই তার সমাপ্তি নয়। উভয় কালেই জওয়াবদিহীতার

---

[১০] আল কুরআন, সুরা জারিয়াত ৫১ : ৪৯।

অনুভূতি সৃষ্টিই ইসলামের পারিবারিক জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। বস্তুত ইসলামী আদর্শই একমাত্র সফল, পরিক্ষিত ও সর্বকালের সকল শেণীর মানুষের উপযোগী সর্বোত্তম বিধান। মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য ইসলামের এই শ্বাশত আদর্শের বিকল্প নেই্।

ইসলামী দাম্পত্য আইনে সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসুলের পরেই মাতা-পিতার স্থান। ইসলামী আইনে মাকে পিতার চেয়ে তিনগুন বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেহেতু মা গর্ভধারণ থেকে শুরু করে জন্মদান ও শিশুকালে লালন-পালনের ক্ষেত্রে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং এক মহান ধৈয্যের পরিচয় দিয়েছেন। মাতা-পিতাকে সন্তানের প্রতি গুরু দায়িত্বের কথা যেমনিভাবে কঠোর ভাষায় হুশিয়ার করা হয়েছে, তেমনি আবার সন্তানকে মাতা-পিতার কথা মান্য করা ও তাদের দুর্বল মুহূর্তে নিজের শিশুকালের কথা স্মরণ করে তাদের ঐকান্তিক সেবা যত্নের প্রতি বিশেষ নির্দেশ করা হয়েছে। তাদের ইন্তেকালের পর তাদের জন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বর্তমান নৈতিক অবক্ষয় থেকে মানবতাকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন সৎ ও যোগ্যতা সম্পন্ন সময়োপযোগী আদর্শ নাগরীকের। ইসলামী ঐতিহ্যে গড়া পরিবারেই সম্ভব এধরণের মানুষ তৈরী করা। কারণ মুসলিম পরিবারে সন্তানের প্রধান আদর্শ তার মাতাপিতা। একজন ভাল মা পারেন একটি উত্তম আদর্শবান শিশুর জন্মদিতে। আবার একজন পিতাও পারেন একজন আদর্শ শিশুর লালন পালন করতে। তবে পিতার চেয়ে মায়ের প্রভাব সন্তানের উপর অনেক বেশি। এ প্রসঙ্গে ইউরোপীয় রেঁনেসার নায়ক নেপলিয়ন বোনাপার্ট বলেন: "আমাকে একজন ভাল মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি উত্তম জাতি উপহার দেব"। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, সন্তানের জন্য মায়ের কোল হল সর্বোত্তম শিক্ষালয়। মাতা, পিতা, সন্তানের প্রত্যেকের স্ব-স্ব-দায়িত্ব কর্তব্য পালনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার কথা ইসলামী বা মুসলিম পরিবার ছাড়া কোন ধর্ম বা সভ্যতার দাবিদার কোন পরিবারে কল্পনাই অসম্ভব। অতএব আদর্শহীন, ধবংসম্মুখ বিশ্ব-সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে ইসলামের সফল পারিবারিক শ্বাশত আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণের বিকল্প নেই।

১ম অধ্যায়

বিবাহ : সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, বিয়ের পূর্বে বর-কনে দেখা ও মতামত গ্রহণ।

বিবাহ : সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা

পরিবারই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। বিয়ের মাধ্যমেই পরিবারের উৎপত্তি। একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে সহজীবন-যাপনের শারী'আত সম্মত যে বন্ধন স্থাপিত হয়, তারই নাম নিকাহ বা বিবাহ। 'নিকাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ সহবাস। নিকাহ নুক্হুন ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ হল মিলন, সঙ্গম, একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর ভিতরে প্রবিষ্ট করা। "বিবাহ শব্দের অর্থ বিশেষ রূপে বহন করা। পুরুষ নারীর ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করে , স্বামী স্ত্রীকে শশুরালয় হতে বিশেষ রূপে বহন করে আনয়ণ করে বলে এই বন্ধনকে বিবাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়"[১১]

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ কোন সাধারণ সম্পর্ক নয়। এটা কোন সাময়িক বা অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়। বিবাহ হলো একটি পবিত্র স্থায়ী চুক্তি। আল কুরআনে বিবাহকে বলা হয়েছে "দৃঢ় প্রতিশ্রুতি"[১২]। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, "তারা (নারীরা) তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছে একটি পবিত্র এবং দৃঢ় প্রতিশ্রুতি"[১৩]।

বস্তুত পরিবার যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয় সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বৈধ প্রণালীর নাম বিবাহ। এখানে বৈধ কথাটির সাথে সমাজের অনুমোদন বা স্বীকৃতি সম্পৃক্ত। বাস্তবিক পক্ষে আইনের স্বীকৃতি ও সামাজিক স্বীকৃতি পরস্পর পরিপূরক। তাছাড়া বিবাহের বৈধতা প্রশ্নে কেবল সন্তানের স্বীকৃতিই জড়িত নয়, সন্তান-সন্তুতি সম্পর্কে পিতা-মাতা এবং সমাজের দায়-দায়িত্ব পালন করার স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তা এর অন্তর্ভূক্ত"[১৪]।

ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে বিয়েই হচ্ছে একমাত্র বৈধ উপায়, একমাত্র বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। বিয়ে ছাড়া অন্য কোন ভাবে বা অন্য কোন পথে নারী-পুরুষের মিলন ও সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিয়ে হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মাঝে সামাজিক পরিবেশে ও সমর্থনে শারী'আত মুতাবিক অনুষ্ঠিত এমন এক সম্পর্ক স্থাপন, যার ফলে দুজনের একত্রে বসবাস ও

---

[১১] আজিজুর রহমান নোমানী, ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন,(ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ খৃ.) পৃ. ০১।

[১২] ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা আবদেল রহীম উমরান, অনুবাদঃ শামছুল আলম, (ঢাকা; জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ১৯৯৫ খৃ.) পৃ. ২৯।

[১৩] আল কুরআন, সুরা নিসা- ৪ : ২১।

[১৪] অধ্যাপক আবুল কাশেম ভূঁইয়া, যুগ জিজ্ঞাসা ও পরিবার (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খৃ.) পৃ. ৭।

পরস্পরে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরূপে বৈধ হয়ে যায়। যার দরুন পরস্পরের উপর অধিকার আরোপিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায় [১৫]।

বিয়ে ছাড়া নারী- পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। বিয়ে হলো সমাজ পরিসরে খোদা প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে এমন বন্ধন ও সম্পর্ক স্থাপন, যার কারণে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হালাল হয়ে যায়। একজন আরেকজনের উপর অধিকার লাভ করে এবং একজনের প্রতি অপরজনের উপর বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়"[১৬]। আল কুরআনে বিয়ে নবী রাসূলদের প্রতি বিশেষ বিধান উল্লেখ হয়েছে, তা হলো :

"হে নবী-তোমার পূর্বেও আমি অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি"[১৭]।

বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'লার নির্দেশ হলো "এবং বিয়ে দাও তোমাদের এমন সব ছেলে- মেয়েদের যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই, বিয়ে দাও তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহযোগ্য হয়েছে।"[১৮]

সুরা রা'আদের ৩৮ নং আয়াতে বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি লাভ নবী রাসূলদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ বলে স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুত জাহেলী যুগে একটা কু-সংস্কার মূলক কথা প্রচলিত ছিল যে, নবী-রাসূলগণ যেহেতু নিষ্পাপ সেহেতু তারা বিবাহ ও সন্তান গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। মহানবী (স.) একজন নবী তিনি কেন মানুষের মত বিয়ে বা ঘর সংসার করবেন। কেনইবা তার সন্তান হবে? প্রভৃতি বৈষয়িক ও জৈবিক কাজ কর্ম থেকে তাঁকে মুক্ত থাকতে হবে। সুতরাং রাসূল (স.) সঠিক নবী নন। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স.) শুধুই নন পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলই বিয়ে-স্বাদী গ্রহণ, সন্তান লাভ করেছেন- এটা তাদের প্রতি মহান প্রভূর দয়া। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন-

---

[১৫] মাওঃ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১০/ই-এ/১ মধুবাগ, নয়াটোলা, মার্চ-'২০০০ খৃ.) পৃ.-৮১।
[১৬] আব্দুস শহীদ নাসিম, ইসলামের পারিবারিক জীবন, (ঢাকা: বর্ণালী বুক সেন্টার, ৫৬৭/১ নয়াটোলা, ১৯৯৭ খৃ.) পৃ. ১৭।
[১৭] আল কুরআন, সুরা-রায়াদ- ১৩ : ৩৮।
[১৮] আল কুরআন, সুরা নূর ২৪ : ৩২।

"চারটি কাজ নবীগণের সুন্নতের মধ্যে গণ্য, তা হচ্ছে- সুগন্ধি ব্যবহার করা, বিয়ে করা, মিসওয়াক করা এবং খাতনা করানো[১৯] ।

দ্বিতীয়ত আয়াত সূরা নুরের ৩২ নং আয়াতে বিয়ের ব্যাপারে সরাসরি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা জালালুদ্দীন লিখেছেন: "তোমাদের স্বাধীন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যার যার স্বামী বা স্ত্রী নেই, তাদেরকে বিয়ে দাও। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যেও যাদের বিয়ের যোগ্যতা রয়েছে তাদের বিয়ে দাও" [২০] ।

যার স্বামী বা স্ত্রী নেই অর্থাৎ যারা এখনও বিয়ে করেনি, অর্থাৎ যারা কুমার-কুমারী তাদের সকলের বিয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যাদের বিয়ে হয়নি তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা। আর যারা একবার বিয়ে করেছে, বর্তমানে স্বামী বা স্ত্রী হারা তাদেরকেও আবার সামর্থ (আর্থিক ও মানুষিক) অনুযায়ী বিয়ে করতে হবে। একবার বিয়ে হলে কোন কারণে স্বামী বা স্ত্রী হারা হলে পুনরায় বিয়ে করতে রাজি না হওয়া আল্লাহ তা'আলা নির্দেশের পরিপন্থী। আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায় কোন কারণে যারা স্বামী বা স্ত্রী হারা হয়েছেন তারা পুনরায় বিয়ে করতে প্রস্তুত থাকেনা। সার্বিক বিবেচনায় এটি সমাজের জন্যে শালিনতাপূর্ণ কাজ নয়।

হিন্দু সমাজে সতিদাহ প্রথা নামে এক নিষ্ঠুর প্রথা ইতোপূর্বে প্রচলিত ছিল। মোট কথা বিয়ের যোগ্য হয়েও কেউ যাতে অবিবাহিত হয়ে থাকতে না পারে, তার ব্যবস্থা করাই ইসলামের লক্ষ্য। কারণ-একাকী জীবন পূর্ণ পবিত্র হতে পারেনা। অবশ্য যে বিয়ে করতে সামর্থবান নয় তার কথা ভিন্ন[২১] ।

বিবাহ সম্পর্কিত মহানবী (স.) এর একটি নাতিদীর্ঘ হাদীছ এখানে উল্লেখযোগ্য :

"হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন তিনজন লোক মহানবীর (স.) বেগমগণের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা নবী করীমের (স.) দিন রাত ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন ও জানতে চাইলেন। তাদেরকে যখন এই বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা

---

[১৯] আল হাদীছ, মুসনাদ আহমদ তিরমিযী।

[২০] মুহাসিনুত্ তাবিল খ.১২, পৃ. ৪৫১।

[২১] মাওঃ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ.৮২।

জানানো হল তারা ইহাকে খুব কম মনে করলেন। পরে তাঁরা বললেন নবী করিম (স.) এর তুলনায় আমরা কোথায় যার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বললেন; আমি চিরকাল সারা রাত জেগে ইবাদত করব। অপরজন বললেন আমি সারা জীবন রোজা রেখে কাটিয়ে দেব। তৃতীয় জন বললেন- আমি স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করব, আমি কখনও বিয়ে করবনা।

এই সময় রাসূল (স.) তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: তোমরাইতো এই সব কথা-বার্তা বলেছ? কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ। তোমাদের মধ্যে সকলের তুলনায় আল্লাহ তা'আলাকে আমিই অধিক ভয় করি। আলাহ তা'আলার ব্যাপারে তোমাদের তুলনায় আমিই অধিক তাকওয়া অবলম্বন করি। অথচ তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি, রোযা ভাঙ্গিও। আমি রাত্রি বেলায় নামায পড়ি আবার ঘুমাইও। আমি স্ত্রী গ্রহণও করি। অতএব যে লোক আমার (এই) সুন্নাতের প্রতি অনীহা পোষণ করবে সে আমার সাথে সম্পর্ক চিহ্নকারী"[২২]।

উপরোক্ত হাদীছটির ভাষা ও শব্দের মধ্যে বুখারী, মুসলিম শরীফের মধ্যে কিছুটা প্রার্থক্য থাকলেও মূল উদ্দেশ্য এক। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের কোন একটি অংশকে গ্রহণ আবার কোনটিকে বর্জন, আবার কোনটিকে বেশি-কম করা ইসলামী আদর্শ পরিপন্থি। এই হাদীছটি মানুষের জীবন চলার জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে তিনটি কথার দ্বারা সমগ্র জীবন ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। শুধু নামায পড়লেই হবেনা, যথাযথভাবে রোযাও রাখতে হবে। আবার শুধু রোযা রাখবে কিন্তু সহৃদয় হয়ে যাবে, তাও সম্পূর্ণ হারাম।

মোট কথায় ইসলামের কোন আদর্শকে কম, বেশী বা বর্জন করা যাবেনা। ইসলামী শারী'আত যে আদেশ টিকে যে উদ্দেশ্যে যে ভাবে পালন করতে নির্দেশ করেছেন ঠিক সে ভাবে তাকে মানতে হবে। মহানবী (স.) এই হাদীছটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করলেও মূল কথা বিবাহ যে তার একটি শ্রেষ্ঠ সুন্নাত বা আদর্শ তাই বুঝায়েছেন। তিনি আরও বলেন যে-

"যে লোক বিবাহ করার সামর্থ রাখে সে যদি বিবাহ না করে, তাহলে সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।" [২৩]

---

[২২] মাওঃ আব্দুর রহিম, বুখারী মুসলিম, হাদীছ শরীফ খ. ৩ পৃ.১২, অধ্যায়-বিবাহ নবীর সুন্নাত। সহীহ বুখারী বিবাহ অধ্যায়, হাদীছ নং-৪৬৯। সহীহ আল বুখারী, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী) খ. ৫পৃ. ২৫।
[২৩] মুসনাদ দারেমী বিবাহ অধ্যায়, মাও. আব্দুর রহীম, হাদীছ শরীফ, খ.৩, (ঢাকা : খায়রুন্ন প্রকাশনী ,এপ্রীল-২০০০ খৃ.) পৃ. ১৪।

হযরত আবু সাঈদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন: "চারটি কাজ রাসূল (স.) এর নিয়মনীতির অন্তর্ভূক্ত- ১. সুগন্ধি ব্যবহার ২.বিবাহ করা ৩. মিসওয়াক করা ও দাঁত পরিষ্কার রাখা ৪. খাতনা করা[২৪] ।

সা'আদ ইব্‌ন হিসাম (তাবেয়ী) হযরত (রা.) এর নিকট বিবাহ না করে পরিবারহীন কুমার জীবন-যাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: 'না, তুমি তা করবেনা। অত:পর তিনি তার কথার সমর্থনে একটি আয়াত পেশ করেন।

"আর আমরা তোমার পূর্বে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্য আমরা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বানিয়েছি।"[২৫]

অর্থাৎ- বিবাহ, সন্তান জন্মদান, নবী-রাসূলগণের জীবন পদ্ধতি। নবী রাসূলগণ মানব জাতির জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নেতা, অতএব তাদের অনুসৃত জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া মানব জাতির কোন বিকল্প পথ নেই।

যুহরীয়ী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরয়াহ অবহিত করেছেন যে, তিনি 'আ'ইশা (রা.) নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন-

"যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবেনা। তাহলে যে সব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের দুই-দুই। তিন-তিন বা চার জনকে বিবাহ করো। কিন্তু তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা ইনসাফ করতে পারবেনা, তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করো কিংবা তোমাদের মালিকানা ভূক্ত দাসীকে। অবিচার থেকে বাঁচার ইহাই সঠিক পন্থা।"[২৬]

'(রা.) বললেন, হে আমার ভাগ্নে (এ আয়াত নাযিলের প্রসঙ্গ হচ্ছে) কোন ইয়াতিম বালিকা তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। সে তার সম্পদ ও রুপ লাবণ্যে আকৃষ্ট, কিন্তু তাকে তার প্রাপ্যের তুলনায় কম মোহরে বিবাহ করতে চায়। সুতরাং তাদেরকে এই ইয়াতীম বালিকাদের তাদের পূর্ণ মোহর প্রদান করে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করে বিবাহ করতে বলা হয়েছে।অন্যথায় তাদেরকে এদের ছাড়া অন্য মহিলাদেরকে বিবাহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

[২৪] তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ, বিবাহ অধ্যায়।

[২৫] আল কুরআন, সুরা রায়াদ, ১৩: ৩৮।

[২৬] আল কুরআন, সূরা নিসা, ৪ : ৩ ।

নবী করীম (স.) বলেন: "যার বিবাহ করার সামর্থ আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ তাকে দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং যৌন অনাচার থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে।" [২৭]

"আলকামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর সঙ্গে ছিলাম। উসমান (রা.) তাঁর সাথে মিনাতে সাক্ষাত করে বললেন- হে আবু আবদুর রহমান!আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। তাঁরা উভয়ে একপাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। অত:পর উসমান (রা.) বললেন, হে আবদুর রহমান! আমি কি আপনার সাথে একটি কুমারী মেয়ের বিয়ে দেব, যে আপনাকে আপনার অতীত স্মরণ করে দেবে। যখন আবদুল্লাহ দেখলেন যে, তাঁর এ ব্যাপারে কোন প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকে ইশারায় ডেকে বললেন, হে আলকামা! আমি তার নিকট পৌঁছলে তিনি বলতে লাগলেন; তখন আমি তাকে উসমানের প্রস্তাবের ব্যাপারে বলতে শুনলাম যেহেতু তুমি আমাকে সে কথা বলেছ সুতরাং শুনে রাখ নবী করিম (স.) আমাদেরকে বললেন; হে যুব সম্প্রদায়। তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে এবং যে বিবাহের সামর্থ রাখেনা সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার যৌন ক্ষমতাকে হ্রাস করে।"[২৮]

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন, যুবক বয়সে আমরা নবী করীম (স.) এর সাথে ছিলাম, আমাদের কোন সম্পদ ছিলনা। রাসূল (স.) আমাদের বললেন: হে যুব সমাজ! যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ (পর স্ত্রী প্রদর্শন থেকে) দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যার সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়"[২৯]। বিবাহ সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নীতি হল-

"যাদের বিয়ের সামর্থ নেই, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন পবিত্রতা (সংযম) অবলম্বন করে।"[৩০]

---

[২৭] সহীহ আল বুখারী (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২৫-শিরিশদাস লেন বাংলা বাজার, ডিসেম্বর-১৯৯৯ খৃ.) খ.৫, বিবাহ অধ্যায়, পৃ.২৬।

[২৮] বুখারী শরীফ, বিবাহ অধ্যায়, হাদীছ নং-৪৬৯২।

[২৯] বুখারী শরীফ, বিবাহ অধ্যায়, হাদীছ নং-৪৬৯৩।

[৩০] আল কুরআন, সূরা নূর ২৪ : ৩৩।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রফেসর আবদেল রহিম উমরান বলেন: বিবাহ অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং পারিবারিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পরিকল্পিত ভাবে গ্রহণ করতে হয়। দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আছে কিনা তা বিবেচনা না করে সুযোগ পেলেই কেহ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনা। কারণ, স্ত্রী, সংসার এবং সম্ভাব্য সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর।এ ছাড়া সন্তানদের লেখা-পড়া, চরিত্র, ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন না হলে অপেক্ষা করাই উত্তম[৩১]।

ইসলামী আদর্শে বিবাহ না করে চিরকুমার থাকা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে হারাম। যথা সময়ে বিবাহ করা অবশ্যই কর্তব্য। কারণ বিয়ে মানুষকে চারিত্রিক দিক থেকে উন্নত করে। উচ্ছৃংখল জীবন থেকে স্বাভাবিকতা আনয়ন করে। মানুষকে সামাজিক ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

ইসলামী শারী'আতে বিয়ের হুকুম:

দাউদ যাহেরী ও তার অনুসারী ফিক্‌হবিদগণের মতে, বিবাহ করা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের মতে বিবাহ করা ওয়াজিব/কর্তব্য। ইমাম আযম আবু হানিফার (র.) মতে, "আর্থিক দৈন্য থাকা সত্বেও বিবাহ করা সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা কবে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে সে জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।[৩২]

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে বিয়ের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। খৃষ্টধর্মে কিছুটা থাকলেও তা আবার নিরোৎসাহমূলক। ক্রীনথিওনের নামে লেখা চিঠিতে উল্লেখ আছে যে,

"আমি অবিবাহিত ও বিধবাদের সম্বন্ধে মনে করি যে, তাদের এরকমই থাকা উচিত কিন্তু যদি সংযম রক্ষা করতে না পারে, তবেই বিয়ে করবে।" উক্ত চিঠির অন্যত্র বলা হয়েছে: "তোমার স্ত্রী না থাকলে তুমি স্ত্রীর সন্ধান করোনা। আর যদি বিয়ে করোই তবু তাতে গুনাহ নেই।"[৩৩]

উক্ত তথ্য থেকে বুঝা যায় যে, বিয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। করলে দোষ নেই না করলে কোন অপরাধ নেই। এ ধরনের বক্তব্য কোন শরয়ী দলিল হতে পারে? মার্টিন লুথার সর্ব প্রথম বিয়ের

---

[৩১] আবদেল রহীম উমরান; শামসুল আলম অনূদীত, ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আই, ই,এম, ইউনিট (ঢাকা : জাতীসংঘ জনসংখ্যা তহবিল-এর যৌথ প্রকাশনা, ১৯৯৫ খৃ.) পৃ.৩০।

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার মতে এটি একটি পার্থিব সাধারণ কাজ। প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম মতের নেতৃবর্গ একে ধর্মহীন কাজ বলে মনে করতেন। তারা বিয়ের পক্ষে কোন পরিমত দেননি।

বস্তুত বিয়ে করা মানুষের স্বভাবের প্রচন্ড নমনীয় দাবী। সময়বেধে অলিখিত স্নায়ুবিক সংগ্রাম, একটি সুস্থ মানবিক চিন্তা ধারার ফসল। প্রখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী জালিনুস বলেছেন:

"প্রজনন ক্ষমতার উপর আগুন ও বায়ুর প্রভাব রয়েছে, তার স্বভাব উষ্ণ ও সিক্ত। এর অধিকাংশই যদি অবরুদ্ধ হয় এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে নানা ধরনের মারাত্মক রোগ জন্মিতে পারে। কখনও মনে ভীতি ও সন্ত্রাসের ভাব সৃষ্টি হয়, কখনও হয় পাগলামীর রোগ। আবার মৃগী রোগও হতে পারে। তবে প্রজনন ক্ষমতার সুস্থ্য বহিস্কৃতি ভাল স্বাস্থ্যের কারণ হয়। বহু প্রকারের রোগ থেকেও সে সুরক্ষিত থাকতে পারে।"

প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল্লামা নফীসী বলেছেন: "শুক্র প্রবল হয়ে পড়লে অনেক সময় তা অত্যন্ত বিষাক্ত প্রকৃতি ধারণ করে বসে। দিল ও মগজের দিক থেকে তা এক প্রকার অত্যন্ত খারাপ বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত করে দেয়, যার ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়া বা মৃগী রোগ প্রভৃতি ধরণের রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয়।"[৩৪]

শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ দেহলভী (র.) বিয়ে না করার পরিণাম সম্পর্কে বলেন: "জেনে রাখ, শুক্রের প্রজনন ক্ষমতা যখন খুব বেশী হয়ে যায়, তখন তা বের হতে না পারলে মগজে তার বাষ্প উত্থিত হয়।"[৩৫] বস্তুত বিয়ে স্বভাবের দাবী, মানব প্রকৃতিতে নিহিত প্রবনতার স্বাভাবিক প্রকাশ। মানব সমাজের একটি দৃষ্টি নন্দন কাজ।

"কুমারিত্ব ও অবিবাহিত নিসঙ্গ জীবন যাপনের কোন নিয়ম ইসলামে নেই।"[৩৬]

"হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী করীম (স.) আমাদেরকে বিয়ে করতে আদেশ করতেন, আর অবিবাহিত নিসঙ্গ জীবন-যাপন করা থেকে খুব কঠোর ভাষায় নিষেধ করতেন।"[৩৭]

---

[৩২] মাওঃ আব্দুর রহিম, হাদীছ শরীফ, খ.৩, পৃ. ১৫।

[৩৩] মাওঃ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১০/ই-এ/১,মধুবাগ, নয়াটোলা -১২১৭) পৃ. ৮৫।

[৩৪] নাফিসী, পৃ. নং-৪১৪ ।

[৩৫] শাহ্‌ ওয়ালি উল্লাহ্‌ দেহলভী (র.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্‌, খ.১।

[৩৬] মুসনাদ আহমদ।

[৩৭] মুসনাদ আহমদ।

“হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, তিনজন লোকের সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর গ্রহণ করেছেন। সে তিনজন হলো (ক) যে ক্রীতদাস মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে চুক্তিনামা লিখে দিয়েছেন ও প্রতিশ্রুত অর্থ আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে (দাস মুক্ত করার ইচ্ছা)। (খ) বিবাহকারী যে, চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা রক্ষা করতে ইচ্ছুক এবং (গ) আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদকারী[৩৮]।

বস্তুত হাদীছ শরীফে উল্লেখিত তিনটি কাজই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি কাজের ইচ্ছা পোষণকারীকে আল্লাহ সাহায্য করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এই তিনটি কাজের মুলে নিহিত রয়েছে চরিত্র। আর চরিত্র হচ্ছে মানুষের মানবিক মেরুদন্ড। কুরআন মাজীদে পূর্ণ বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়ার পরই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

“এই লোকেরা যদি দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহদানে তাদেরকে সচ্ছল ও ধনশালী করে দেবেন।”[৩৯]

এই আয়াতের ভিত্তিতে মুফাসসীরগণ লিখেছেন- “কেবলমাত্র দারিদ্রতার কারণে কাউকেও বিয়ে করা হতে বিরত রেখোনা, কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তার নাফরমানী হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ বিয়ে করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সচ্ছলতা দেয়ার ওয়াদা করেছেন। তবে ইমাম শাওকানীর মতে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিশ্চিত কোন প্রতিশ্রুতি নন।

কারণ অসংখ্য দারিদ্র পীড়িত পরিবার রয়েছে যদি তাই হত তাহলে কেউ দরিদ্র থাকার কথা নয়। তবে এটা একান্ত আল্লাহ তা'আলা নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইমাম কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীরে নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।”[৪০] হযরত ইব্‌ন মাসুদ (রা.) বলেন-

“তোমরা বিবাহের মাধ্যমে সচ্ছলতা লাভ করতে চেষ্টা কর।”

হযরত উমর (রা.) বলেছেন, “লোকেরা বিবাহের মা'ধ্যমে সচ্ছলতা অর্জন করতে চাচ্ছেনা দেখে আমার আশ্চার্য লাগে।”

---

[৩৮] তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌ন মাযাহ্‌, মাও. আব্দুর রহীম, হাদীছ শরীফ, খ.৩, পৃ. ১৯।

[৩৯] আল কুরআন, সুরা- রুম, ৩০ : ৩২।

[৪০] মাও. আবদুর রহীম, হাদীছ শরীফ, খ.৩, পৃ. ২১।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছের ভিত্তিতে ফিক্‌হবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষেও বিবাহ করা জায়েয বা সঙ্গত। কেননা রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা। রাসূল (স.) বহু দরিদ্র নারী-পুরুষেরই বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। দরিদ্রই যদি বিবাহে বিরত থাকার ভিত্তি হতো, তাহলে নবী করীম (স.) নিশ্চয়ই তা করতেননা[৪১]। সর্বশেষ আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো-

"যে সব লোক কোন ভাবেই বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারতেছেনা, তাদের কর্তব্য হল শক্তভাবে স্বীয় নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা, যতদিন না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সচ্ছল করে দেন।"[৪২]

এই পরিস্থিতিতে মহানবী (স.) স্বীয় ব্যক্তিকে রোযা রাখার নির্দেশ করেছেন। কারণ রোযা মানুষকে সংযত করে এবং নৈতিক উচ্ছৃংখলতা থেকে মুক্ত রাখে।

বিয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

দুনিয়ার কোন কাজই কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পাদিত হয়না, তা যত ক্ষুদ্রই হউকনা কেন। বিয়ে এবং বিবাহিত জীবন-যাপনের ও কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। বিয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর ইতোপূর্বে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বিয়ের মত একটি মহান পবিত্র, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বিয়ের চারটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য:

বিয়ের প্রথম উদ্দেশ্য : নৈতিক চরিত্র গঠন, জীবনকে পরিচ্ছন্ন ও পুত পবিত্র রাখা। যেমন সুরা নিসায় বলা হয়েছে,

"এই মহরম মেয়েলোক ছাড়া অন্য সব নারীদেরকে সম্পদের বিনিময়ে হাসিল করা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে।যদি বিয়ের দুর্গে তাদের সুরক্ষিত করো এবং মুক্ত যৌন কামনা চরিতার্থে উদ্যত না হও"[৪৩]।

---

[৪১] আল্লামা কুরতুবী (র.) আল জামেউ আহকামুল কুরআন তাফসীরুল কুরআন, আল্লামা শাওকানী, উমদাতুল কারী তুহফাতুল আওয়াযী।

[৪২] আল কুরআন, সুরা আন্ নুর ২৪ : ৩৩।

[৪৩] আল কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ২৪।

এই আয়াতে **প্রথমত:** বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কয়েকজন মেয়েলোক বিয়ে করা ও তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। তাদের ছাড়া বাকী সকলকে বিয়ে করা পুরুষের জন্য হালাল।

দ্বিতীয়ত: এই হালাল মেয়েলোকদেরকে বিয়ে করতে হলে যথাযথ মোহরানা দিয়েই গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়ত: মোহরানা ভিত্তিক বিয়ে ছাড়া (অর্থাৎ যৌতুক) অন্য কোন উপায়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবেনা।

চতর্থত: এই বিয়েই হলো স্বামী-স্ত্রীর জন্য চরিত্র গঠন ও নিজেদেরকে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বোত্তম উপায়। সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণাা করেন যে,

"তাদের কতৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করে এবং প্রচলিত পন্থায় তাদের মোহর আদায় করো,যেনো তারা বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে থাকে, স্বাধীনভাবে যৌন বাসনা পূরণে লিপ্ত না হয় এবং চুরি করে প্রেম করে না বেড়ায়"[৪৪]।

আলোচ্য আয়াতে বিয়ের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে:

১. বিয়ে করে পরিবার দুর্গ রচনা করা।

২. জ্বেনা ব্যাভিচার বন্ধ করা।

৩. গোপন বন্ধুত্ব করে যৌন স্বাদ আস্বাদন করার সমস্ত কাজ বন্ধ করা।

ইমাম রাগেব বলেন, "বিয়েকে দুর্গ বলা হয়েছে, কেননা তা স্বামী-স্ত্রীকে সকল প্রকার লজ্জাজনক কুশ্রী কাজ থেকে দুর্গবাসীদের মতই বাঁচিয়ে রাখে"[৪৫]।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, "যে লোক কেয়ামতের দিন পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্র নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তার উচিত যেন (স্বাধীন মহিলা) বিয়ে করা"[৪৬]।

---

[৪৪] আল কুরআন,সুরা নিসা ৪ : ২৫।

[৪৫] মাও. আবদুর রহীম মুফরাদাত, ইমাম রাগেব, প্রাগুক্ত- পৃ. নং ৮৭।

[৪৬] হাদীছ শরীফ, ইবন মাযা।

অর্থাৎ বিয়ে চরিত্রকে পবিত্র রাখার একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অন্যথায় মানুষ বিশেষ দুর্বল মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে ফেলতে পারে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে:

"স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের পোষাক"[৪৭]।

কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে পোষাকের প্রকৃতি বলে দেয়া হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্য পোশাক নাজিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে"[৪৮]।

ইমাম রাগেব (র.) বলেন, "পোষাক বলতে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে আর স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে মনে করা হয়েছে। কেননা এ স্বামী ও স্ত্রী একদিকে নিজে নিজের জন্য পোষাক আবার প্রত্যেকে অপরের জন্যেও তাই। এরা কেউই কারো দোষ প্রকাশ করেনা - যেমন করে পোশাক লজ্জাস্থানকে প্রকাশ হতে দেয়না"[৪৯]।

বিয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য :

নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার দাবী পূরণ। যেমন : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহের একটি হলো এই যে, তিনি তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেনো তাদের নিকট থেকে তোমরা পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনিই তোমাদের মাঝে প্রেম, ভালবাসা, দয়া, মায়া ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন"[৫০]।

এই আয়াতে বিয়ের উদ্দেশ্য স্বরূপ: এমন জুড়ির কথা বলা হয়েছে, যা থেকে পরম তৃপ্তি ও গভীর শান্তি লাভ করা যায়। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মনের সুপ্ত পরিতৃপ্তি লাভ করাই বিয়ের উদ্দেশ্য। আর এই বিয়ের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম আলুসী লিখেছেন যে, "তোমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা শরী'আতের বিধি-বদ্ধ ব্যবস্থা- বিয়ের মাধ্যমে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব ও মায়া মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অথচ ইতোপূর্বে তোমাদের

---

[৪৭] আল কুরআন, সূরা বাকারা ২ : ১৮৭।

[৪৮] আল কুরআন, সুরা আরাফ ৭ : ৬৫।

[৪৯] মুহাসিনুত্ তাবিল, খ.৩, পৃ.৪৫৬।

[৫০] আল কুরআন, সুরা রুম ৩০ : ২১।

মাঝে তেমন কোন পরিচয় ছিলনা, না আত্মীয়, না রক্ত সম্পর্কের কারণে মনের কোন রূপ দৃঢ় সম্পর্ক"[৫১]।

হযরত হাওয়া (আ.) ও হযরত আদমের (আ.) যখন প্রথম সাক্ষাত হয় তখন হযরত আদম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন-

"আমি হাওয়া, আমাকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি আমার নিকট পরিতৃপ্তি ও শান্তিলাভ করবে, আর আমি পরিতৃপ্তি ও শান্তিলাভ করব তোমার কাছ থেকে'[৫২]।

মহানবী (স.) বলেছেন :

"কোন নারী যখন তোমাদের কারো মনে লালসা জাগিয়ে দেয়, তখন সে যেন তার নিজের স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তার সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় উত্তেজনার উপশম করে নেয়। এর ফলে সে তার মনের আবেগের শান্তনা লাভ করতে পারবে এবং মনের সব অস্থিরতা ও উদ্বেগ মিলিয়ে যাবে'[৫৩]।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আল্লামা নববী (র.) লিখেন যে, "যে লোক কোন মেয়েলোক দেখবে এবং তার ফলে তার যৌনপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়ে উঠবে, সে যেন তার স্ত্রীর কাছে আসে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়, এর ফলে তার যৌন উত্তেজনা শান্তনা পাবে। মনে পরম প্রশান্তি লাভ করবে, মন ও আত্মা শান্তনা পেয়ে এক কেন্দ্রীভূত হতে পারবে'[৫৪]।

বিয়ের তৃতীয় উদ্দেশ্য :

সন্তান লাভ বা বংশ বিস্তার: যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "তিনি তোমাদের স্বজাতি থেকে তোমাদের জন্যে জুড়ি বানিয়েছেন আর জানোয়ারদের মধ্য থেকেও তাদের জুড়ি বানিয়েছেন আর এভাবেই তিনি তোমাদের বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার করেন'[৫৫]।

"আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর তাদের দুইজন থেকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী'[৫৬]।

---

[৫১] তাফসী র রুহুল মায়ানী, খ.২১, পৃ. ৩১।

[৫২] উমদাতুল কারী, খ.৫, পৃ. ২১২।

[৫৩] মুসলিম শরীফ।

[৫৪] মুসলীম শরীফের ব্যাখ্যা, খ.১,পৃ. ৪৪৯।

আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেন যে,"এখন সময় উপস্থিত, স্ত্রীদের সাথে তোমরা এখন সহবাস করতে পার, যা তোমরা কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাই তোমরা সন্ধান কর, তাই লাভ করতে চাও'[৫৭]।

কুরআন মাজীদের সুরা বাকারায় আরো বলা হয়েছে যে, "তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের ক্ষেত স্বরুপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন কর- যে ভাবে তোমরা চাও-পছন্দ কর'[৫৮]।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন যে, "তোমরা বিবাহ কর, কেননা বেশী সংখ্যক উম্মত লইয়া অন্যান্য নবীর উম্মতের উপর আমি অগ্রবর্তী হব এবং তোমরা খৃষ্টানদের (পাদ্রীদের) ন্যায় (বিবাহ না করে) বৈরাগ্য গ্রহণ করবেনা"।[৫৯]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য যে বংশ বিস্তার তা পরিস্কার হয়ে যায়।

চতুর্থ উদ্দেশ্য :

পরিবার গঠন,

যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখ'[৬০]।

" হে পরওয়ার দিগার। আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দাও। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও'[৬১]।

পরিবার গঠন মানুষকে ব্যক্তি থেকে সামাজিক ও দায়িত্বশীল করে তোলে। প্রত্যেক নবী-রাসূল পরিবার বদ্ধ জীবন যাপন করেছেন। হিন্দু বৈদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য কয়েকটি ধর্মে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্নাসী প্রথা চালু রয়েছে।

---

[৫৫] আল কুরআন, আশ্‌শুরা, ৪২ : ১১।

[৫৬] আল কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ০১।

[৫৭] আল কুরআন, সুরা-বাকারা, ২ : ১৮৭।

[৫৮] আল কুরআন, সুরা-বাকারা, ২ : ২২৩।

[৫৯] মুসনাদ আহমদ ইমাম বায়হাকী, আবু উমামাহ (রা.)।

[৬০] আল কুরআন, সুরা তাহরীম, ৬৬ : ৬।

যারা পরিবার ও সংসার, সমাজ ত্যাগ করে বনে জংগলে গিয়ে একাকীত্বে জীবন-গ্রহণ করে। ইসলাম এই ধরনের তথা কথিত মনগড়া বস্তুগত আদর্শে গড়া কোন মত ও পথকে প্রশ্রয় দেয়নি। বরং ইহাকে সম্পূর্ণ হারাম বেদা'য়াত মনে করে। ইসলাম মানুষকে সামাজিক ও বৈবাহিক জীবনের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করে। আর এই সামাজিক জীবনের পূর্ব শর্ত হল বিয়ের মত বৈধ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক, যুক্তি নির্ভর সম্পর্কের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করা।

অতএব উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছের যুক্তি ও নির্দেশিকার আলোকে আমরা বিবাহের ৪টি মৌলিক উদ্দেশ্য খুজে পাই। আর তা হলো:

১. নৈত্রিক- উন্নত চরিত্র গঠন।

২. বৈধ ও গঠনমূলক পন্থায় প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক যৌন দাবী পূরণের মধ্য দিয়ে মানুষিক প্রশান্তি লাভ।

৩. মানব বংশ বিস্তার ও

৪. পরিবার গঠন।

বিয়ের পুর্বে বর-কনে দেখা ও মতামত গ্রহণ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পরিস্কার আলোচনা ও সমাধানে পরিপূর্ণ। বিবাহ মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান অংশ। বিয়ের পুর্বে প্রস্তাবিত কনেকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামী শরী'আত পরিস্কার নির্দেশ করেছে। কারণ ইসলাম বাস্তববাদী ও যুক্তি নির্ভর আদর্শে বিশ্বাস করে। নীছক খেয়ালী বা তামাশার স্থলে নয়, বরং দাম্পত্য জীবনের প্রেম ভালোবাসাপূর্ণ পবিত্র পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য কনেকে অগ্রীম দেখে নিতে হয়। বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখার মধ্যে তিনটি উপকারীতা রয়েছে:

১. বিয়ের পর হতাশায় ভুগতে হয়না।

২. এতে পাত্রীকে পছন্দ করে নেয়া যায়, পাত্র বিবাহে উৎসাহিত হতে পারে এবং আকর্ষণ লাভ করতে পারে।

---

[৬১] আল কুরআন, সুরা আল ফুরকান, ২৫ : ৭৪।

৩. বিয়ের পূর্বেই বর-কনের মধ্যে ভালবাসা ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম শুধুমাত্র বিয়ের উদ্দেশ্যে কোন মেয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের অনুমতি দেয়, নীছক মনের লালসা প্রবৃত্তির জন্য নয়।

বিয়ের পূর্বে পাত্রী দেখা সম্পর্কিত কুরআন মজীদের প্রথম দলিল হল :

"নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের পছন্দ/মনপুত তাদের তোমরা বিয়ে করো'[৬২] ।

অর্থাৎ- বিয়ের পূর্বে তোমরা সংশ্লিষ্ট কনেকে পছন্দ করতে পার। যাকে তোমাদের পছন্দ, তাকে তোমরা বিয়ে কর। পছন্দ হওয়ার পর কোন ভাবে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে না। কারণ একজন নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে যে কোন পক্ষ দেখার পর, তার পরিবার এবং সমাজের মধ্যে, পক্ষে-বিপক্ষে একটা প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখা সম্পূর্ণ হালাল, কেননা কোন মেয়ে পছন্দ কিংবা কোন মেয়ে ভাল হবে তা নিজের চোখে দেখেই আন্দাজ করা যেতে পারে'[৬৩] ।

" নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কাছে কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দেবে, তখন সম্ভব হলে তার এমন কিছু অংগ দেখে নেয়া উচিত, যা তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করবে"[৬৪] ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত , তিনি বলেছেন , আমি একদিন নবী করীমের নিকট উপস্থিত হই। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি এসে জানাল যে, সে আনসার বংশের একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে। একথা শুনে রাসূল (স.) মেয়েটিকে ইতিপুর্বে দেখেছে কিনা জানতে চাইলে না বোধক উত্তর আসে। তখন রাসূল (স.) তাকে বললেন, 'এখনি চলে যাও তাকে দেখে নাও। কেননা আনসার বংশের লোকদের চোখে একটা কিছু আছে"[৬৫] ।

এখানে মহানবী (স.) আনসার বংশের মেয়েদের চোখে একটা কিছু আছে বলে তাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেন। এতে কোন নিন্দা বা সমালোচনা উদ্দেশ্যে নয়।

---

[৬২] আল কুরআন, সুরা নিসা , ৪ : ৩।

[৬৩] তাফসীর রুহুল মায়ানী , খ.৩, পৃ. ১৯৬।

[৬৪] আবু দাউদ শরীফ , মুসনাদ আহমদ ।

[৬৫] মুসলীম শরীফ , কিতাবুন্ নিকাহ্।

হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'আবা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একজন মেয়েলোককে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। তখন রাসূল (স.) বললেন, তুমি মেয়েটিকে (আগেই) দেখে নাও। কেননা এই দর্শন তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্থায়িত্ব এনে দেয়ার জন্যে অধিকতর কার্যকর ও অনুকূল হবে'[৬৬]।

"প্রস্তাবিত ছেলে প্রস্তাবিত কনের অভিভাবকদের জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কনেকে দেখতে পারে। আর তাদেরকে না জানিয়ে গোপনে আড়াল থেকেও দেখতে পারে। হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ এভাবে পাত্রী দেখেছেন"[৬৭]। হযরত ইব্‌ন মুসলিমাতা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন,

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোন পুরুষের দিলে কোন মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে ইচ্ছা জাগাইয়া দেন, তখন সে মেয়েটিকে দেখিলে তাতে কোন দোষ নেই"[৬৮]।

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত অপর একটি হাদীছ হল; নবী করীম (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তখন সেই মেয়ের দেহের এমন কিছু অংশ যদি পুরুষের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় যা তাকে বিয়ে করতে সেই পুরুষকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহী করবে, তবে তাকে অবশ্যই তা করা উচিত"[৬৯]।

হযরত আবু হুমাইদ বর্ণনা করেন যে, "রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ যখন কোন মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেবে, তখন এই প্রস্তাব দেয়ার উদ্দেশ্য সেই মেয়ের দেহের কোন অংশ যদি সে দেখে এরূপ অবস্থা যে, সে মেয়ে তা টের পায়না, তবে তাতে কেন দোষ নেই"[৭০]।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসুলের বাণী শুনে " আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম। তারপর তাকে গোপনে দেখে নেয়ার জন্যে খুব চেষ্টা চালাই। এমনকি আমি একটি খেজুর গাছের ডালে গোপনে বসে থেকে মেয়েটিকে দেখতে পাই। শেষ পর্যন্ত আমি তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাই, যা আমাকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে তাকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিতে। অত:পর আমি তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে করি'[৭১]।

---

[৬৬] তিরমিযী শরীফ।

[৬৭] মাও, আ. শহীদ নাসিম, ইসলামের পারিবারিক জীবন, পৃ. ২৯।

[৬৮] ইন মাযাহ, মুসনাদ আহমদ, ইব্‌ন হাববান, হাকেম।

[৬৯] আবু দাউদ, মুসনাদ আহমদ।

[৭০] মুসনাদ আহমদ, তিবরানী, বাজ্জার।

[৭১] আবু দাউদ শরীফ।

হযরত 'আ'ইশা (রা) বলেন, রাসূল (স.) আমাকে বলেছেন, আমি স্বপ্নে তোমাকে দেখেছি। জনৈক ফিরেশতা রেশমী চাদরে জড়িয়ে তোমাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং আমাকে বলেন, এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখ-মন্ডল থেকে চাদর সরিয়ে দেখি যে, তুমি। আমি বললাম যদি এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তদ্রূপই ঘটেছে"[৭২]।

"সাহল ইব্‌ন সাআদ (রা.) হতে বর্ণিত । এক মহিলা রাসূল (স.) এর কাছে এসে বলল, হে রাসূল (স.) আমি নিজকে আপনার নিকট হেবা (বিবাহের জন্য সমর্পণ) করতে এসেছি। রাসূল (স.) তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে মাথা নিচু করলেন। মহিলা যখন দেখতে পেল, নবী করীম (স.) তাকে কিছুই বলছেন না। তখন সে বসে পড়ল। জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন- আপনার যদি এই মহিলার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন"[৭৩]।

তাউস, জহুরী , হাসানুল বসরী, আওযায়ী, ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফি'ঈ, মালিক, আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল(রা.) প্রমুখ মনীষীর মতে " পুরুষ যে মেয়ে লোকটিকে বিয়ে করতে চায়, সে তাকে দেখতে পারে"[৭৪]।

অর্থাৎ -সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হল যে, বিয়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কনেকে পাত্রের পক্ষ থেকে দেখে নিতে হবে। কারণ তা পরবর্তী বড় ধরণের বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র প্রাথমিক উপায়। পরবর্তী পর্যায়ে পছন্দ/অপছন্দের কারণে সমস্যা সৃষ্টি করা যাবেনা।

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যা কোন কাল্পনিক একগুয়েমী চিন্তা ধারার ফসল নয়। বরং তা যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করা একটি শ্বাশত বিধানের সমন্বিত রূপ।

১৪০০ বছর পূর্বে প্রবর্তিত বিধান প্রতিনিয়ত আধুনিক রূপে বিবেচিত হচ্ছে। মহানবী (স.) পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তখন যে ভবিষ্যত বাণী করেছেন, তা বর্তমান তথাকথিত আধুনিক প্রগতির যুগে এসে একটি লেটেষ্ট মডেলে পরিণত হচ্ছে। উপরোল্লেখিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবী (স.) এর মুখনিসৃত এবং তার সম্মানিত সহচরদের জীবনী ও ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের পূর্বে অবশ্যই কনেকে দেখে নিতে হবে। এতে কারো বিরোধ নেই।

---

[৭২] বুখারী শরীফ হাদীছ নং ৪৭৪৭, কিতাবুন নিকাহ। সহীহ আল বুখারী খ.৫, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী পৃ.৫৩।

[৭৩] বুখারী শরীফ হাদীছ নং ৪৭৪৮, কিতাবুন নিকাহ।

[৭৪] মাওঃ আব্দুর রহীম,পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ১২২।

তবে কনের শরীরের কতটুকু দেখার বৈধতা আছে তা নিয়ে কিছুটা মত পার্থক্য আছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত হল-স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মুখ মন্ডল দেখলেই কনের রূপ সৌন্দর্য পরিষ্কার হওয়া যায়। আর হস্তদ্বয় দর্শনে শরীরের গঠন ও আকৃতি বুঝা যায়। সুতরাং মুখ মন্ডল হস্তদ্বয় দেখা যাবে। এর বেশী দেখা ঠিক নয়।

ইমাম আওজায়ী বলেন -

" তার প্রতি তাকানো যাবে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তার মাংশ পেশীগুলোও দেখা যাবে"

কিন্তু অপরাপর মনীষীর মতে:

"প্রস্তাবিত মেয়েটির লজ্জাস্থান সমূহ বিয়ের পূর্বে দেখা জায়েয নয়।"

হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত আলীর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন হযরত আলী কন্যাকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেন তাকে দেখে নিতে পারেন। তখন এই দেখার উদ্দেশ্যেই হযরত উমর (রা.) উম্মে কুলসুমের পায়ের দিকের কাপড় তুলে ফেলে দিয়েছেন।

অতএব, এখানে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যেহেতু প্রস্তাবিত কনেকে দেখতে হবে, উদ্দেশ্য শুধুই বিবাহ করা। কতটুকু দেখতে হবে এ ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিত থাকলেও তার পক্ষে কোন দৃঢ় প্রমাণ নেই। সুতরাং সৎ নিয়তে যতটুকু দেখলে একটি নারীকে বিয়ের জন্য যথেষ্ট হবে অথবা পূর্ণ ধারণা লাভ করা যাবে ততটুকুই দেখা যাবে। এক্ষেত্রে কনের অভিভাবকের অনুমতি/বিনাঅনুমতি সমানই। ইমাম আহমদ বলেছেন যে:

"কনের চেহারা ও মূখ মন্ডলের দিকে দেখা যাবে, তবে যৌনসুখ লাভের জন্য নয়। এমনকি তার সৌন্দর্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য তার প্রতি বার বারও তাকানো যাবে"[৭৫]।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) মতে প্রস্তাবের পুর্বে কনেকে দেখা উচিত। কারণ প্রস্তাবের পর দেখা হলে যদি বিয়ে কোন কারণে সংগঠিত না হয় তাহলে উভয় পক্ষের বিশেষ করে কনে পক্ষের জন্য লজ্জা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়'[৭৬]।

বরের নিজের পক্ষে যদি কনেকে দেখা সম্ভব না হয়। তবে নির্ভর যোগ্য সূত্র থেকে সম্যক ধারণার লাভ করা আবশ্যক। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীছ থেকে এ সম্পর্কে প্রমাণ

---

[৭৫] উমদাতুল কারী।

পাওয়া যায়। নবী করীম (স.) একটি মেয়েকে বিয়ে করার চিন্তা করলেন, তখন তাকে দেখার জন্য অপর একজন স্ত্রী লোককে পাঠিয়ে দেন এবং বলে দেন যে,

"কনেকে মাড়ির দাঁত পরীক্ষা করবে এবং কোমরের উপরিভাগ পিছন দিক থেকে ভাল করে দেখবে"[৭৭]।

বস্তুত দেহের এ দুটো দিক একজন নারীর বিশেষ আকর্ষণীয় দিক । দাঁত দেখলে তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান -প্রতিভা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আর পেছন দিক থেকে কোমরের উপরের উপরিভাগ একটি নারীর বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে থাকে । এ সকল কিছুর উদ্দেশ্য হলো বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত কনে সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ । তবে এ কাজগুলো প্রস্তাবের পূর্বে করতে হবে।

কারণ আল্লামা আলুসী বলেছেন:

মনীষীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বেই কনে দেখার এ কাজটি সম্পন্ন করা উচিত মনে করেছেন। দেখার পর পছন্দ না হলে তা প্রত্যাহার করবে। তাতে কারো মনে কষ্ট লাগবেনা বা অসুবিধা হবেনা। কিন্তু প্রস্তাব দেয়ার পর দেখে অপছন্দ হওয়ার কারণে প্রত্যাখান করা হলে তার পরিনাম যে ভাল নয় তা সুস্পষ্ট " [৭৮]।

তবে " বিয়ের পূর্বে কনে দেখার অনুমতির সুযোগ নিয়ে কনের সাথে প্রেম চর্চা করা , নারী বন্ধু কিংবা পুরুষ বন্ধু সংগ্রহের অভিযান চালানো । দিনে রাতে হবু স্ত্রীকে নিকে একাকী যত্র তত্র পরিভ্রমণ করে বেড়ানো ও যুবতী নারীর সন্ধানে মেতে উঠা ইসলামে শুধু যে অসমর্থনীয় বরং ব্যাভিচারের পথ উন্মুক্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

এটা হচ্ছে ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞান গঠিত বর্বর সমাজের ব্যাভিচার প্রথা। ইউরোপীয় সভ্যতার দৃষ্টিতে বিয়ের পূর্বে শুধু কনে দেখাই হয়না, স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রেমের আদান প্রদান ও একান্ত জরুরী। বরং তা আধুনিক সভ্যতার একটা অংশও বটে। এ সব না হলে বিয়ে হওয়ার কথা টাই সেখানে অকল্পনীয়। এ না হলে নাকি বিবাহোত্তর দাম্পত্য জীবন ও মুধুময় হতে পারেনা। পাশ্চাত্য সমাজের এ বিকৃতি যুবক ও যুবতীদের কোন রসাতলে ভাসিয়ে

---

[৭৬] আইনী খ.১, পৃ.১, সুবুলুস সালাম শরহে ফি বুলুগুল মারাম,খ.৩, পৃ. ১১১।

[৭৭] মাও. আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ.১২৪।

[৭৮] তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খ.৪, পৃ. ১৯৬।

নিচ্ছে। তার কল্পনা ও লোম হর্ষনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এ হচ্ছে সম্পুর্ণ ব্যাভিচার, ব্যাভিচারের এক আধুনিকতম সংস্করণ। শুধু তাই নয়, বিয়ে পূর্ব কালীন প্রেম ও যৌন মিলন মূল বিয়েকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে দেয় ”[৭৯]।

কনের মতামত

ইসলাম বিয়ের পূর্বে শুধু বরকে কনে দেখার অনুমতি দেয়নি বরং কনেকেও বরকে ভালভাবে দেখে ও জেনে নেয়ার নির্দেশ করেছে। এটি ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ সুমহান আদর্শের একটি নিদর্শন বিশেষ।

রাসূল (স.) বলেছেন, “ বিধবার বিয়ে তার সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া হতে পারেনা। আর কুমারীর সম্মতি ছাড়া তার বিয়ে হতে পারেনা। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন :

হে আল্লাহর রাসূল (স.) তার সম্মতি কিভাবে জানা যাবে? তিনি বললেন তার চুপ থাকাই তার সম্মতি”[৮০]।

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত , “এক ব্যক্তি তার কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেন। বিয়ের পর মেয়েটি নবী করীম (স.) এর নিকট এসে অভিযোগ দায়ের করে। তিনি তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেন”[৮১]।

বস্তুত যেমনি কনেকে দেখার জন্য বরের প্রতি বৈধতা ও নির্দেশ রয়েছে তেমনি হবু স্বামীকে দেখে নেয়ার অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। বিষয়টি কনের পক্ষেও স্বাধীন ও বাস্তব।

হযরত উমর (রা.) বলেন:

“তোমরা তোমাদের কন্যাদের কুৎসিৎ অপ্রীতিকর পুরুষের নিকট বিয়ে দিওনা । কেননা নারীর যে সব অংশ পুরুষের জন্য আকর্ষণীয়, পুরুষের সে সব অংশই আকর্ষণীয় হয় নারীদের জন্য। অতএব তাদের অধিকার রয়েছে বিয়ের পূর্বে বরকে দেখার”[৮২]।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা ও যুক্তি দলিলের মাধ্যমে আমরা এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, বিয়ের পূর্বে যেমন বরকে সংশ্লিষ্ট কনেকে দেখে বুঝে নিতে হবে। তদ্রুপ কনেকেও ভাবী

---

[৭৯] মাওঃ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ.১২৫।

[৮০] বুখারী মুসলিম।

[৮১] নাসায়ী শরীফ।

[৮২] ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ খ.২, পৃ. ২৫।

বর সম্পর্কে জেনে বুঝে নিতে হবে। যাতে বিয়ের পর কোন ভাবে একে অপরকে অভিযুক্ত করতে না পারে। কারণ ইসলামে বিয়ে কোন সাধারণ বিষয় নয় । ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চুক্তি। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে বিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে, এতে উভয় পরিবার আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে এক কঠিন অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয়। আর উক্ত পরিবারের সন্তানদেরও এক চরম অন্ধকার জীবনের দিকে পদার্পণ করতে বাধ্য হয়। অতএব বিরাট বিপর্যয় ও বিপদ সমুহ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে বিয়ে প্রথাকে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে হবে। বিয়েকে সঠিক প্রক্রিয়ায় সম্পুর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী, সুখ-শান্তিময় করতে হলে বিয়ের পূর্বে বর-কনে উভয় উভয়কে যতটুকু প্রয়োজন ও সম্ভব দেখে জেনে বুঝে নিতে হবে। আমাদের এই মুসলিম সমাজে (বাংলাদেশী) ছেলেমেয়েকে না জানিয়ে অনেক সময় মাতা-পিতাই ছেলের জন্য বউ আর মেয়ের জন্য স্বামী পছন্দ করে। এরূপ করা আদৌ উচিত নয়।

তবে বিয়ে যেহেতু একটি সামাজিক চুক্তি সেহেতু প্রকাশ্যেই তা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। শুধু ছেলে মেয়েদের মতামতেই বিয়ে সংগঠিত হবে তা কিন্তু নয়, এক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। যে বিবা গোপনে সংগঠিত হবে সে বিবাহের পরবর্তী বিপর্যয় ঠেকানোতো গোপনে সম্ভব হয়না। ফলে সমাজকে স্বাক্ষী রাখার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এখানে সমাজ বলতে ওয়ালীকে বুঝানো হয়েছে। তবে ওয়ালীর ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে যদি মতবিরোধ দেখা যায়, তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ালীর মতের উপর ছেলে-মেয়েদের মতই প্রাধান্য দেয়া যুক্তি যুক্ত, যদি তা ভাল পাত্র বা পাত্রীর সাথে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। কেননা বিয়ে হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের ওয়ালীর নয়। বিয়ে বন্ধন জনিত যাবতীয় দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীকে পালন করতে হবে, ওয়ালীকে নয়; তবে ওয়ালী বা পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ছেলে -মেয়েদের কখনো অল্যাণকামী হন না। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মতামতের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে আল কুরআন ও হাদীছের আলোকে বাস্তব ভিত্তিক চিন্তা করলে বিষয়টি উভয় পক্ষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বর-কনেকে শুধু এক কেন্দ্রিক চিন্তা করলে চলবেনা। এক্ষেত্রে অভিভাবকের পরামর্শ প্রয়োজন রয়েছে। আবার বর-কনের তোয়াক্কা না করে শুধু অভিভাবকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করাও যাবে না। বর কনের সুস্পষ্ট মতামত এবং ওয়ালী ও অভিভাবকের অভিজ্ঞতা লব্দ পরামর্শের সমন্বয়ে যে বিবাহ সংগঠিত হবে তাই হলো ইসলামী শরী'আতের আদর্শ বিবাহ।

২য় অধ্যায়

বহুবিবাহ বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ

বহু বিবাহ বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ

একজন পুরুষের একই সংগে একাধিক স্ত্রী নিয়ে দাম্পত্য জীবন যাপনকে বহুবিবাহ বা বহু স্ত্রী গ্রহণ বলা হয়। মুসলিম ছাড়া অন্যান্য সমাজে ও একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রথা রয়েছে। ইসলামের আগমনের পূর্বে একজন মহিলার যেমন অসংখ্য স্বামী থাকত, তেমনি একজন পুরুষের অসংখ্য স্ত্রী থাকত। তখন বিয়ের ব্যাপারে এক আশ্চার্য ধরনের নিয়ম প্রচলিত ছিল। মক্কার হানিফ বংশের কিছু কিছু লোক বর্তমান আমাদের প্রচলিত বিয়ে অনুসরণ করত। ইসলামী আইন- বিধান প্রকৃতি- স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম যেমন মানুষের অতিরিক্ত বাড়া বাড়িকে প্রশ্রয় দেয়না। তেমনি আবার মানুষের বাস্তবিক, স্বাভাবিক, বৈষয়িক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমতা রক্ষার শর্তে এক সঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়। তা কিন্তু সচরাচর নয়, শর্তসাপেক্ষে একান্ত মানবিক ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ অনুমতি প্রদান করে। বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য এ যেন এক আত্ম পক্ষ সমর্থন। ইসলাম আগমনের পুর্বে শতধা বিভক্ত আরব জাতির তথা বিশ্ববাসীর কাছে নারী ও মদ ছিল সম পর্যায়ের। নারী গ্রহণে পুরুষের যেমন পুর্ণ স্বাধীনতা ছিল তেমনি নারীর ও স্বাধীনতা ছিল একাধিক পুরুষের সঙ্গ লাভের। এক সাথে এক হাজার স্ত্রী-স্বামী গ্রহণের ও নজির পাওয়া যায়। ইসলাম একটি যুক্তি নির্ভর ও স্বভাব ধর্ম। মহানবী (স.) মানুষের স্বভাব ও পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে বিশেষ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে একান্ত ব্যক্তিগত মানবিক প্রয়োজন, ও সামাজিক প্রয়োজন, নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা, শারীরিক বৈশিষ্ট, আর্থিক সঙ্গঁতি, ও সুবিচারের শর্ত সম্পূর্ণরূপে জড়িত।

ইসলাম নারীকে সর্ব শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে ছাড়িয়ে গেছে। তাদের অধিকার- হক যথাযথ আদায়কারী বিশেষ পুরুস্কার ও ঘোষণা করেছে। আমরা লক্ষ্য করি যে প্রতি জাহেলী যুগে অসভ্য বর্বর মানুষগুলো তাদের স্বভাব জাত ভাবে নারীদের সাথে যে আচরণ করত বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় এসে পাশ্চাতের দেশ সমুহে নারী স্বধীনতার নামে জাহেলী যুগের মত নারীকে মদ-পণ্য সামগ্রীর চেয়ে মারাত্নক ভাবে ব্যবহর করা হচ্ছে। আজ নারী

হচ্ছে বিজ্ঞাপনের সামগ্রী বা খেলনার বস্তু। অথচ অন্ধত্ব, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, আত্মমর্যাদা না জানার কারণে, নারীরা পুর্ববতী একই কায়দায় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ও করে যাচ্ছে। আমি এখানে তাদের সমালোচনা নয়, বরং তাদের চোখে আঙ্গুলী দিয়ে একথা বুঝাতে চাচ্ছি যে, স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, নিজের স্বামীকে ঘরে রেখে। বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে হোটেলে রাত্রি যাপন, নিজের সন্তানকে পণ্যের মত পর পুরুষের সাথে অবাধে মেলা মেশা করতে সুযোগ করে দেয়া। সৌন্দর্য রূপ-লাবণ্যকে বিভিন্ন কোম্পানীর পণ্য সমগ্রী বাজার জাত করার কাজে বিক্রি করা। এটি কি আসলে কোন সুস্থ্য সংস্কৃতি হতে পারে? তবে একে এতটুকু বলা যায় যে জাহেলী যুগের স্বভাবকে আরো উন্নত রূপ দিয়ে, আধুনিকতার লেভেলে তথাকথিত সভ্যতার নামে চালিয়ে দেয়া। এখানে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা এজন্যই করা হয়েছে যে, যারা বহুবিবাহের বিরোধিতা করে, তারা বিবাহ প্রথা বাদ দিয়ে একাধিক নারী-পুরুষের সাথে অবাধে মেলা মেশা, রাত্রি যাপন, সময় ক্ষেপণ করা কি করে পছন্দ করে ইসলাম যুক্তি নির্ভর, মানুষের স্বভাব জাত ধর্ম, বহু বিবাহের অনুমতি ইসলাম স্বাভাবিক ভাবে দেয়নি। বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ও শর্ত সাপেক্ষে একান্ত মানবিক প্রয়োজনেই অনুমদিত । যেহেতু ইসলাম পর্দা প্রথার উপর কঠোরতা আরোপ করেছে, বিবাহ ছাড়া নির্দিষ্ট কয়েক শ্রেণীর নারী ছাড়া সকলের সাথে অবাধ মেলামেশা অবৈধ ঘোষণা করেছে। সেহেতু বৈধ পথ উন্মুক্ত করা ও যুক্তিযুক্ত। সাগর/নদীর স্রোতকে পরিবর্তন করতে হলে তার বিকল্প পথ তৈরী করতে হবে। মানুষের স্বভাবকে হঠাৎ করে পরিবর্তন করা যাবেনা, তবে তাকে বিকল্প রাস্তায় চলার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামে বহুবিবাহ একটি বিকল্প স্বাভাবিক মানবিক প্রয়োজনীয় অনুমতি। আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, আজ কিছু কিছু নারী ঘরছেড়েছে। তারা স্বভাবের দাবীতে একাধিক পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা পছন্দ করছেন। আর ইসলাম একই স্বভাবকে বৈধ পন্থায় শুধু নির্দিষ্ট করেছে। একথা সকলকে মানতেই হবে নারী স্বাধীনতা ও নারীর মর্যাদা রক্ষা করা একমাত্র ইসলামের শ্বাশত আদের্শই সম্ভব।

মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে তার খলিফা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। সেরা জীবের মর্যাদা দিয়েছেন, সাথে সাথে কিসে মানুষের কল্যাণ কিসে অকল্যাণ সেটাও বলে দিয়েছেন। মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নেতা হিসেবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রাসূল পথপ্রদর্শক পাঠিয়েছেন। সকল নবী ও রাসূলদের কাছে মানব জাতির গাইড লাইন হিসেবে বিভিন্ন সহীফা ও ১০৪ খানা কিতাব পাঠিয়েছেন। যার স্বারসংক্ষেপ হল মহা গ্রন্থ আলকুরআন।

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা, আইন দাতা মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের কথা বিবেচনা করে সামর্থ ও সময়য়োচিত, গ্রহণযোগ্য ঠিকানা রচনা করেছেন। পারিবারিক জীবন একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। বিবাহ দিয়ে যার সুচনা, বিবাহের ক্ষেত্রে একজন পুরুষকে স্ত্রীর অসুস্থতা, অক্ষমতা, স্বামীর সক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়। যে ক্ষুদ্র মানুষ কোন বস্তুর সাহায্য ছাড়া তার পূর্ণাঙ্গ শরীর অবলোকন করতে পারেনা, তার পক্ষে তারই সৃষ্টিকর্তার দেয়া জীবন বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি মৌলিক বিশ্বাসীদের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুত যাদের বিশ্বাসে সমস্যা রয়েছে তারাই নানাবিধ প্রশ্নের আশ্রয়ে যুক্তি খুজে বেড়ায়।

বহুবিবাহ

"ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, নর-নারীর নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সংরক্ষণ, এজন্যে বিয়ে করার আদেশ করা হয়েছে। তেমনি পুরুষদের জন্যে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, বিশেষ কোন কারণে যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা তার পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে তাহলে সে তা করতে পারে। তবে তার শেষ সীমা হচ্ছে চারজন পর্যন্ত। এক সঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করা একজন পুরুষের পক্ষে জায়েয বিধি সম্মত। এক সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম" [৮৩]।

আলাহ তা'আলার বাণী:

" যদি তোমরা আশংকা কর যে, এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা। তবে, বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়। দুই,তিন, অথবা চার, আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবেনা, তবে একজনই"[৮৪]।

আল কুরআনের ইংরেজী অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইউসুফ আলী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, বিয়ের নীতিমালা সংক্রান্ত আয়াতে এতিমদের উল্লেখের বিষয়টি লক্ষ্য করুন। এটা এ আয়াত নাযিলের পটভুমিকে মনে করিয়ে দেয়। ওহুদ যুদ্ধের পরেই এ আয়াত নাযিল হয়। তখন মুসলিম সমাজে বহুসংখ্যক বিধবা এবং তাদের এতিম সন্তানরা। তদুপরি যুদ্ধ কালে

---

[৮৩] মাও. আব্দুর রহীম,পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ২১৬।

[৮৪] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ৩।

যুদ্ধবন্দী বহুনারী। তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য নয়, এবং সবচেয়ে বেশী মানবতাবোধ এবং দয়া মায়ার সংগে দেখার নির্দেশ ছিল। সেইরূপ ঘটনা এখন নেই। কিন্তু নীতিমালা রয়ে গেছে। এতিম মেয়েদের মধ্যে যারা বিবাহযোগ্য হয়েছে তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদি এরূপ ধারণা করা হয় যে সে ভাবেই তাদের প্রতি সুব্যবহার করা যাবে এবং তাদের স্বার্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ করা যাবে। একই সংগে নিজের পরিবারের প্রতি ও সুবিচার করা যাবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্য ব্যবস্থা করা যায়।

সুবিচার সম্বন্ধে আর ও উল্লেখ করা যায় যে, অজ্ঞতার যুগে বিয়ের সংখ্যার ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না, যে কোন সংখ্যক নারীকে বিয়ে করা যেত, এখন সর্বাধিক স্ত্রীর সংখ্যা চার এ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং তাও যদি সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এই সকল ব্যবহার শুধু জিনিস পত্র সমান ভাবে দিয়ে নয়, প্রেম ভালবাসা ও সমান ভাবে দিয়ে'[৮৫]।

অর্থাৎ, প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমান অধিকার প্রদান করতে হবে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেন।

"এ আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, চারজনের অধিক স্ত্রী এক সময়ে ও এক সঙ্গে গ্রহণ করা হারাম। তারা বলেছেন এ আয়াত সমগ্র মুসলিম উম্মাকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। অতএব প্রত্যেক বিবাহকারী এ সংখ্যাগুলোর মধ্যে যে কোন সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে'[৮৬]।

অন্যান্য তাফসীর কারকের মতে:

অর্থাৎ "রূপ-সৌন্দর্য কিংবা জ্ঞান- বুদ্ধি অথবা কল্যাণ কারীতার দৃষ্টিতে যে যে মেয়ে তোমাদের নিজেদের পক্ষে ভাল বোধ হবে তাদের বিয়ে কর'[৮৭]।

আল্লামা ইবনে কাছীর এই আয়াতের অর্থ করেছেন এ ভাবে।

অর্থাৎ " তোমরা বিয়ে কর মেয়েদের মধ্যে যাকে চাও। তোমাদের কেউ চাইলে দুইজন। কেউ চাইলে তিনজন। এবং কেউ চাইলে চারজন পর্যন্ত।"

নাওফল ইব্‌ন মুআবিয়া ফায়লামী বলেন:

---

[৮৫] আল্লামা ইউসুফ আলী , হলি কুরআন পৃ.১৭৯ ।

[৮৬] ফতহুল কাদীর, খ .১, পৃ. ৩৮৫ ।

[৮৭] মুহাসিনুত তাবিল, খ.৪, পৃ. ১১০৪ ।

" আমি যখন ইসলাম কবুল করি, তখন আমার পাচঁজন স্ত্রী ছিল। রাসূলে করীম (স:) তখন আমাকে আদেশ করলেন, মাত্র চারজন রাখ, বাকিদের ত্যাগ কর'[৮৮] ।

রাসূল (স.) ইরশাদ করেন:

" হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, ছাকাফী বংশের গাইলান ইব্ন সালামাতা ইসলাম গ্রহণ করল। এই ব্যক্তির ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াতের সময় দশজন স্ত্রী ছিল। তারা তার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী করীম (স.) তাকে স্ত্রীদের মধ্য হতে চারজনকে বাছিয়া লওয়ার নির্দেশ দেন'[৮৯] ।

আবু দাউদ শরীফের অপর একটি হাদীছ হল:

" উমাইরাতুল আসাদী বলেছেন- আমি যখন ইসলাম কবুল করি। তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল আমি এ কথা নবী করীম (স.) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন। এদের মধ্য থেকে চার জন বাছিয়া নাও'[৯০] ।

মুকাতেল বলেছেন, " কায়েস ইব্ন হারেসের ৮ জন স্ত্রী ছিল। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত আসা মাত্রই নবী করীম (স.) তাকে চারজন রেখে অপর চারজন ত্যাগ করতে আদেশ করলেন"[৯১] ।

আল্লামা ইব্ন কাছীর লিখেছেন:

"এক সঙ্গে চার জনের অধিক স্ত্রী রাখা যদি জায়েয হত তাহলে রাসূল করীম (স.) তাকে (গায়লানকে) তার দশজন স্ত্রী রাখবারই অনুমতি দিতেন বিশেষত তারা যখন ইসলাম কবুল করলেন। কিন্তু কার্যত যখন দেখেছি, তিনি মাত্র চারজন রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং অবশিষ্টদের বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল যে, কোনক্রমেই এক সঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা জায়েয নয়।

ইমাম ইব্ন মুসলিম একসঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণ জায়েয হওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত। অধিকাংশ মুসলিমদের মতে চার জনের বর্তমানে পঞ্চমা গ্রহণ জায়েয নয়' [৯২] ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পাণীপতী লিখেছেন:

---

[৮৮] মুসনাদ ইমাম শাফি'ঈ (র.)।

[৮৯] তিরমিযী, ইব্ন মাযাহ, দারে কুতনী, বায়হাকী।

[৯০] আবু দাউদ শরীফ ।

[৯১] আবু দাউদ শরীফ ।

" সমস্ত ইমাম ও সমগ্র মুসলিমের জন্য চার জনের অধিক বিয়ে করা জায়েয নয়"[১৩]।

এখানে মহানবী (স.) এর একটি মুল্যবান বাণী প্রনিধানযোগ্য:

আতা (রা.) বলেন, আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর সাথে সারিফ নামক স্থানে মায়মুনা (রা.) এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, "ইনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী। সুতরাং তোমরা যখন তাকে খাটিয়ায় উঠাবে তখন যেন জোরে ধাক্কা না দাও এবং নড়াচড়া না করো, বরং আস্তে আস্তে আদরের সাথে নিয়ে চলবে। নবী (স.) এর নয়জন স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে আটজনের সাথে পালাক্রমে রাত যাপন করতেন। (তাদের মধ্যে মায়মুনা ও ছিলেন) কিন্তু একজনের ওখানে রাত্রিযাপনের পালা ছিলনা"[১৪]।

"হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স.) এক রাতে তার সকল স্ত্রীর নিকট গমন করতেন। তাঁর ন'জন স্ত্রী ছিল"[১৫]।

"সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিবাহ করেছ কি? আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন, তুমি বিবাহ করো। কেননা এ উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ (স.), তাঁর অধিক সংখ্যক স্ত্রী ছিল"[১৬]।

উপরোক্ত হাদীছ ত্রয়ে মহানবী (স.) এর ৯ জন স্ত্রীর কথা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে এটা শুধু তাঁরই জন্য জায়েয। তাঁর এত সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের পিছনে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সর্বোপরী আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ জড়িত রয়েছে। তিনি ছাড়া অপর কোন মুসলমানের পক্ষে তা জায়েয নয়। সম্পূর্ণ হারাম। ইব্‌ন হাজার আসকালানী এ প্রসঙ্গে বলেন:

"চারজনের অধিক স্ত্রী একসঙ্গে ও এক সময়ে রাখা বিশেষ ভাবে কেবলমাত্র রাসুলে করীম (স.) এর জন্যেই জায়েয ছিল, এ সম্পর্কে সব মনীষীই সম্পূর্ণ একমত"[১৭]।

---

[১২] বিদায়াতুল মাজতাহিদ, খ.৩, পৃ. ৪০: ৪১।

[১৩] তাফসীরে মাজাহারী খ.৩।

[১৪] বুখারী শরীফ হাদীছ নং-৪৬৯৪।

[১৫] বুখারী শরীফ হাদীছ নং- ৪৬৯৫।

[১৬] বুখারী শরীফ কি তাবুল নিকাহ হাদীছ নং- ৪৬৯৬।

[১৭] ফতহুল বারী, মহাসিনুত তা'বীল, খ.৪, পৃ. ১১১৪।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর লিখেছেন যে, " রাসুলের (স.) নয়, এগারো, পনের জন স্ত্রী একসঙ্গে রাখা তার জন্যে বিশেষ অনুমোদিত ব্যাপার, মুসলিম উম্মতের মধ্যে এ জিনিস অপর কারো জন্য জায়েয নয়।"

অতএব বুঝা গেল যে, বর্তমান সভ্যতায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ যদি ও নিন্দনীয় ব্যাপার, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসুলের (স.) দৃষ্টিতে তা নিষিদ্ধ নয় বরং বৈধ। বিশেষ করে এ বিষয়টি ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ যার পক্ষে সম্ভব যিনি এক স্ত্রী দ্বারা নিজের চরিত্রকে পবিত্র রাখতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যৌনশক্তি যার এত বেশী যে, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত ও অবৈধ সম্পর্ক রাখতে যিনি দ্বিধা করেন না। শুধু তার পক্ষে নিজকে পবিত্র রাখার জন্য। অথবা প্রথম স্ত্রী থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে অসুস্থতা ও যৌন দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। তাহলে ঐ ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ চার জন মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি রয়েছে। তবে এটি যেহেতু পবিত্র কুরআনের আয়াত সেহেতু নির্দেশও বটে। চরিত্র হল ইসলামে ব্যক্তির আসল পরিচয়, শুধু চরিত্রকে রক্ষার জন্যই একাধিক বিয়ের নির্দেশ। ইসলাম যে কারণে বিয়ের নির্দেশ দেয়, সে কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের নির্দেশ দেয়। বিয়ের উদ্দেশ্য এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণের উদ্দেশ্য সমান। কুরআন মাজীদের যে আয়াতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের নির্দেশ দেয় এর সাথে সমতা সুবিচারের শর্ত লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

সমতার বিধান:

সমান ভাবে সকল স্ত্রীর শারিরীক, মানুষিক অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় শুধু মাত্র একজনকে বিয়ে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কেউ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তবে স্ত্রীদের যা কিছু অধিকার এবং যা কিছু তাদের জন্যে স্বামীর কর্তব্য। স্বামী তার সব কিছু পুর্ণ সুবিচার ন্যায় পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও পূর্ণ সমতা সহকারে যথারীতি আদায় করবে। পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান-বাসসামগ্রী খাদ্য, সঙ্গদান, মিল-মিষ, হাসি খুশীর ব্যবহার, কথাবার্তা ইত্যাদি সব বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রেই সমতা রক্ষা করে-সকল স্ত্রীর অধিকার আদায় করা স্বামীর কর্তব্য'[১৮]।

আল্লামা ইব্‌ন আল্‌ আরাবী লিখেছেন :

---

[১৮] মাও. আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ২২১।

"আদল এর অর্থ হয়েছে স্ত্রীদের মাঝে রাত ভাগ করে দেয়া এবং বিয়ে জনিত অধিকার সমূহ আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা। সমভাবে প্রত্যেকের প্রাপ্য আদায় করা। আর এ হয়েছে ফরয"[৯৯]।

বস্তুত সমতা শব্দের অর্থ হল যার যা প্রয়োজন তা যথাযথ ভাবে পূরণ করা।

প্রখ্যাত আলেম দ্বীন মাও. আব্দুর রহীম সাহেবের মতামতের সাথে ঐক্যমত হয়ে বলতে হয় "আদল এর প্রকৃত অর্থ কেউ খাবারের পার্থক্য করে, কেউ ও রুটি খায় কেউ খায় ভাত, কেউ মোটা কাপড় পছন্দ করে, তার জন্য রুটি/ ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কেউ আবার চিকন কাপড় পছন্দ করে তার জন্য ও তাই ব্যবস্থা করতে হবে। কেই বেশী বয়সের মেয়েলোক স্বামী সঙ্গ লাভের প্রয়োজন তার খুব বেশী নয়, খুব ঘন ঘন প্রয়োজন দেখা দেয়না তবে তার আবার প্রয়োজন হয় বেশী বেশী খোজ খবর নেয়া। আর কেউ হয়ত যুবতী, স্বাস্থ্যবতী, তার প্রয়োজন অধিক মাত্রায় স্বামী সঙ্গ লাভের দরকার, আবার কেউ যুবতী হয়েও রুগ্ন, যৌন মিলন অপেক্ষা সেবা সুশ্রুষা ও পরিচর্যার প্রয়োজন বেশী।

অতএব 'আদল বা সমতা হল, প্রত্যেকের দাবী যথাযথ ভাবে পূরণ করা। যা বর্তমান যুগে এজজন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ইসলাম যেহেতু সমতা রক্ষার শর্তে অনুমতি দিয়েছে সেহেতু আমরা ইহাকে না জায়েয বলবনা, বরং এটি ব্যক্তি বিশেষ একান্ত মানবিক সমতা ভিত্তিক বৈধ বিধান ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেন যে,

"এবং তোমরা একাধিক স্ত্রীর মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেনা যত কামনা ও ইচ্ছাই তোমরা পোষণ করনা কেন। এমতাবস্থায় (এতটুকু যথেষ্ট যে) তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে কোন একজনের প্রতি এমন ভাবে পূর্ণমাত্রায় ঝঁকে পড়বে না যে, অপর স্ত্রীকে ঝূলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে। তোমরা যদি কল্যাণ পূর্ণ নীতি অবলম্বন কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমতাশীল সীমাহীন দয়াবান"[১০০]।

এই আয়তের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস, উবায়দা সালমানী মুজাহিদ হাসনুল বসরী, যাহাক ইবনে মুজাহিদ প্রমুখ মনীষী এ আয়াতের তাফসীর করেছেন এভাবে যে,

---

[৯৯] আহকামুল কুরআন, খ.১ পৃ. ৩২৩।

[১০০] আল কুরআন সূরা নিসা ৪ : ১২৯।

"হে লোকেরা তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সব দিক দিয়ে ও সর্বতভাবে সমতা রক্ষা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেনা। কেননা এ সমতা ও সাম্য এক এক রাতের বাহ্য বন্টনের ক্ষেত্রে যদি ও কার্যকর হয় তবুও প্রেম ভালবাসা, যৌন স্পৃহা ও আকর্ষণ এবং যৌন মিলনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রার্থক্য আবশ্যম্ভাবী"[১০১]।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা:

"হে পুরুষগণ। তোমরা তোমাদের একাধিক স্ত্রীর মধ্যে তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করতে সামর্থ হবেনা। ফলে তাদের মধ্যে এ দিক থেকে "আদল' বা ন্যায় বিচার করা তোমাদের দ্বারা সম্ভব হবেনা। কেননা তোমরা এ জিনিসের মালিক নও, যদিও তোমরা তাদের মধ্যে এ বিষয়ে সমতা রক্ষা করতে ইচ্ছুক ও আগ্রহান্বিত হবে"[১০২]।

প্রখ্যাত তাফসীরবিদ আল্লামা ইব্‌ন শিরীন উক্ত আয়াতের আদলের ব্যাখ্যায় বলেন।

"মানুষের সাধ্যায়ত্ত যা নয় তা হচ্ছে প্রেম-ভালবাসা, যৌন মিলন স্পৃহা ও আন্তরিক বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সাম্য রক্ষা। কেননা এ সব জিনিসের উপর কর্তৃত্ব কারোই খাটেনা। যেহেতু মানুষের দিল আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত, তিনি যে দিকে চান, তা ফিরিয়ে দেন। যৌন মিলনও এমনি ব্যাপার। কেননা তা কারোর প্রতি আগ্রহের বিষয়, কারোর প্রতি নয়। আর এ অবস্থা যখন কারোর ইচ্ছাক্রমে হয়না, তখন এজন্য কাউকে দায়ী করা চলে না। আর তা যখন কারোর সাধ্যায়ত্ব ও নয়, তখন এ ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষার দায়িত্ব কাউকেই দেয়া যায়না[১০৩]। এখানে একান্ত মানবিক ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের চরিত্রকে পুত-পবিত্র রাখা, বা সামাজিক কারণে একাধিক বিয়ে করার পর নিজের সদিচ্ছা থাকার পরও যদি কিছুটা সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয়। সেটা আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। কারণ স্ত্রীদের মধ্যে কেউ লম্বা, কেউ .সুন্দরী, কেউ কুশ্রী, মিষ্টভাষী, খিটখিটে মেজাজের, কেই যুবতী, কেউ বয়স্কা। ইত্যাদি কারণে নিজের অনিচ্ছায় সমতা রক্ষা ব্যহত হলে দোষের কিছু নেই। কারণ এটা স্বভাবজাত। ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা বইতে আল্লামা আব্দেল রহিম উমরান, ইমাম আহম্মদ, ইব্‌ন তাইমিয়া, ইব্‌ন কাইয়েম এর উদ্বৃতি দিয়ে ২য়-৩য়, ৪র্থ বিয়ের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১ম ২য় স্ত্রীর

---

[১০১] ইব্‌ন কাছীর ।

[১০২] উমদাতুলকারী খ.৩ ।

[১০৩] ইব্‌ন-আল আরাবী, আহকামুল কুরআন, খ.১, পৃ. ৫০৫ ।

মতামতের বিষয়টির ও উল্লেখ করেছেন। তারা এটুকু অগ্রসর হয়ে স্ত্রীদের বাধা দেয়ার ক্ষমতার পক্ষে ও মত দেন। এ কারণে মহানবী (স.) তার সব কয়জন স্ত্রীর মধ্যে হযরত আইশা (রা.) কে বেশী ভাল বাসতেন অথচ তিনি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক জৈবিক যাবতীয় বিষয়ে পূর্ণ সমতা রক্ষা করে চলতেন। হযরত মায়মুনা (রা.) বার্ধক্যের কারণে তার রাত্রি যাপনের পালা আইশাকে ছেড়ে দেন। স্ত্রীদের সাথে সমতা রক্ষা না করার পরিনাম সম্পর্কে মহাম্মাদ (স.) ইরশাদ করেন। যে লোকের দুজন স্ত্রী থাকবে একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে নিয়ে মশগুল থাকবে, কিয়ামতের দিন তার এক পাশের গাল কাটা ও ছিন্ন অবস্থায় ঝুলতে থাকবে[১০৪]। অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন : যার দুজন স্ত্রী আছে। সে যদি একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, অপরজনকে বাদ দিয়ে চলে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার একপাশ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে[১০৫]। উপরোক্ত হাদীছ সমুহের উপর ভিত্তি করে আল্লামা শাওকানী লিখেছেন এসব হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুজন স্ত্রীদের মধ্যে একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়া আর অপরজনকে বাদ দিয়ে চলা বিশেষত দিনবন্টন, খাদ্য পাণীয় ও পোশাক পরিবেশনের ক্ষেএে সম্পূর্ণ হারাম। যেমন এসব বিষয়ে সমতা রক্ষা স্বামীর ক্ষমতায় রয়েছে। যদিও প্রেম প্রীতি ভালবাসা যাতে স্বামীর কোন হাত নেই। তাতে সমতা রক্ষা করা স্বামীর প্রতি ওয়াজিব বা ফরয নয়[১০৬]।

উপরোক্ত আলোচনায়, মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও আলহাদীছের একাধিক দলীল, বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ ও বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মতামতের প্রেক্ষিতে এ বিষয় পরিস্কার হয়ে উঠল যে, ইসলামী শরীআতে বিশেষ বিশেষ পুরুষদের জন্য একান্ত মানবিক কারণে, স্ত্রীদের সাথে সমতা বিধানের শর্তে সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী গ্রহণ করা যায়। এটা কোন সাধারণ অনুমতি নয়। বরং বিশেষ ক্ষেএে বিশেষ অনুমতি।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের যৌক্তিকতা :

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা, সর্বশেষ নবী ও রাসুলের মাধ্যমে অবতীর্ণ বিধান। সব যুগের সব মানুষের সকল স্থান, সকল পরিবেশ, গ্রাম, শহর, স্বদেশী, প্রবাসী,

---

[১০৪] আবু দাউদ শরীফ।

[১০৫] মুসনাদ আহমদ, তিরমিজী, ইব্ন মাযাহ।

[১০৬] নাইলুল আওতার, খ.৬, পৃ. ৩২১ মাও. আ. রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন; পৃ. ২২৭ ।

শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলের গ্রহণ উপযোগী বিধান হল ইসলাম। বস্তুতঃ তা যেমন ব্যক্তিদের প্রয়োজন পুরণ করে, তেমনি করে সমাজ ও সমষ্টির । নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের কল্যাণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা তাতে রয়েছে[১০৭]। ইসলামে পারিবারিক জীবন এক বৈচিএ পূর্ণ সমস্যা ও সম্ভাবনায় ভরপুর । নিম্নে পারিবারিক জীবনের অন্যতম সমস্যা ও সম্ভাবনা, বহুবিবাহ বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণের যৌক্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল :

১. **সন্তানদানে অক্ষম ও বন্ধ্যাত্ব জনিত কারণঃ** সন্তানদানে অক্ষম ও বন্ধ্যাত্ব জনিত কারণে লোকদের বিচিত্র অবস্থা লক্ষণীয়। কেউ তার বংশের ধারা অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার স্ত্রী থাকা সত্বেও তার একটিও সন্তান নেই। কারণ বন্ধাত্য বা অন্য কোন কারণে স্ত্রী সন্তান গ্রহণে অক্ষম [১০৮]। তখন স্বামীর পক্ষে প্রথম স্ত্রীর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে যৌক্তিক মতামতের আলোকে সন্তান লাভের পবিত্র বাসনায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা তার অযৌক্তিক হবে না।

২. **যৌনসক্ষমতা ও অক্ষমতাঃ** কোন ব্যক্তির যৌনশক্তি খুব প্রবল তার প্রথম স্ত্রী তাতে অক্ষম। অথবা স্ত্রী চির-রুগ্না, বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋতু কাল, এক্ষেত্রে তার স্বামীর পক্ষে দীর্ঘকাল ধৈয্য ধারণে অক্ষম। এরূপ অবস্থায় অবৈধ বালিকা বন্ধু গ্রহণের চেয়ে বৈধ ভাবে আরও একটি বিয়ে করা যৌক্তিক নয় কি?

৩. **যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থাঃ** যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় নারীদের তূলনায় পুরুষদের সংখ্যা অনেক কমে যায়। কারণ পুরুষরা দলে দলে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শহীদ হয়। এক্ষেত্রে অসংখ্য নারী স্বামী হারা হয়। যুবকরাই সাধারণত যুদ্ধে বেশী অংশ গ্রহণ করে শহীদ হয় বিধায় দেশে পুরুষের পাশা-পাশি যুবতী নারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। এক্ষেএে বহুবিবাহের অনুমতি না থাকলে স্বামী হারা রমনীরা নিজের ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও আপন সতিত্ব রক্ষা ও মাতৃত্ব গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। বাসনা পূরণে ব্যর্থ হয়ে পবিত্র নৈতিকতা পূর্ণ জীবন যাপনের এবং স্ত্রীর মা হওয়ার মর্যাদা থেকে চিরতরে বঞ্চিত থেকে বার্ধক্যে উপনীত হবে। দাম্পত্য জীবনের পরম আশংকা থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে তারা নিজের সার্বিক নিরাপত্তার সার্থে সতীন হয়ে থেকে দাম্পত্য জীবন উপভোগের পক্ষে মত দেবে।

---

[১০৭] আল্লামা ইউসুফ কারযাভীর; অনু. মাও. আ. রহীম, ইসলামে হালাল হারামের বিধান, (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৯ খৃ.) পৃ. ২৫৪ ।
[১০৮] আল্লামা ইউসুফ কারযাভীর, অনুঃ মাও. আ. রহীম, ইসলামে হালাল হারামের বিধান,(ঢাকা:খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৯ খৃ.) পৃ. ২৫৪।

পুরুষ সংখ্যার তুলনায় অধিক সংখ্যক বিবাহক্ষম নারীদের নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটি দেখা দেয়া অনিবার্য :

☐ হয় তারা জীবন ভর বঞ্চনার তিক্ত বিষপান করতে থাকবে ও এভাবেই গোটা জীবন অতিবাহিত করবে।

☐ অথবা তারা মুক্ত স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হয়ে খেলার পুতুল ও লালসার ইন্ধন হয়ে জীবন নি:শেষ করবে।

☐ কিংবা ব্যয়ভার বহনে সক্ষম ও শুভ আচরণ গ্রহণে আগ্রহী বিবাহিত পুরুষদের সাথে তাদের বিয়ে হওয়া বৈধ মনে করবে।

অনাসক্ত ও সুবিবেচকদের দৃষ্টিতে বিচার করলে নি:সন্দেহে বুঝা যাবে যে এ শেষোক্ত অবস্থায় সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান। সামাজিক শৃংখলা ও নৈতিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতেও এ ব্যবস্থাই উত্তম। আর ইসলাম এ সমাধানই পেশ করেছে মানবীয় এ জটিল সমস্যাটির[১০৯]। তাই আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হল :

আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়শীল লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দেয়া বিধানের তুলনায় উত্তম বিধান আর কে দিতে পারে[১১০]।

"কোন জাতির অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার পুরুষেরা যুদ্ধে গিয়ে খতম হয়ে যায়, আর অবশিষ্ট যুবকেরা একজন করে স্ত্রী গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকে, ফলে বিপুল সংখ্যক নারীই থেকে যায় অবিবাহিত, তাহলে সে জাতির সন্তান জন্মের হার অবশ্যই হ্রাস পাবে, তাদের সংখ্যা মৃত্যুর সংখ্যার সমান হবেনা। দুটো জাতি যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যারা সর্বাদিক দিয়ে সমান শক্তিমান, আর তাদের একটি যদি এমন হয় যে, সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে কোন মেয়ে কেই ব্যবহার না করা হয়। আর অপর জাতি তার সব সংখ্যক নারীকে এ কাজে লাগায়, তাহলে প্রথম জাতিটি তার শত্রু পক্ষকে কখনো পরাজিত করতে পারবেনা তার ফল এই হবে যে, এক স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত জাতি সেসব জাতির সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে, যারা বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণে পক্ষপাতি[১১১]।

---

[১০৯] আল্লামা ইউসুফ কারযাভীর, অনু. মাও. আ: রহীম, ইসলামে হালাল হারামের বিধান, (ঢাকা; খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৯ খৃ.) পৃ. ২৫৫।

[১১০] আল কুরআন, সুরা মায়েদা, ৫ : ৫।

[১১১] দয়রাতুল মায়ারিফু; ফরিদ মা ওজদী, খ.৪, পৃ.৬৯২।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম আবদুর রহীম (র.) এর মত হচ্ছে "যুদ্ধমান জাতিগুলো যদি এক স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার মধ্যে সে জাতি অতি সহজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সে জাতি বিলাস বাহুল্যে নিমজ্জিত হবে। কেননা বিলাসী জাতির মেয়েরা সাধারণত কম সন্তান প্রসব করে থাকে। (এ ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দীর্ঘ তথ্য রয়েছে) জন্মহার তার অনেক কমে যাবে। এর জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফ্রান্স। আর মুকাবিলায় কম বিলাসী জাতি জয়লাভ করবে। কেননা কম বিলাসী জাতির মেয়েরা সাধারণত অধিক সন্তান প্রসব করে থাকে যেমন রাশিয়া। এ কারণে বিলাসী জাতির পক্ষে ও কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রীতির ব্যাপক প্রচলন করা। তাহলে তাদের জনসংখ্যার ক্ষতি পুরণ হতে পারবে'[১১২]।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ইতহাস :

ইসলাম শুধু একাধিক বিয়ের অনুমতি বা একসাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়নি, বরং ইসলাম একে সীমিত করেছে এবং নির্দিষ্ট করেছে ও শর্তারোপ করেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায় এর প্রচলন বিভিন্ন আশ্চার্য ধরনের নিয়মে ভরপুর :

অ্যাসরীয়, চীনা, ভারতীয়, বেবিলনীয়, অসুরীয় ও মিসরীয় সভ্যতায় বহু স্ত্রী গ্রহণ ছিল একটি সাধারণ প্রথা। এদের মাঝে কিন্তু সংখ্যা নির্ধারণ ছিলনা, চীনের লীলা ধর্ম এক সঙ্গে ত্রিশজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিল একজন পুরুষকে[১১৩]।

ইহুদী ধর্ম শাস্ত্রে সীমাসংখ্যাহীন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। তওরাত কিতাবের ভাষ্যানুযায়ী প্রত্যেক নারীদের বহুসংখ্যাক স্ত্রী ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.) এর ৭০০জন স্বাধীনা স্ত্রী ছিল। আর দাসী ছিল তিনশত জন।

খ্রীষ্ট ধর্মে স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি বা নিষেধাজ্ঞা কিছুই নেই। ইনজিল কিতাবে বহু বিয়ে নিষেধ করে কোন শ্লোক বলা হয়নি। বরং পলিশ এর কোন কোন পুস্তিকায় এমন ধরনের কথা রয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সঙ্গত। তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে: আর্চ বিশপকে এক স্ত্রীর স্বামী হতে হবে। তাতে মনে হয় অন্যদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে[১১৪]।

---

[১১২] মাও. আ. রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ.২৩৫।

[১১৩] মাও. আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ২২৯।

[১১৪] মাও. আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ.২৩০।

পারিবারিক ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বলেছেন :

গির্জার অনুমতিক্রমে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ সপ্তদশতক পর্যন্ত চলেছে। আর অনেক অবস্থায় গির্জা ও রাষ্ট্রের হিসাবের বাইরে তার সংখ্যা অনেক গুন বেড়ে যেতে পারে[১১৫]।

তিনি আরও বলেন, আয়ারল্যান্ড সম্রাটের দুজন স্ত্রী ছিল আর দুজন দাসী ছিল। শালিয়্যানের ও দুইজন স্ত্রী ছিল, বহুসংখ্যক দাসীও ছিল। মার্টিন লুথার তালাক অপেক্ষা একাধিক স্ত্রী গ্রহণের মত দেন। ১৬৫০ সালে ভিস্টা ফিলিয়ার প্রখ্যাত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এক প্রস্তাবের মাধ্যমে একজন পুরুষের দুজন স্ত্রী গ্রহণ জায়েয করে দেয়া হয়। আবার ১৯৩১ সালের এক ঘোষণায় বলা হয় সত্যিকার খৃষ্টান ধর্মালম্বীর অবশ্যই বহু সংখ্যাক স্ত্রী গ্রহণ করতে হবে। প্রট্যাস্টনদের ধারণা ছিল, বহু স্ত্রী গ্রহণ এক পবিত্র আল্লাহরই ব্যবস্থা।

আফ্রিকার কালো মানুষদের বহু বিবাহ ও বহু স্ত্রী গ্রহণের স্বভাব ছিল। তারা দলে দলে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। এমন সময় গীর্জার পক্ষ থেকে তাদের সার্থে বহু স্ত্রী গ্রহণ বৈধ করে দেয়া হয়।

পাশ্চাত্য খৃষ্টান সমাজে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা আরো বেশী হওয়ার দরুন বিশেষত ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে এক জটিল সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। যার কোন সমাধান আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। আর একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ভিন্ন এ সমস্যার কোন বাস্তব সমাধানই হতে পারেনা। ১৯৪৮ সনে আলমানিয়ার মিউনিখে এক বিশ্ব যুব সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। আরব দেশের ও অনেক যুবক তাতে যোগদান করে। এ সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি জনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে আবার যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব যৌক্তিক ভাবে গৃহীত হয়। পরের বছর আলমানিয়া শাসন তন্ত্রে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি সংক্রান্ত ধারা সংযোজনের প্রস্তাব উঠে[১১৬]।

হিটলার ও চেয়ে ছিলেন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি আইন চালু করতে; কিন্তু মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে তা আর হয়ে উঠেনা[১১৭]।

---

[১১৫] আল আক্কাদ, হাকায়কুল ইসলাম, পৃ.১৭৭।

[১১৬] ড. মু. ইউসুফ, ফি আহকামিল আদওয়াল আস্ শখসিয়াহ, পৃ.১২১।

[১১৭] মাও. আব্দুর রহীম; পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ.২৩১।

পাক ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে ও দেখা যায়, রাজা মহারাজা ও সম্রাট বাদশাহদের, মুনি ঋষিরা পর্যন্ত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অভ্যস্ত ছিল। রামচন্দ্রের পিতা মহারাজা দশরথের তিনজন স্ত্রী ছিল, পিটরানী, কৌশল্যা ও রানী সুমিত্রা । শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বা স্বয়ং ভগবান বলে ধারণা করা হয়, তারও ছিল অসংখ্য স্ত্রী। লাল লজপত রায় কৃষ্ণ চরিত্রে তার আঠারজন স্ত্রী ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। রাজা পান্ডেরও দুইজন স্ত্রী ছিল কুন্তি আর মাভরী । ইসলামের ইতিহাসে প্রত্যেক নবী রাসুলের একাধিক স্ত্রী ছিল। হযরত হাসান ইব্ন আলী হুসাইন ইব্ন আলী, হযরত আবু সুফিয়ান ইব্ন হারিস, সা'আদ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস, হযরত হামযা, হযরত ইব্ন আব্বাস, হযরত বিল্লাল ইব্ন রিবাহ, জায়েদ ইব্ন হারিস, আবু হুযায়ফা, উসামা ইব্ন জায়েদ প্রমুখ সাহাবীর একাধিক স্ত্রী ছিল।

ইউরোপে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর সেখানে যৌন উছৃংখলতা বেড়ে যায়। অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যায় ফলে তারাও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পক্ষে মত দেয়।

লন্ডন ট্রিবিউট পত্রিকার ১৯০১ সালে ২০ শে নভেম্বর সংখ্যায় এক ইউরোপীয় মহিলার নিম্মোক্ত কথাগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের অনেক মেয়েই অবিবাহিত থেকে যাচ্ছে, ফলে বিপদ কঠিনতর হয়ে আসছে। আমি নারী,আমি যখন এ বিবাহতিরিক্ত মেয়েদের দিকে তাকাই, তখন তাদের মমতায় আমার দু:খ ব্যথায় ভরে যায়। আর আমার সাথে সব মানুষ একত্রিত হয়ে দু:খ করলেও কোন ফায়দা হবার নয়, যদি না এর দুরবাস্থার কোন প্রতিবিধান কার্যকর করা হয়।

মনীষী টমাস, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পক্ষে জোরালো মত পোষণ করেন। তার মতে এর ফলে আমাদের বিক্ষিপ্ত মেয়েরা ঘর পাবে। স্বামী পাবে, এতে করে বুঝা গেল যে, বহুনারী সমস্যার একমাত্র কারণ হচ্ছে- একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করতে পুরুষদের বাধ্য করা। এর ফলে আমাদের বহু মেয়ে বৈধব্যের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। যদি না প্রত্যেক পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দেয়া হবে, এ সমস্যার কোন সমাধান হওয়াই সম্ভব হবে না[১১৮] ।

বর্তমান আমেরিকার রাস্তা ঘাটে হাজার হাজার অবৈধ সন্তানের মিছিল চলছে, কেউ মাতৃ পরিচয় লুকিয়ে রাখে আবার কেউ পিতৃ পরিচয়। পুলিশ বা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর

---

[১১৮] সাইয়েদ রশীদ রেজা, মুজাল্লাতুল মানার, পৃ.০৪।

তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। তাদের সমাজে একাধিক বিয়ের অনুমতি নাই অথচ স্বামী হারা স্ত্রী আর স্ত্রী হারা বা অক্ষম স্ত্রীর স্বামী যে, অবাধে অবৈধ যৌনচারে লিপ্ত হচ্ছে এব্যাপারে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। হায়রে সভ্যতা! শুধু আমেরিকায় নয় পুরো ইউরোপ আজ জারজ সন্তানে ভরপুর। পুরুষেরা এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট নয়। আর শত সহস্র নারী বৈধ উপায়ে মিলনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সামাজিক আইনের কারণে। ফলে পাশ্চাত্যের দেশ সমুহে আজ পরিবার বলতে প্রায় কিছুই নেই। সেখানে মাতা পিতার কোন মর্যাদা নেই, শক্তি হলো তাদের প্রধান অশ্র। যে অসহায় শিশুকে মাতা পিতা আপন কোলে করে নি:স্বার্থ ভাবে মানুষ করেছে। সেই মানুষ সভ্যতার নামে তারই আপন পিতা-মাতাকে অক্ষম ও অসহায় বাধ্যক্যাবস্থায় ভবঘুর আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে বড়ই আনন্দে মহাসুখে দিন কাটায়। আজ আমার দেশের মেয়েরা তাদের সভ্যতায় মত্ত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাদের সাথে সুর মিলিয়ে বহুবিবাহের বিরোধীতা করে। ইসলাম তো সকলকে এ ব্যাপরে অনুমতি দেয়নি। বরং একান্ত মানবিক কারণে শর্তসাপেক্ষে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে এর অনুমতি প্রদান করেছে। এই পৃথিবীর সকল ধর্মে, গোত্রে, জাতির মধ্যে বহু- বিবাহের প্রচলন ছিল।

প্রয়োজনটি যখন বহু বিবাহে আগ্রহী পুরুষের, তেমনি যাকে বিবাহ করবে তার ও স্বাভাবিক মানবিক প্রয়োজন। জোর করে কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি ও ইসলামে দেয়নি। উভয়ের সম্মতি এবং সামাজিক স্বাক্ষী ও যথাযোগ্য মোহরানা চুক্তির ভিত্তিতে তা সংগঠিত হয়ে থাকে।

মেয়েদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন ও জবাব :

তথাকথিত আধুনিক প্রগতিবাদী মেয়েরা যারা সমান অধিকার ও নারী বাদী নামে নারী অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত। তারা প্রশ্ন করে, যদি পুরুষ একাধিক বিয়ে করে একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে তাহলে আমরা কেন পারবনা একাধিক স্বামী একসঙ্গে গ্রহণ করতে?

নারী পুরুষের সাম্য/ সমানধিকার সম্পর্কে আধুনিক কালের ভ্রান্ত ধারণার ও অজ্ঞাতার কারণেই এই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। মেয়েরা, স্বাভাবিক সৃষ্টিগত কারণেই একাধিক পুরুষ এক সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবেনা।

গর্ভপাতগত কারণ: আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারব যে, নারী পুরুষের সমতা জন্মগত ভাবেই অসম্ভব। কারণ মেয়েরা স্বভাবত একবারই গর্ভধারণ করে আর বছরে মাত্র একবারই গর্ভসঞ্চার করে। বহু সংখ্যক পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হলে ও গর্ভে সন্তান হবে একজন পুরুষ থেকেই। কিন্তু পুরুষদের অবস্থা এর বিপরীত। একজন পুরুষ এক সঙ্গে বহু সংখ্যক স্ত্রী লোককে গর্ভবতী করে দিতে পারে এবং একই সময় বহু সংখ্যক স্ত্রী লোক থেকে বহু সংখ্যক সন্তান জন্মগ্রহণ করাতে পারে। এমতাবস্থায় একজন মেয়েলোকের যদি একই সময় একাধিক স্বামী থাকে, একই সময়ে সকলের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, গর্ভে সন্তান থাকলে, সন্তান কোন পুরুষের তা নির্নয়ে করা সম্ভব হবেনা। আর একজন পুরুষ যদি এক সময় একাধিক স্ত্রী গ্রহন করে, একাধিক স্ত্রীর গর্ভে একাধিক সন্তান আসলে পিতৃব্য নির্ণয় করতে কোন অসুবিধা হয় না।

কর্তৃত্ব: পারিবারিক জীবনে পুরুষের কর্তৃত্ব পৃথিবীর সকল ধর্মেই স্বীকৃত। একজন স্ত্রী লোকের যদি একাধিক স্বামী হয়, তাহলে সে পরিবারে একাধিক পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে চলাতো সম্ভব নয়, তবে কোন পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে চলবে? কারণ সব পুরুষের মন-মেজাজ এক রকম হবে না। কামনা বাসনা ও দাম্পত্য জীবনে সকলের সমান নয়। অতএব একজন নারীর পক্ষে একাধিক পুরুষ গহণের চেয়ে একজন পুরুষের পক্ষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অধিকতর সহজ সাধ্য। নিরাপত্তাপূর্ণ, স্বাস্থকর ও নির্বিঘ্ন।

ডা. মার্সিয়ার (Mercier) বলেন:

The man is in this respect, as in many other respects, essentially different from women, and has been well noted by students of biology; Women is by Nature a monogamist, man has in him the element of a polygamist.[119]

এ পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত অনুমতির যথার্থতা খুজে পাওয়া যায়। ইসলাম মানব জীবনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের সার্বিক সমস্যা ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে সুন্দর ও নির্ভুল বিধান রচনা করেছেন মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। তিনি মানুষের সার্বিক দিকের একমাত্র মহাজ্ঞানী। তাই তার দেয়া বিধানের

---

[১১৯] Conduct and its disorders biologically considered, Pag-292-293.

সৌন্দর্য ও মহত্ব অনুধাবন করতে হবে। তিনি নারীকে নয় পুরুষকে প্রয়োজনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে মানবতার জন্য মহা কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন।

যারা এ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের কারণেই এই অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে। তারা এমন এক সভ্যতার পূঁজা করছে যে সভ্যতায় নারীর সতীত্ব ও মান মর্যাদা বলতেই নেই। বরং যেখানে নারী পথে ঘাটে হোটেলে রেস্তোরায়, নাচের আসরে। থিয়েটার হলে ও নাইট ক্লাবে দিনরাত লুণ্ঠিত হচ্ছে, নগদ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। শুকর যেমন কয়েকবার একটি শুকুরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে, তেমনি তারা ও নিজ স্ত্রীকে ঘরে রেখে বা বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে হোটেলে পাতিতালয়ে কয়েকজন পুরুষ একাধিক নারীকে ধর্ষন করে পুলক অনুভব করে ও তৃপ্তি পায়।

ইউরোপের কয়েকজন মনীষী পুরুষের একাধিক বিয়ের পক্ষে শুধু মত দেননি বরং অপরিহার্য্য বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করার মত।

লন্ডন থেকে মিস মেরী স্মীথ নামে এক শিক্ষয়িত্রী লিখেছেন। এক স্ত্রী গ্রহণের যে নিয়ম ও আইন বৃটেনে প্রচলিত, তা সবই নিতান্ত ভুল। পুরুষদের জন্য দ্বিতীয় দ্বার- পরিগ্রহের অনুমতি থাকা একান্তই বাঞ্জনীয়। তার মতে, এদেশে (বৃটেনে) নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী। এ জন্যে প্রত্যেক নারী, স্বামী লাভ করতে পারছেনা। (ফলে তারা বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় যৌন তৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করে) তিনি আরও বলেন: এক স্ত্রী গ্রহণের নিয়ম ব্যর্থ হয়েছে। আর এ নিয়ম বিজ্ঞান সম্মত নয়[১২০]।

অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আল্লামা শেখ আব্দুল আজিজ শ্বাদীস মিসরী তার "স্বাভাবিক ধর্ম" নামক গ্রন্থে লিখেছেন। লন্ডনের এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হল। বহু বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি বলেন "হায় আমি যদি মুসলিম হতাম, তাহলে একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতাম। কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন। আমার স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে,তার পর ও কত বছর অতিবাহিত হল। ফলে আমাকে বান্ধবী আর প্রনয়িণী গ্রহণ করতে হয়েছে। কেননা আইন সম্মত ভাবে আমি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারিনি। অনুমতি থাকলে আমার থেকে বৈধ সন্তানের জন্ম হত, সে হত আমার বিপুল

---

[১২০] মাও. আ. রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ.২৩৭।

সম্পদের উত্তরাধিকারী, একজন বৈধ সহধর্মীনী লাভ করে পেতাম গভীর শান্তি।” তিনি আরও লিখেছেন: ইংল্যান্ডে যৌন উচ্ছৃংখলতা বন্ধ করার জন্য সতের শতক থেকেই বহু বিবাহ প্রথার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। ১৬৫৮ সনে এক ব্যক্তি ব্যভিচার ও অবৈধ নবজাতক সন্তানের মৃত্যু বন্ধ করার জন্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের স্বপক্ষে একটি বই লিখেছেন। এর ১০০ বছর পর একজন আদর্শবান পাত্রী এর স্বপক্ষে আরেকটি বই লিখেন। প্রখ্যাত যৌন তত্ত্ববিদ জেমস হুলটল যৌন উচ্ছৃংখলতা ও ব্যভিচার প্রতিরোধের জন্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন।

প্রখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ কিলবন তার (Human Love)নামক গ্রন্থে বলেন, “ইংল্যান্ডে কার্যত বহু স্ত্রী গ্রহণের রীতি চালু রয়েছে, কিন্তু সমাজ ও আইন তা এখন পর্যন্ত সমর্থন করেনি। যদিও সে সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী দেখা যায়। যে সব লোক একজন স্ত্রী গ্রহণ করে দুই বা তিনজন রক্ষিতা ও বান্ধবীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, সমাজ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একেবারে নীরব। কিন্তু পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকা উচিত বলে কেউ যদি কোন প্রস্তাব পেশ করে তাহলে সমাজ আসলে তার বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠে”।

ওয়াশিংটনস্থ (Young Christian) এর চেয়ারম্যান মিসেস ভাসেল কামফিংক প্রদত্ত ভাষন থেকে সেদেশে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইন না থাকার পরিণাম জানা যায়।

“আমেরিকায় চৌদ্দ বছরের উর্ধ বয়স্কা যুবতী মেয়ের সংখ্যা এক কোটি বিশ লাখ আর এরা সবাই অবিবাহিতা। তার তুলনায় অবিবাহিত ছেলেদের সংখ্যা হচ্ছে নব্বই লাখ। এ হিসেব অনুযায়ী ত্রিশ লাখ যুবতী মেয়ের পক্ষে স্বামী লাভ করা কঠিন কাজ বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা মহাযুদ্ধে পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের সংখ্যাগত ভারসাম্য অনেকাংশে নষ্ট করে দিয়েছে’[১২১] ।

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবেশে “বহু বিবাহ ও তালাক” পর্যায়ে ভাষন দান কালে প্রখ্যাত গ্রন্থকার রবার্টসীমার বলেছেন:

“তালাকের ক্রমবর্ধমান ঘটনাবলীকে প্রতিরোধ করা এবং শিশু ছেলে- মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকার লোকদের এক সময়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের

---

[১২১] মিসেস ভাসেল কামফিংক, 'বহুবিবাহ' (লাহোর: জমজম' পত্রিকা, ১৫/৮/১৯৪৫ খৃ.)পাকিস্তান।

অনুমতি দেয়া আবশ্যক।এর ফলে সেয়ানা বয়সের পুরুষ নারী, ও রক্ষিতাদের বহু উপকার সাধিত হবে"[১২২]।

চেকোশ্লাভিয়া সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "তথায় অবিবাহিত নারীর সংখ্যা অবিবাহিত পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী। রির্পোটে বলা হয়েছে যে, সে দেশে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নারীর সংখ্যা বিবাহেচ্ছুক পুরুষ অপেক্ষা তিন লাখ ত্রিশ হাজার অধিক"[১২৩]।

প্রখ্যাত নারী- চিকিৎসক ডাঃ এ্যনী ব্যাসেন্ত বলেছেন:

There is pertended monogamy in the west, but there is really polygamy without responsibility; the mistress in cast off when the man is weary of her, and sinks gradually to be the "woman of the street"...................................... Despised by all."[124]

---

[১২২] রবার্ট সীমার 'বহুবিবাহ ও তালাক' (করাচিঃ দৈনিক জঙ্গ ২২/১২/১৯৬৪ খৃ.) পাকিস্তান।

[১২৩] দৈনিক দাওয়াত ১৫/১২/১৯৬৪ খৃ. দিল্লী , ভারত।

[১২৪] Khurshid Ahmed,"The light of Islam polygamy and Law"(Lahore:Morning News; 27/12/1963)

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের খারাপ দিক

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বিভিন্ন যুক্তি ও তথ্যের আলোকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা-আবশ্যকতা তুলে ধরেছি। তবে এ কথা ও বলতে চাই যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই যেমন একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তেমনি প্রেক্ষিত একজন স্বামীর বিশেষ ক্ষেত্রে অনধিক চার জন স্ত্রী গ্রহণে ক্ষতির দিক ও রয়েছে। যার সাথে পারিপার্শিক সকল বিষয়ই জড়িত:

হিংসা বিদ্বেষ: একাধিক বিবাহের ফলে স্ত্রীদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, মন-কষাকষি, ঝগড়া-বিবাদ, রেষা-রেষি ইত্যাদি সমস্যা ও লেগেই থাকে। পারিবারিক জীবন হয়ে উঠে এক অভিশাপরূপে। স্বামী তখন পরিবারের গঠনমূলক কাজ বাদে স্ত্রীদের ঝগড়া বিবাদ মিটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তথাপি এক সঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতার প্রতি আস্তে আস্তে তার বিরুপ মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে।

অসম আচরণ: স্বামী স্বভাবজাত কারণে কোন কোন স্ত্রীর প্রতি একটু ঝুকে পড়তে পারেন, এতে অপর স্ত্রীদের মাঝে হিংসার আগুন জ্বলতে থাকে। ফলে পারিবারের মধ্যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

সন্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া: স্ত্রীদের ঝগড়া বিবাদ সন্তানদের মাঝে বিস্তার লাভ করে। তারা ও বিভিন্ন মায়ের সন্তান হওয়ার কারণে বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করে। কেউ পিতার পক্ষে, আবার কেউবা মায়ের পক্ষে। এতে পরিবারে বিপর্যয় দেখা দেয়। শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়।

ছেলে মেয়েরা উচ্ছৃংখল ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে: ঘরে যখন দেখতে পায়, মায়ে মায়ে ঝগড়া, মাতা পিতার ঝগড়া, ভাইয়ে ভাইয়ে, ভাইয়ে-বোনে ঝগড়া, এ ভাবে চলতে থাকলে আস্তে আস্তে পরিবারে বাঁধন নষ্ট হয়। শাসন ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে। ছেলে মেয়েরা এ সুযোগে ঘরের শান্তি হারিয়ে বাহিরের শান্তির জন্য ভব ঘুরে আশ্রয় নেয়। আস্তে আস্তে তারা বিদ্রোহী ও উচ্ছৃংখল হয়ে উঠে।

উপরোক্ত আলোচনায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণের কয়েকটি খারাপ দিক ফুটে উঠেছে। আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, এই খারাপ দিকের ভয়াবহতা বেশী না একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করার পরিণামের ভয়াবহতা বেশী। বস্তুত পৃথিবীতে এমন কোন ক্রিয়া নেই যার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। হয়ত বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থে ত্যাগ করার মতই। ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান

শুধু নামে মাত্রই নয়। সেক্ষেত্রে রয়েছে প্রকৃত মুমিন ও পবিত্র জীবন যাপনের আদর্শ- উপদেশ, সর্বোপরী এক মহান প্রশিক্ষণ প্রদ্ধতি।

ইসলাম একাধিক স্ত্রী গ্রহণের কোন নির্দেশ দেয়নি, এটা কোন ফরজ-ওয়াজিব ও নয়। বরং তা হচ্ছে প্রয়োজনের সমকালীন এক ব্যবস্থা মাত্র নিরূপায়ের উপায়, গতিহীনের গতি। একটি বৃহত্তম বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য ক্ষুদ্রতম বিপদকে মেনে নেয়া। এটি একটি নৈতিক মানবীয় ব্যবস্থা। নৈতিক চরিত্রকে পুত-পবিত্র রাখার স্বার্থে মানবতার প্রকৃতির দাবীর প্রেক্ষিতে খোদা প্রদত্ত এহসান।

সামাজিক ভাবে স্বীকৃত বৈধ পন্থায় সম্পাদিত যুক্ত বিধান। যাকে গ্রহণ করার পর সহজে অস্বীকার করার ও কোন উপায় নেই।

মানবিক এজন্য বলা হয়েছে , একজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত গত ভাবে পুরুষ অতৃপ্ত হয়ে অপর নারীর প্রতি অবৈধ দৃষ্টি দেবে। শরী'আতের সীমা লংঘন করে অস্বাভাবিক ভাবে যৌন তৃপ্তি আহরণ করতে উদ্ধত হওয়া ব্যক্তি শরী'আত সম্মত পন্থায় অপর একজন নারীকে স্ত্রীর মর্যাদা দান নিতান্তই মানবিক।

নিজের পরিবারের জন্য খরচ করতে পারেনা অথচ যৌন তৃপ্তির স্বার্থে অবৈধ নারী বান্ধবী দেহপসরিনীদেরকে নগদ অর্থ দিয়ে ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেনা। অথচ এই অর্থ সমাজ মানবতার কোন কাজেই আসলনা। একাধিক বিয়ে ঐ ধরনের পুরুষদের জন্য এক অর্থনৈতিক শৃংখলা ও বটে। এই অবৈধ মিলনে অপর একটি অবৈধ মানব সমাজের জন্ম হতে পারে বটে। তাদের দ্বারা কি কোন কল্যাণ আশা করা যায়? একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বাস্তব সম্মত আইন জানলে এই ধরণের পরিস্থিতি ও আশংকা কখনো হতোনা, এ কারণে ইসলামী দাম্পত্য আইন কত বিজ্ঞানময় যুক্তিপূর্ণ তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

কিন্তু তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ আইনত দন্ডনীয় অপারাধ। অবাধে যৌন লিপসায় লিপ্ত হওয়াতে কোন বাধা নেই। বরং আইনের চোখের সামনে তা স্বাভাবিক। "এক কথায় বলা যায়, ইউরোপেও বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রথা কার্যত চালু রয়েছে। যদি ও তা অবৈধভাবে। আর ইসলামে ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রথা সমর্থিত। কিন্তু আইনের সাহায্যে চার সংখ্যার সীমার মধ্যে। এ দুয়ের মধ্যে কোনটি যে ভাল ব্যবস্থা,তা যে কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই

নির্ণয় করতে পারে'[১২৫]। একটি করে মানুষকে শালীনতাপুর্ণ, দায়িত্বশীল,আর অপরটি করে দেয় যেন লালসার দাস, দায়িত্বহীন, উচ্ছৃংখল। একটি পন্থা নারীকে মর্যাদা দেয়। অপরটি তাকে নীছক ভোগের পণ্য ও লালসার বস্তুতে পরিণত করে। বস্তুত এ যেন সীমিত সংখ্যার বৈধ স্ত্রী গ্রহণে আর সীমা সংখ্যাহীন স্ত্রী ভোগের দায়িত্বজ্ঞানহীন এক ব্যবস্থা। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে আরব সমাজে ও সীমা সংখ্যাহীন অবাধ স্ত্রী ভোগের অভিনব উপায় কার্যকর ছিল।

১. ইসলাম এ অস্বাভাবিক প্রবণতার সংশোধন করেছে।

২. সীমা সংখ্যাহীন স্ত্রী ভোগের সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে শুধু মাত্র মানবিক বিবেচনায় সর্বোচ্চ সীমা চার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

৩. বিয়ে ছাড়া নারী- পুরুষের অবাধ যৌন সর্ম্পক সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ, হারাম করে দিয়েছে।

৪. মানবিক কারণে স্বামীকে যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়, তবে তাদের সাথে সমতা বা 'আদল কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছে।

৫. বস্তুত 'আদল বা ইনসাফ হল একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পূর্ব শর্ত।

৬. স্বামীদের মনে পরকালের এক কঠিন আযাবের ভয় জাগিয়ে তুলছে।

রাসূল (স.) নিজেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। যদি ও তা সমগ্র মানবতার চেয়ে আলাদা প্রকৃতি, মেজাজ ও সম্মানের ব্যাপার, সে ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাত সাধারণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি স্ত্রীদের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের যে নজির স্থাপন করেছেন, তা সমগ্র মানব জাতির জন্য পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে এক উজ্জল আলোক বর্তিকা।

---

[১২৫] মাও: আ. রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ.২৪১।

৩য় অধ্যায়

পরিবার-পরিচয়, বাস্তবতা কার্যাবলী

পরিবার-পরিচয়, বাস্তবতা

"সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠানের পটভূমিতে পরিবার হচ্ছে, বাস্তব পরিস্থিতির মৌলিক একক বা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রতিতী। পরিবার সমাজেরই ভিত্তি স্বরূপ। এ থেকে শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। আর সামাজিক জীবনের মুখ্যতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুসংবদ্ধ রূপের উপর। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, একটি সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক।

ইসলামের পারিবারিক জীবন বিধান সবচেয়ে সুগঠিত ও সুশৃংখল। কারণ একমাত্র ইসলামই মানব জীবনের পুর্ণাঙ্গ রূপকে পরিগঠিত করে। ইসলামী পারিবারিক বিধানেই রয়েছে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এক অনুপম সমন্বয় ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। মানুষের নি:সঙ্গতা, মানবিকতা বোধ, সম্পৃতি এবং উদার চেতনাকে লালন করতে সুগঠিত পারিবারিক পদ্ধতিতে ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে সবচেয়ে বেশী। বস্তুত: ইসলামের পূর্বে কখনই এই সকল দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মূলক মনোস্তত্ব পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করেনি। যদিও মানুষ তার নিজস্ব দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জীবন যাপন করে থাকে তবুও তাকে পরিবার ও সমাজের নৈতিক মানদন্ডকে প্রতিনিয়ত মূল্য দিয়ে চলতে হয়। আর এখানেই পরিবার তথা সামাজিক পরিচয়কেই ব্যক্তি মানুষের প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে।

সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে পরিবার। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে পরিবারই রাষ্ট্রের প্রথম স্তর। অর্থাৎ পরিবার থেকেই বিকশিত হয়, রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গতা। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, সন্ততী, ভাই বোন ইত্যাদি পরিজন মিলেই গড়ে উঠে পরিবার। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও বংশ শাখায় বিভক্ত করেছি। যেন তোমরা পরস্পর পরিচয় লাভ

করতে পারো। তবে একথা নিশ্চিত যে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত'[১২৬]।

সামাজিক জীবন যাপনের সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার ও বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের অস্তিত্ব না থাকলে মানব জাতি হয়তো বর্তমান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে পারতোনা[১২৭]।

উপরোক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে আমরা পাই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর একজনের সান্নিধ্যে আরেক জনের জন্য পরম শান্তি, স্বস্থি ও নিরাপত্তাজনক করে দিয়েছেন। তিনি তাদের জন্যে উভয়ের মিলনের বৈধ পন্থা ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তাদের এ বৈধ মিলনকে কেন্দ্র করেই সূত্রপাত হয়েছে পরিবারের[১২৮]।

মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা অনুযায়ী বৈধ পন্থায় সম্পর্কিত একজন পুরুষ একজন নারী ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গড়ে উঠে যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি তাই হচ্ছে পরিবার[১২৯]।

মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিবারের উৎপত্তি ঘটেছে এবং পরিবারের অস্তিত্বের সাথে মানব প্রকৃতি সম্পৃক্ত[১৩০]।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারই হল মানুষ গড়ার মূল কেন্দ্র, সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি। এজন্য পরিবার গঠনের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক[১৩১]।

---

[১২৬] আল কুরআন, সুরা হুজরাত. ৪৯ : ১৩

[১২৭] অধ্যাপক আবুল কাশেম ভঁইয়া, যুগ জিজ্ঞাসা ও পরিবার, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খৃ.) পৃ. ৯০, মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, ইসলাম ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকা: আই, ই, এম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর)।

[১২৮] আব্দুস শহীদ নাসিম, ইসলামে পারিবারিক জীবন, (ঢাকা: বর্ণালী বুক সেন্টার, জানুয়ারী ১৯৯৭ খৃ.) পৃ. ১০-১১।

[১২৯] অধ্যাপক মাওলানা তমিজ উদ্দিন, পরিবার কল্যান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খৃ.) পৃ. ১৮, ।

[১৩০] অধ্যাপক আবুল কাশেম ভূইয়া, যুগ জিজ্ঞাসা ও পরিবার, পৃ. ৬।

[131] Abdel Rahim Omran, Marriage is basic The family in formation in Islam Family planning in the legacy of Islam, p-15.

আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেনো তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম, ভালবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন"[১৩২]।

বস্তুত পরিবার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা সৃষ্টি করে এমন এক সুখী ও পরিতৃপ্ত সমাজের প্রধান ধাপ। আর সন্তান লাভ হচ্ছে এ সুখী সমাজের চতুর্থ স্তর। একথা প্রমাণ করে যে, পরিবার কেবল যৌন ও পাশবিক জৈবিক জীবন রক্ষার জন্যেই প্রয়োজনীয় নয়, স্বভাবতই এর লক্ষ্য হচ্ছে এক উন্নত নৈতিক পবিত্র ও নির্দোষ জীবন যাপন। এক কথায় পরস্পরের কল্যাণে নৈতিক বন্ধুত্ব[১৩৩]।

আরো একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরিবার সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেন-"হে মানুষ! তোমারা সে মহান প্রভূকে ভয় করো যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি আর এ দুজন থেকেই (সারা বিশ্বে) ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নর-নারী[১৩৪]। এমনি ভাবে নারী-পুরুষের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে মানব জাতির বংশ ধারা।

সুরা ফুরকানে অন্যভাবে বলা হয়েছে যে,

"তিনিই তোমাদের প্রভূ যিনি পানি থেকে একজন মানুষের অস্তিত্ব দান করেছেন। পরে তার থেকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কগত দুটি আত্মীয়তার ধারা শুরু করেছেন, আর তোমার রব বড়ই শক্তিমান"[১৩৫]।

"তিনিই তোমাদের রব। যিনি এক আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তৈরি করেছেন তার জুড়ি। যেনো তার কাজে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে। অত:পর পুরুষটি যখন স্ত্রীকে জাপটে ধরলো, তখন সে হালাল গর্ভধারণ করলো"[১৩৬]।

---

[১৩২] আল কুরআন, সুরা আর রুম, ৩০:২১।

[১৩৩] মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৩ খৃ.) পৃ. ৪৭।

[১৩৪] আল কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ১।

[১৩৫] আল কুরআন, সুরা- ফুরকান, ২৫ : ৫৪।

[১৩৬] আল কুরআন, সুরা আ'রাফ, ৭:১৮৯।

এই আয়াতের জুড়ি বা জোড়া দ্বারা পরিবারকেই বুঝানো হয়েছে। যেখানে স্বামী-স্ত্রী পরম আত্মতৃপ্তি বোধের আশায় থাকে।

শুধু মানব জাতি নয়, প্রত্যেক সৃষ্টি জগতের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জোড়া বা পরিবার সৃষ্টি করেছেন। যেমন-

"আর প্রতিটি জিনিষেরই আমরা জোড়া সৃষ্টি করেছি। সম্ভবত এ থেকেই তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে"[১৩৭]।

বস্তুত, মানব সৃষ্টির মূল কাঠামোই হলো পরিবার, যেমন আল কুরআনের ভাষায় আমরা দেখতে পাই যে, "তিনি হলেন আমাদের রব, যিনি প্রতিটি জিনিসের মূল সৃষ্টি কাঠামো দান করেছেন। অতপর তাকে পথ নির্দেশনা দান করেছেন"[১৩৮]।

সত্যিকার অর্থে পরিবারই হচ্ছে মানব জাতির সামাজিক, মানবিক এবং অর্থনৈতিক মূল কেন্দ্র। মানব শিশু সুসন্তান হিসাবে গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন পারিবারিক বন্ধন। অসুস্থ, বিকলাঙ্গ এবং বয়স্করা প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রুষা পরিবারের বাইরে এতটুকু পায়না। সে দিক থেকে বিচার করলে, পরিবার হচ্ছে মানব শিশুর আশ্রয়স্থল[১৩৯]।

আমাদের মতে পরিবার নিয়ে শুধু কল্পনা বিশ্লেষণ করলেই চলবেনা, অবশ্যই একটি মুসলিম পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে যৌন চাহিদা পরিপূর্ণ করা ছাড়াও এর রয়েছে বহুবিধ দায়িত্ব। ইসলামী পরিবারের কাঠামো এমন যে, পরিবারেই মুসলিম শিশুরা নৈতিক প্রশিক্ষণ, চরিত্র গঠন, সামাজিক আচার-আচরণ, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক এবং সামাজিক আনুগত্য শিক্ষা লাভ করে[১৪০]।

---

[১৩৭] আল কুরআন, সুরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৯।

[১৩৮] আল কুরআন, সুরা ত্ব–হা, ২০ : ৫০।

[১৩৯] মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, ইসলাম ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকা: আই, ই, এম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, মার্চ' ১৯৯৫ খৃ.) পৃ. ৫।

[140] Abdel Rahim Omran, It is within the family system Tha Muslims acquire their relationships and susttain loyalty both to The family to society at large; Family planning in the large of Islam. (United Nations population Fund. Published-1992 E.) P-13.

সুতরাং মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা অনুযায়ী বৈধ পন্থায় সম্পর্কিত একজন পুরুষ, একজন নারী ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গড়ে ওঠে যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি তাই হলো পরিবার[১৪১] ।

> বস্তুত পরিবার হলো মানব জাতির বহুবিধ দায়িত্ব পালনের একটি প্রশিক্ষণশালা বা কেন্দ্র, যেখানে পিতা হবেন কর্তা আর মাতা হবেন তার সহযোগী।

পরিবার সম্পর্কে Encyclopaedia of Religion and ethics এর বক্তব্য হল:

‘ Rudimentary forms of family life among lower animals, Tracts the grouping more an less per manent of parents and offspring usually understood by the tearm ‘family` are found among the lower animals: among birds Companionship of male and female after pairing, the sharing of labor in building the nest, of incubation and of the care of the young while they are unable to look after themselves, present close analogies to the essential functions of the human family[142].

বিশিষ্ট ইউরোপিয়ান দার্শনিক Mr Jemes hasting বিভিন্ন মুখী ও বিভিন্ন প্রকার পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রাচীন সভ্যতার পরিবারের বাস্তবতা তুলে ধরেন। (Assyro-babylonian) প্রাচীন আশুরিয় তথা ব্যবিলিয়ন সভ্যতায় পরিবারের বাস্তবতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন যে,

The three meanings usually given to this world wer also present in Assyro-Bab. (1) The head of the house hold, with his wife, children, and other relatives; (2) a group of people connected by blood or by marriage; (3) The same including the tribe or clan. The Commonest

---

[১৪১] আব্দুস শহীদ নাসিম, ইসলামে পারিবারিক জীবন, (ঢাকা: বর্ণালী বুক সেন্টার, ডিসেম্বর- ১৯৯৬খৃ.) পৃ. ১১ ।

[১৪২] jemes hesting cwarls scribner’s sons, “Family” Encyclopadia of Religion and ethics.(NY,1901) Vol.5, p.716.

world for Family in perhaps, Qinnu, from Qananu to build anest though this may not have been its original meaning".

বেবিলিয়নের খ্রীষ্টানদের মধ্যে আবার পরিবারের বিভিন্ন পর্যায় তিনি খুজে পান, তিনি এখানে বাইবেল ও খ্রীষ্টানদের পরিবার সম্পর্কিত একটা ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন।

"Here is a social group which, in its present form is by no means an original and outnight gift to the human race, but is the evulution, through which various types of domestic unity have been in turn elected and as it were tested, until at last the fittest has survived."[143]

তিনি Old testament এর আলোকে পরিবারের ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন।

The family in Constituted under the headship of the father; the woman passes over to clan and tribe of her husband; kinship tribal Connexion, and inheritance are all determined by the man.[144]

সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, জাতিগত বা উপজাতিগত হোক পিতা পরিবারের কর্তা হবে আর সকলে তাকে আনন্দচিত্তে অনুসরণ করবে। James Hasting তার গ্রন্থে Celtic সম্প্রদায়ের বিয়ে ও Family সংক্রান্ত বক্তব্য তুলে ধরেন-

"The evulution of the celtic family is wrapped in considerable obscurity and it is by no means easy from both christian and pre-christian times to conjecture through what phases it had passed before the down of history. In the case of Celtic Countries too; it has always to be remembered that the celtic speaking inhabitants were

---

[১৪৩] Peabody, Jesus, "Christ and the Social question" (NY, 1901) P.134.

[১৪৪] Jemes Hesting, "The Family in old Testament " Encyclopadia of Religion and ethics, (NY,1901) V-5, P.723.

Comparatively Late comers, and that the previous inhabitants had for age their own social institutions which may or may not have invaders of indo European Speech".[145]

তিনি পরবর্তি পর্যায়ে বিয়ের পদ্ধতি এবং স্বামী-স্ত্রীর মৌলিক সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন। তিনি তার গ্রন্থে Chinese পরিবার সংক্রান্ত বক্তব্যও তুলে ধরেন-

'The analyses of a chinese characters is not always a reliable of guide to its primitive meaning. The usual form of the Character for family i.e. those under the roof of one paterfamitions, is a pig under a roof, and the shouwen (C.A.D 100) says that orginally meaning a pig-sty, it was afterwords metaphorically used for a human home.'

The institution of the family is as cribed to fuhhsi (2852-2736 B.C.) Before his time. The people were like best, knowing their mothers but not their fathers, and pairing without decency. Fuhhsi established the lows of marriage, organiged clams, and introduced family surnames.

'A typical chinese family might Consist of father, mother sons daughters-in-Law, and grand children, to have four generation's a live in one husehold in marked falicity; if five are a live at the same time, many are the congratulations, and Special announcement of the fact is made in the temple of the city guardian."[146]

---

[১৪৫] Jemes Hesting, "The Family of cetlic" Encyclopaedia of Religion and ethics (NY,1901) V-5, P.728.

[১৪৬] Jemes Hasting "The Family of chines" Encyclopaedia of Religion and ethics, (NY, 1901) Vol.5, P.730.

James hasting তার গবেষণায় মিশরীয় সভ্যতায় পরিবারের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন যে,

"The Egyptian family present many points of cantrast both with the semitic and with the greek, its almost interestig charcteristics are a distinct preservation of matriarchy, the prominent position of woman, and a Comperative promiscuity of sexual relation."

তিনি তার পরবর্তী বক্তব্যে পরিবারের পুরুষদের কর্তা হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন।

The most important person in the family was then, not the father, as among the semitics, but the mother. She was the hous ruler, the nebtper, and the focus of the family. Never the less, she was inferior of man, her husband, in that she was always mentioned after him on the tomb stones she is always the wife of the man, he is never the husband of the womam. [147]

তিনি প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় পরিবারের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করেন। তিনি তার বৃক্তব্যে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল পরিবার, বিষয়টি তিনি এ ভাবে উপস্থাপন করেন-

"Such being the position of women at abheus as daughters and wives, it is no strange that some example, should not have conformed to the standards. Of athenian family life it is not so strange at first sight-that at the man society gave great freedom to man, be the unmarried and maried in matters of social morality as it is taht the family thus strictly defined should have existed at all."

---

[১৪৭] Jemes Hasting, "The Family of Egyption" Encyclopaedia of Religion and ethics (NY, 1901) Vol.5, P.739.

তিনি জাপানী সভ্যতার পরিবারের সজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে,

The earlist family sistem in Japan was taht known as uji, signifying interior or houshold but from the earlist times it has been used exclusively in the sense of name the most ancient times and constituted the first units of Japanies society. [148]

তিনি প্রাচীন Jewish বা ইহুদী সম্প্রদায়ে পরিবারের অস্তিত্ব ও তাদের পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য বিবাহ সংগঠন ও তার নিয়ম সেখানে উল্লেখ করেন:

'Though considerably affected on the legal side by the non-jewish environment, jewish family has retained, thoughout the centuries, a distinct character to which bibe and talmud contributed. The influence of the family relations has been one of the strongest religions and Social forces, making forsobriety and purity, and forming an intimate bond between the individual and the community the whole of the family life was pervaded by religion; The home cevemonial in general and the special sabbath and festival rites combined to make the table an alter.' [149]

তিনি হিন্দু সংস্কৃতিতে পরিবার ও তার ঐতিহ্য এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলেন-

The family in India is of the joint family type and it is chieftly for this reason that the Indian family law difers so much from that of Europe. Its main principles were early reduced to writing in the well known leval Sanskrit treaties legal called dharmasastras or smatis all the more important of the which have been published in English. This so-called Hindu law is still applied, throught British Indian in all questions relating to the inheritance, succession, and marriage of Hindu to case, and to Hindu religious usages or institutions. [150]

---

[148] Jemes Hasting, "The Family of Japanies" Encyclopaedia of Religion and ethics (NY, 1901) Vol.5, P.740.

[১৪৯] Jemes Hasting, "The Familyof Jewish" Encyclopaedia of Religion and ethics (NY, 1901) Vol.5, P.741.

প্রাচীন পারস্য জাতির পরিবার সংস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে Encyclopaedia of religion and ethics এ বলা হয়েছে যে,

'Pride in an honoured lineage has always been as characteristic of the iranians as of other peoples. Thus darius traces his descent to Achaemoues (Behistdarius 4-6) and from the 0. Pres, inscriptious we learn the lranian term for family tauma (ib.i.8, 24, 45 etc.) lit, seed' there are however only meagredata on the various degrees of relationship, except for those of husband and wife and of parent and child and for this reason we must especially regret the loss of those protions of the avesta his param Nask which treated of the guardianship of a family.[151]

প্রাচীন রোমান সভ্যতায় পরিবার সম্পর্কে তার বক্তব্য হলঃ

"With characteristic fondness for legal distinction and analysis, the Romans distinguished for relationships in which each individual found him self: (1) The relationship to himself as an individual, (2) that

---

[১৫০] Jemes Hasting, "Family,Hindu" Encyclopedia of Religion and ethics (NY, 1901) Vol.5, P.737.

[১৫১] Jemes Hasting, "Family,Persian" Encyclopedia of Religion and ethics (NY, 1901). Vol.5, P.744.

to this family; (3) That to the group of families which formed his clan. (4) That to the Union of class which composed the state".[152]

এখানে তিনি প্রাচীন রোমান সভ্যতায় পরিবার যে, বংশ বিস্তারের প্রধান মাধ্যম তা উল্লেখ করেন। বস্তুত তাদের মধ্যে তৎকালে চার ধরণের পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এ কথার মাধ্যমে প্রাচীন বিভিন্ন সভ্যতায় যে, পরিবার ও বিবাহের অস্তিত্ব ছিল তিনি তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

Encyclopaedia of Religion by Macmillan- এতে পরিবারের সাধারন প্রয়োজন ও উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে,

"Family is vitally important to most religious traditions in two closely interconnected ways; various vital processes enacted by 'to' and for the family help to create and sustain it as well as give it meaning and it function us an important simbol of deity, Historically and cross culturally, family in various forms has been so basic to human existance as to be a Universal symbol of ultimacy."[153]

যাবতীয় স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ ও মানব বংশ বিস্তার ও নৈতিক শিক্ষা লাভের জন্য পরিবারের উৎপত্তি হয়েছে। যদিও সংস্কৃতি সভ্যতার পবির্তনের সাথে পরিবারের প্রকৃতি ও শ্রেণীভেদ ও পরিবর্তন হয়েছে।

পরিবার সমাজেরই ভিত্তি। রাষ্ট্র সুসংবদ্ধ সমাজের ফলশ্রুতি। পরিবার থেকে শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতার উপর। আবার সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। পরিবারকে বাদ দিয়ে যেমন

---

[১৫২] Jemes Hasting, "Family,Roman" Encyclopaedia of Religion and ethics (NY, 1901) Vol.5, P.746.

[১৫৩] Micro Eliade Edited "Family" Encyclopaedia of Religion (NY; Macmillan publishing com, 1901) Vol.7, P-275.

সমাজের কল্পনা করা যায়না, তেমনি সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রও অচিন্তনীয়। তিন তলা বিশিষ্ট প্রাসাদের তৃতীয় তলা নির্মাণের কাজ প্রথম ও দ্বিতীয় তলা নির্মাণের পরই সম্ভব, তার পূর্বে নয়[১৫৪]।

কয়েকটি ভিত্তির উপর পরিবার গড়ে উঠে, **প্রথমত** স্বভাবজাত প্রবনতা। মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান, শ্রেষ্ঠ উপহার। তার স্বাভাবিকতা ও সর্বোত্তম আচরণকে পরিগ্রহ করে। একাকী বসবাস, বিবাহবিহীন জীবন, পরিবারহীনতা মানুষকে সংকীর্ণ করে দেয়। তাই স্বভাবতই মানুষ পরিবার তথা বয়সের সাথে সাথে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। আর **দ্বিতীয়ত** অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষের উপর কঠিনভাবে প্রভাব ফেলে। তার ফলেই গড়ে ওঠে মননশীল ক্ষুদ্র পরিবার ও বৃহৎ পরিবার।

পরিবারের সদস্যদের জীবন মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সকল কিছু নির্ভর করে পরিবারের কর্তা বা সামগ্রিক ভাবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। এ প্রসঙ্গে এক আরব কবির মতামত উল্লেখ করা যায়:

বিপদ মুসিবতে তার ভাই যখন ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়াজ তোলে, তখন সে তার এ কাজের যুক্তি খুঁজে বেড়ায়না। তখন শুধু বলে:

আমি-নিকটাত্নীয়তার হক আদায় করেছি, তোমার ভাগ্যের শপথ, যখন বিপদের ব্যাপার ঘটবে তখন আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকবো। কোন কঠিন বিপদকালে আমাকে ডাকা হলে আমি তোমার মর্যাদা রক্ষাকারীদের মধ্যে থাকবো, শত্রু তোমার উপর হামলা করলে আমি তোমার পক্ষে প্রতিরোধ করবো।

এখানে কবির উদ্ধৃতি দ্বারা বিপদ মুসিবত কালীন সময়ে পরিবারের সদস্যদের একে অপরের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বহি:প্রকাশ ঘটছে। বস্তুত মানুষ রক্ত ও ধর্মের বাঁধনকে স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন করতে পারেনা। তবে বর্তমান তথা কথিত বিজ্ঞান ও প্রগতির যুগে মানুষের মন মানুষিকতা অনেকটা যান্ত্রিক বা কৃত্রিম রূপ ধারণ করেছে। সেক্ষেত্রে ধর্ম একটি নিছক

---

[১৫৪] মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

আনুষ্ঠানিকতায় অবস্থান নিয়েছে। আর ধর্মের গুরুত্ব হারিয়ে গেলে রক্তের সম্পর্ক অনেকটা আশানুরূপ না থাকারই কথা। আমরা যতই আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছি ততই পরিবার বা তাদের সদস্যরা অনেকটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বার্থপরতায় লিপ্ত হচ্ছে। দায়িত্ব বোধের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিক যোগ হচ্ছে, স্বাধীনতার নামে ধর্মহীনতা ও পারিবারিক শৃংখলা ও ঐতিহ্য ও কাঠামোর বিপরীত আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, আমরা একথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলতে পারি যে, আধুনিক প্রাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণেই বর্তমানে পরিবার বিরোধী মনোভাব এবং স্বাধীনতার নামে পরিবারের কর্তার প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে লক্ষ লক্ষ বছরের গড়া সভ্যতার মূল স্তম্ভ পরিবার আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। এখানে একটি বিশ্লেষণ ধর্মী মতামত পেশ করতে চাই- সৃষ্টিকর্তা মানুষের দেহ অবয়বকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ জোড়া ও লোম কোষের শিরা - উপশিরা সহ অসংখ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংমিশ্রণে তৈরী করেছেন। সবকিছুতেই একটি স্বাভাবিক শৃংখলা ও আনুগত্য দেখা যায়। শরীরের কোন অংশ যদি তার গতিপথ পরিবর্তন করে তখন তা আরেকটি অঙ্গের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে যেকোন দূর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। কারণ এক্ষেত্রে স্বাভাবিক আনুগত্য ও শৃংখলা ব্যহত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন পারিবারিক প্রথার মাধ্যমে, প্রথম মানব হচ্ছেন হযরত আদম (আ.) প্রথম নারী হচ্ছেন হযরত হাওয়া (আ.) তাদের বংশ পরম্পরায় এসেছে হাবিল-কাবিল। ডারউইনের বিতর্কিত মতবাদ ছাড়া পৃথিবীর সকল জ্ঞানী-গুনী বিজ্ঞানী দার্শনিক, ঐতিহাসিক আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে প্রথম মানব-মানবী হিসাবে স্বীকার করেছেন, এবং স্বীকার করেছেন তাদের পারিবারিক প্রথাকে, এক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে এসে কিভাবে তার বিপরীত আচরন বা মত প্রকাশ করতে পারি? যা একটি অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত ধ্বংসম্মুখ চিন্তাভাবনা ছাড়া কিছুই হতে পারেনা। অতীতের দরিদ্র-ক্লিষ্ট একটি বৃহৎ আয়তনের পরিবারের সুখ আর বর্তমানের দুই হতে চার সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সুখ শান্তি লক্ষ্য করলে আমরা অনেকটা অনুধাবনে সক্ষম হব। পারিবারিক অশান্তি একটি আভ্যান্তরীন ব্যাপার। যা বাহ্যিক দৃষ্টি কোন থেকে অবলোকন করা অনেকটা অসম্ভব। তবে সামাজিক অবক্ষয়, ধর্ষন, আত্মহত্যা, শিশু কিশোরদের অতিমাত্রায় অপরাধ প্রবণতা, যুব সমাজের উচ্ছৃংখলতা, যৌতুক প্রথার উত্থান ইত্যাদি পরিবার হীনতা ও কুশিক্ষার ফলেই টর্ণেডোর মত সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে।

ফলে বর্তমান সভ্যতায় নারী পুরুষের সম্পর্ক আর স্বাভাবিক মানবীয় পর্যায় নেই। নিতান্ত পাশবিক ও যৌন উত্তেজনা নির্ভর। এক্ষেত্রে যৌবন ও যৌন উত্তেজনাই ভালবাসার মাধ্যম বা ভিত্তি হিসাবে দাড়িয়েছে। তাই সভ্যতা আজ সঠিক লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হয়ে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রাশ্চাত্য দার্শনিক অধ্যাপক সরোবিন বর্তমান দুনিয়ায় পরিবারের গুরুত্ব কমে যাওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে,

"আমরা বর্তমানে খাবার খাই হোটেল রেস্তোরায়, আমাদের রুটি বেকারী- কনফেকশনারী থেকে তৈরী হয়ে আসে। আর আমাদের কাপড় ধোয়া হয় লন্ড্রীতে। পূর্বে মানুষ আনন্দ লাভ ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে ফিরে যেতো পরিবারের নিভৃত আশ্রয়ে; কিন্তু বর্তমানে মানুষ তার জন্যে চলে যায় সিনেমা-থিয়েটারে, নাচের আসর ও ক্লাব ঘরের সঙ্গীত মুখর বেষ্টনীতে। পূর্বে পরিবার ছিল আমাদের আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও আনন্দ বিনোদনের কেন্দ্রস্থল। পারিবারিক জীবনেই আমরা সন্ধান করতাম শান্তি, স্বস্থি, তৃপ্তি ও আনন্দের নির্মলতা। কিন্তু এখন পরিবারের লোকজন হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত। কিছু লোক একত্রে বাস করলেও তার মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে প্রীতি, মাধুর্য, অকৃত্রিমতা, আন্তরিকতা ও পবিত্রতা। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই মানুষ জীবিকার চিন্তায় অতিবাহিত করে- রাত্রি বেলায় অন্তত পরিবারের সব লোক একত্রিত হত। কিন্তু এখন তারা রাত্রি যাপন করে বিচ্ছিন্ন ভাবে, যার যেখানে ইচ্ছা-সেখানে। এখন আমাদের ঘর আরাম বিশ্রামের স্থান নয়। ঘরে রাত্রি দিন অতিবাহিত করার তো এ যুগে কোন কথাই উঠতে পারেনা। একটা গোটা রাত্রি এখন লোকেরা নিজেদের ঘরে যাপন করবে, তা কেউ পছন্দ করেনা[১৫৫]।

স্বামী স্ত্রী, ভাই বোনের পবিত্র ও স্থায়ী সম্পর্ক যখন ব্যহত হয় তখনি সৃষ্টি হয় মানুষে মানুষে দ্বন্ধ ও সংঘাতময় পরিবেশ। যেই আচরণ- নোংরামী কোন মানুষ নিজের ভাই বোন বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে পছন্দ করেনা, সেই রূপ আচরণ কি করে

---

[১৫৫] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

অপর পরিবারের সদস্য ও সদস্যাদের সাথে করতে পারে। আমার মতে এটি একটি স্ববিরোধী চিন্তা, লাম্পট্য স্বভাব ও আত্মঘাতি চরিত্রেরই নামান্তর।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একজন বিশেষ প্রতিনিধি ড. জেড সেসটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উল্লেখ করেন:

"বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশী লোক বিভিন্ন প্রকারের মানসিক রোগে ভুগছে এবং তাদের যথাযথ মানসিক বিকাশ ঘটে নাই। প্রায় নয় লাখ লোক গুরুতর মানসিক রোগে, ৯০ লাখ লোক আবেগ অনুভূতি, আচরনগত এবং ব্যক্তিত্বের সমস্যায় ভুগছে।" তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশে মনোবিকারগ্রস্থ লোকের ক্রমসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের জন্য স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ পারিবারিক বন্ধন এবং সুস্থ ও আনন্দময় জীবন যাপন একান্ত দরকার"[১৫৬]।

পরিবার সম্পর্কে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী, অগবার্ন নিমকফের মন্তব্য হচ্ছে-"সন্তান সন্ততির অধিকারী বা সন্তান-সন্ততিহীন দম্পতি দ্বারা সৃষ্ট স্থায়ী সংস্থাকেই পরিবার বলা হয়।"

অপরদিকে সমাজ বিজ্ঞানী ইয়াংওম্যান এর মতে,

"পরিবার বলতে এমন একটি সংস্থাকে বুঝায়; যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে বসবাস করে এবং এর ভিত্তি হচ্ছে রক্ত ও বিবাহের সম্পর্ক।"

উপরের দুটি সংজ্ঞাকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাই যে, অর্গবার্ণ ও নিমকফের সংজ্ঞার সাথে ইয়াংওম্যানের সংজ্ঞার সুক্ষ্ম একটি পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম সংজ্ঞায় ঐ সকল দম্পতিদের কথা বলা হয়েছে যারা সন্তান সন্ততির অধিকারী অথবা যারা সন্তান-সন্ততিহীন। অর্থাৎ এখানে স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিই পরিবারের সদস্য। কিন্তু ইয়াংওম্যানের সংজ্ঞায় আমরা দেখি যে, শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিই নয় বরং রক্ত ও

---

[১৫৬] আজিজুর রহমান নোমানী, ইত্তেফাক, ২৫শে নভে' ১৯৮০ খৃ. ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন, (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯ খৃ.) পৃ. ৪-৫।

বৈবাহিক সম্পর্কিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে বসবাস করলে প্রত্যেকেই পরিবারের সদস্য হবে। সুতরাং দুটি বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মতানুসারে আমরা দুই শ্রেণীর পরিবার লক্ষ্য করি।

(১) একক বা ক্ষুদ্র পরিবার।

(২) যৌথ বা যুক্ত পরিবার।

অবশ্য পরিবার সম্পর্কে সবচেয়ে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য মতামত প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক ম্যাকাইভার, তিনি বলেন:

> "The family is a group defined by a Sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children".[157]

আমরা ম্যাকাইভারের মতামত থেকে পরিবার গঠনের তিনটি মৌল উদ্দেশ্য খুঁজে পাই। তাঁর মতে এ তিনটি উদ্দেশ্য হলো:

(১) মানুষের যৌন বাসনা পূরণ, যেহেতু যৌনাবেগ মানুষসহ সকল প্রাণীরই স্বভাজাত ধর্ম।

(২) সন্তান উৎপাদন ও সন্তান লালন-পালন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং

(৩) সন্তান লালন-পালনের সাথে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জড়িত।

এই তিনটি মৌলিক প্রয়োজন মানুষকে পরিবার গঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

এই মত সমর্থিত হয় রবীন্দ্রনাথের একটি কথায় :

---

[১৫৭] Maceiver and Society, page : 238.

"জীব প্রকৃতি ও সমাজ প্রকৃতি এই দ্বৈরাজ্যের শাসনে মানুষ চালিত এবং বিবাহ জিনিসটা সভ্য সমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা'[১৫৮]।

উপরোক্ত তিনটি মৌলিক প্রয়োজনকেই উল্লেখ করেছেন W.J.good: তিনি মন্তব্য করেন:

> "For these reasons, man must live in some Sov't of family grouping, to be fed, protected, and taught what nature has not provided."[159]

এই উদ্ধৃতির সূত্রে বলা যায় যে, মানব শিশু বেঁচে থাকার সব কৌশল ও শক্তি ইতর প্রাণীর মত জন্মসূত্রে লাভ করেনা। তাকে অনেক কিছু শিখতে হয় এই উদ্দেশ্যে নানা প্রকার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, পরিবার তাদের একটি।

সুতরাং এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, পরিবার গঠন মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা। একজন পুরুষ ও একজন নারী বৈধ পন্থায় সম্পর্কিত হয়ে তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে ক্ষুদ্র সামাজিক একক তাই হল পরিবার। আর এ ধারাবাহিকতার পরিনামে পৃথিবীতে বংশ, গোত্র, জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবারের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তার উপর আল কুরআন ও হাদীছের ভাষ্য এবং বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষ্যের মধ্যে সামান্য প্রার্থক্য থাকলেও মৌলিকভাবে সকলেই এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে,কিছু অনুমিত শর্তের ভিত্তিতে পরিবার গঠিত হয়। এগুলি হলো :

(১) মূলত বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে পরিবারের সৃষ্টি।

---

[১৫৮] রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ, খ.১৩, পৃ. ০৫।

(২) ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে পুরুষ পরিবারের রাজা আর নারী রাণীর ভূমিকায় থাকবে।

(৩) পারিবারিক সম্পর্ক স্থায়ী।

(৪) পরিবারের সন্তান-সন্ততি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে।

(৫) পরিবারের মাধ্যমে রক্তের সম্পর্ক বিকাশ লাভ করে।

(৬) একটি আদর্শ পরিবারে অবশ্যই দুয়ের অধিক সদস্য থাকবে।

(৭) পরিবার দু'ধরনের, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ।

(৮) পরিবারের সদস্যগণ একত্রে বসবাস করে বা করার জন্য মত প্রকাশ করে।

(৯) পরিবার গঠনের পেছনে সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্য থাকে।

(১০) একটি পরিবারের শান্তি শৃংখলা বিরাজ করে আনুগত্য ও শৃংখলাবদ্ধতার উপর।

(১১) পরিস্থিতির আলোকে পিতা, মাতা, বড় ভাই পরিবারের কর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(১২) বিয়ের অন্যতম প্রধান শর্তগুলো, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, প্রস্তাব-গ্রহণ, স্বামী, মোহর নির্ধারণ, আনুষ্ঠানিক চুক্তি।

সুতরাং পরিবার হচ্ছে, রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃংখলার উদ্দেশ্যে দুয়ের অধিক ব্যক্তির স্থায়ী ভাবে একত্রে বসবাস করা।

---

[159] W.J. good, the family, p.13.

পরিবারের কার্যাবলী

একটি সুষ্ঠু পরিবার সুস্থ নাগরিক জীবন গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। বরং বলা যায়, সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের জন্য পরিবারই হচ্ছে প্রথম স্বাভাবিক বীজ কেন্দ্র[১৬০]। ইসলাম পরিবার নামক প্রাচীন ও শ্বাশত প্রতিষ্ঠানকে টিকে রাখার জন্য পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের সমন্বিত আবার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

ইসলামী বা মুসলিম পরিবারের কতিপয় দায়িত্ব (Duty):

(ক) **আত্নীয় স্বজনের অধিকার**: ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের সদস্যদেরকে অবশ্যই আত্নীয় স্বজনের হক আদায় করতে হবে। আল্লাহতা'আলা কুরআন মাজীদে পিতা মাতার পরই নিকটাত্মীয়দের হকের কথা বলেছেন। আত্নীয়দের অধিকার বলতে বুঝায় তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, ভালো ব্যবহার করা, খোঁজ খবর নেয়া, যারা দরিদ্র তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের মেহমানদারী করা, পরিচর্যা করা, তাদের কোন প্রকার হক নষ্ট না করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা[১৬১]।

ইসলামী শরী'আত নিকটাত্মীয়দের অধিকার আদায় করা মুসলিম পরিবারের প্রতি ওয়াজিব করে দিয়েছেন, এই নির্দেশিকা সকল যুগে সকল নবীদের উম্মতদের উপর কার্যকর ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী :

'বনী ইসরাইলদের নিকট থেকে আমরা সঠিক ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো গোলামী করবে না, ভালো ব্যবহার করবে পিতা মাতার সাথে, নিকটাত্মীয়দের সাথে'[১৬২]।

এ সম্পর্কে মহানবী (স.) এর বাণী হচ্ছে ,

"রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।"[১৬৩]

---

[১৬০] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[১৬১] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

[১৬২] আল কুরআন, সুরা বাকারা ২ : ৮৩।

[১৬৩] বুখারী শরীফ।

তিনি আরও ইরশাদ করেন যে, "রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা আরশের সাথে ঝুলে থেকে বলে, যে আমাকে রক্ষা করলো আল্লাহ ও তাকে রক্ষা করবেন আর যে আমাকে ছিন্ন করলো আল্লাহ ও তাকে ছিন্ন করবেন'[১৬৪] ।

আল্লাহ তা'আলা নিকটাত্মীয়দের সেবা করার প্রতি এত বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন যে, ঈমানের পর পরই তার অবস্থান নির্ণয় করে দিয়েছেন। যেমন তাঁর বাণী :

"আর কিন্তু প্রকৃত পূণ্যের কাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহকে, পরকালকে, ফেরেশতাদেরকে, আল কিতাবকে ও নবীদেরকে মান্য করবে আর আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ধন সম্পদ দান করবে নিকটাত্মীয়দের'[১৬৫] ।

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে,

"তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করোনা- আর ভালো ব্যবহার করো বাবা মার সাথে, নিকটাত্মীয়দের সাথে'[১৬৬] ।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দাসত্বের পর পরই পিতা মাতার হক অত:পর প্রতিবেশী বা নিকটাত্মীয়দের হকের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী :

আল্লাহ তা'আলা সুবিচার অনুগ্রহ ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন'[১৬৭] ।

সুরা বণী ইসরাঈলে বলা হয়েছে:

"নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার প্রদান করো'[১৬৮] ।

---

[১৬৪] বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

[১৬৫] আল কুরআন, সুরা বাকারা ২:১১৭।

[১৬৬] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪: ৩৬।

[১৬৭] আল কুরআন, সুরা নহল ১৬ : ৯০।

[১৬৮] আল কুরআন, সুরা বণী ইসরাঈল ১৭ : ২৬।

'তোমরা সেই মহান আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে পরস্পরের নিকট নিজেদের হক দাবী করো আর নিকটাত্মীয়তার সম্পর্কেও ভয় করো'[১৬৯]।

উক্ত আয়াতে আত্মীয়দের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ- আত্মীয়স্বজনদের হকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে অবশ্যই জওয়াব দিতে হবে। যারা নিকটাত্মীয়দের হক বিনষ্ট করে তাদেরকে হিসাবের বেলায় বিন্দুমাত্রও ছাড় দেওয়া হবেনা।

বস্তুত ইসলাম শুধুমাত্র ধর্মের নামই নয়, ইসলাম একটি বিপ্লব বা জীবন ব্যবস্থার নামও বটে। যেখানে অধিকাংশ বিষয়ই সমাজ কেন্দ্রীক। এখানে নিজের অধিকার আর অন্যের অধিকারকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল, পিতা-মাতার পরই নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের হকের কথা বলা হয়েছে।

খ. উত্তরাধিকার :

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার বংশধর, সন্তান সন্ততি বা নিকটাত্মীয়দের যে অধিকার রয়েছে। ইসলামের বা মুসলিম পারিবারিক আইনে সেই অধিকারকে উত্তরাধিকার বলা হয়। এটি একটি ফরয কাজ। নারী পুরুষ উভয়েই উত্তরাধিকার লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষণা করে দিয়েছেন:

"পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। নারীদের জন্যেও পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে, চাই তা কম হোক বা বেশী হোক। এ অংশ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয'[১৭০]।

বর্তমান সভ্য জগতে এসে কুরআন নির্ধারিত মিরাস বা উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণরূপে অমান্য করা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির পুরুষ সন্তানদের নারী সন্তানদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরিমাণ মত বন্টন করা হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের মাঝে সমবন্টন করা

---

[১৬৯] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ০১।

[১৭০] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ৭।

হয়। আবার কখনও বা পুরুষদেরকে বেশী কম দিয়ে একটা ফাসাদের জন্ম দেয়। কখনও মেয়েদেরকে সামান্য কিছু দিয়ে অবশিষ্টাংশ পুরুষরা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। এর কোনটি ইসলামী শরী'আতে নির্ধারিত মিরাসী আইন সিদ্ধ নয়। ইসলামী শরী'আত এক্ষেত্রে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগান্তকারী সূত্র বলে দিয়েছে: "পুরুষ নারীর দ্বিগুন পাবে।"

কারণ মেয়েদের উত্তরাধিকার পাওয়ার খাত অনেক বেশী। তাছাড়া দুই একটা ব্যতিক্রম থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ সন্তানের বেশী ভূমিকা থাকে। তবে কোন অবস্থাতেই মেয়েদেরকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা। আমাদের সমাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েরা তাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি গ্রহণ করাকে ভাল চোখে দেখেনা।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদূদী (র.) লিখেছেন:

"এ আয়াতে সুস্পষ্ট রূপে দুটি আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক- মীরাস শুধুমাত্র পুরুষদের প্রাপ্য নয়, মহিলারাও এর হকদার হবে। দুই - মীরাস অবশ্যই বন্টন হতে হবে, তার পরিমাণ যতোই কম হোক না কেন। এমনকি মৃত ব্যক্তি এক গজ কাপড় রেখে গেলেও এবং তার দশজন উত্তরাধিকারী থাকলেও উক্ত কাপড়কে দশ খন্ডে বিভক্ত করতে হবে। অবশ্যই একজন ওয়ারিশ আরেকজন ওয়ারিশ থেকে ক্রয় করতে পারবে। এ আয়াত থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মীরাসী আইন স্থাবর, অস্থাবর, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সকল প্রকার ধন সম্পত্তির উপর কার্যকর হবে'[১৭১]।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে মিরাসী আইন পালনকারী ও পরিত্যাগকারীর প্রতি শুভ সংবাদ ও দু:সংবাদ ঘোষণা করেছেন :

("উপরে মীরাস বন্টনে যার যে অংশ ধার্য করা হলো) তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত আইন। যে লোক আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলকে মেনে নেবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হতে থাকবে আর এ জান্নাতে সে চিরদিন থাকবে। প্রকৃত পক্ষে এ হচ্ছে বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ তা'আলা ও তার

রাসুলের (স.) নাফরমানী করবে আর তাঁর নির্ধারিত আইন সমূহ লংঘন করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে আর তার জন্যে রয়েছে অপমান কর শাস্তি'[১৭২]।

বস্তুত মীরাস কারো করুণা বা দয়া নয় বা করো জন্য অপমান জনক কাজও নয়। মীরাস গ্রহণকে হীনমন্যতায় ভোগা যাবেনা বা দেয়ার ক্ষেত্রেও কৃপণতা করা যাবেনা, এটি আল্লাহ তা'আলা কতৃক নির্ধারিত আইন বা সীমা, অবশ্যই পালনীয় একটি বিধান। ইসলামের পরিবারিক আইনেই এর পুঙ্খনাপুঙ্খ ব্যাখ্যা বা বিধান রয়েছে। অন্য কোন ধর্ম বা গোত্রে এ ধরনের নিয়মনীতি নেই, কিঞ্চিত থাকলেও অত্যন্ত ঢিলা ঢালা গোছের পদ্ধতি। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মীরাস অমান্যকারীদের প্রতি কঠিন শাস্তির হুশিয়ার করেছেন। আবার পালনকারীদের প্রতি মহান পুরস্কারের শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন। ইসলাম নারীর অধিকার পূর্ণরূপে কার্যকর করতে চায়, তাই মীরাসী আইনের ব্যাপারে এত কঠোরতা। কোন মৃত্যু পথযাত্রীর অসহায় অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে অন্য ওয়ারিশকে প্রতারিত করে নিজের পক্ষে পরিত্যক্ত সম্পত্তি লিখে নেয়া যাবেনা, এটি জাহান্নামের একটি জলন্ত আগুন।

কোন মহিলা মীরাসী আইন বা তার হক বুঝতে না পারলে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে হবে।

প্রতিবেশীর অধিকার :

মহানবী (স.) প্রতিবেশীদের সাথে সু সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। মুসলিম পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিবেশী বা নিকটতম পরিবার বা জনগোষ্ঠির সাথে মধুর সম্পর্ক থাকবে। বাস্তবিক পক্ষে ইসলাম আত্মীয় স্বজনের চেয়ে প্রতিবেশীর উপরে বেশী গুরুত্বারোপ করেছে।

---

[১৭১] তাফহীমুল কুরআন, সুরা নিসা, টীকা: ১২।

[১৭২] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪: ১৩-১৪।

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"তোমাদের উপর প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে। সেই সাথে মিসকীন ও মুসাফিরদের প্রতিও আর তোমরা অধিক অপচয় করবেনা"[১৭৩]।

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলার শপথ সে মুমিন নয়। আল্লাহ তা'আলার শপথ সে মুমিন নয়, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে ব্যক্তি? রাসূল (স.) বললেন, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নয়"[১৭৪]।

আল্লাহ তা'আলা প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে আরও বলেন: "তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক করোনা, আর মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূরবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভূক্ত যারা তাদের সাথেও। আল্লাহ তা'আলা কখনও ভালোবাসেন না দাম্ভিক ও অহংকারীকে[১৭৫]।

হযরত 'আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, "জিব্রাইল (আ.) একাধারে আমাকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্যে তাকিদ করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হল যে, অচিরেই হয়ত এক প্রতিবেশীকে অপর প্রতিবেশীর উত্তরাধিকার বানিয়ে দেয়া হবে"[১৭৬]।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীকে অভূক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খায় সে মুমিন নয়"[১৭৭]।

---

[১৭৩] আল কুরআন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ২৬।

[১৭৪] বুখারী মুসলিম, বাবুল হুকুকুল জিল কুরবা, রাহে আমল, অনুবাদ: এ, বি, এম আব্দুল খালেক মজুমদার, পৃ. ১৫৩।

[১৭৫] আল কুরআন, সুরা **বনী ইসরাঈল ১৭:২৬**

[১৭৬] বুখারী মুসলীম, বাবুল ওসিয়াতু ফি হুকুকুল আকরাবীন। সহীহ আল বুখারী, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী) ৫ম খন্ড পৃ. ৪০৪, হাদীছ নং ৫৫৮০।

[১৭৭] মিশকাতুল মাসাবীহ, ফি হু-কুকুল আকরাবীন।

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (স.) ইরশাদ করেন-"জিব্রাইল (আ.) সব সময় প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে অসি'আত করতে থাকেন। শেষে আমার ধারণা হল যে, হয়ত অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।"[১৭৮]

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেন, "হে মুসলিম নারী সমাজ! কোন প্রতিবেশী কখনো যেন তার প্রতিবেশীকে (তার প্রেরিত উপহারকে) অবজ্ঞা না করে এমনকি তা বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর হলেও।"[১৭৯]

এই হাদীসে প্রতিবেশীর প্রতি হাদীয়া পাঠানো এবং প্রতিবেশী কতৃক প্রেরিত হাদীয়া নগণ্য হলেও গ্রহণ করার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে নবী করীম (স.) আরও ইরশাদ করেন, হযরত 'আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, "আমি রাসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। তাদের কার কাছে আমি হাদীয়া পাঠাবো? তিনি বলেন : যার দরজা তোমার বেশী নিকটে।"[১৮০]

নিজের ভাল মন্দ জানার মাপকাঠি হল প্রতিবেশী। "এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ওগো আল্লাহর রাসূল (স.) আমি ভাল কাজ করছি না মন্দ কাজ করছি তা জানার উপায় কি? তিনি বললেন : যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে তুমি ভাল করেছো, তবে তুমি প্রকৃতই ভাল করেছো। আর যখন প্রতিবেশীরা বলবে তুমি মন্দ করেছো তবে তুমি মন্দ কাজ করেছো।"[১৮১]

বস্তুত প্রতিবেশী বলতে বুঝায়, নিজের পরিবারের অফিস, বাসার দূরত্বের থেকে যিনি সবচেয়ে কাছের। নিজের আত্মীয় স্বজনদের চেয়েও প্রতিবেশীর হক অনেক বেশী। কারণ বিপদ

---

[১৭৮] বুখারী শরীফ, বাবুল ওসিয়াতু ফিল আকরাবীন।

[১৭৯] বুখারী মুসলীম, বাবুল লা তাহকিবান্না লি জারাতান।

[১৮০] সহীহ আল বুখারী, অনুচ্ছেদঃ দরজার নৈকট্য অনুযায়ী প্রতিবেশীর হক।

[১৮১] হাদীছ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, ইবন মাযাহ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত।

-আপদে সর্বপ্রথম কাছের লোকটাই এগিয়ে আসে, সর্বোপরি কিয়ামতের দিন নিকটতম প্রতিবেশীর সাথেই হাশর হবে। এ জন্য উত্তম ও মুত্তাকী প্রতিবেশী বাছাই করা উচিত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও মহানবীর (স.) যুগান্তকারী উপদেশের আলোকে ইসলামী বা মুসলিম পরিবারের সদস্যদেরকে প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

চাকর চাকরাণীর অধিকার :

ইসলামী পরিবারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট চাকর-বাকর, চাকরাণীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ কথা বার্তায় আমাদের সাথে তাদের পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবেনা। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন :

আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন,

তোমাদের চাকর-চাকরাণী ও দাস-দাসীরা প্রকৃত পক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেনো তাই খওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোন কাজ যেন না চাপায়। একান্ত যদি চাপানো হয়, তবে তা সমাধান করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা উচিত[১৮২]।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স.) এর সর্বশেষ বাণী ছিল-(১) নামায, নামায, নামায এবং (২) যারা তোমাদের অধীনে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর[১৮৩]।

রাসূল (স.) আরো ইরশাদ করেন :

---

[১৮২] আব্দুল গাফ্ফার হাসান নদভী ,অনুবাদ-আব্দুস শহীদ নাসিম, বুখারী মুসলীম, এন্তেখাবে হাদীছ, চাকর চাকরানীদের অধিকার অধ্যায়।

[১৮৩] মাল আদাবুল মুফরাদ, এন্তেখাবে হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

"যখন তোমাদের চাকর চাকরানী তোমাদের জন্য খানা তৈরী করে এনে হাযির করে, তখন নিজেদের সাথে বসিয়ে তাকে খাওয়াবে। কেননা সে ধোঁয়া ও তাপ সহ্য করেছে। আর খানা যদি পরিমাণে কম হয় তবে অন্তত দু এক মুষ্টি তার হাতে দেবে[১৮৪]।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে আমরা চাকর চাকরানীদেও সম্পর্কে নিম্নেক্ত নির্দেশিকা পেলাম:

(১) চাকর-চাকরানীদের মর্যাদা হচ্ছে দ্বীনি ভাই বোনের মর্যাদা।

(২) পরিবারের সদস্যরা যা খাবেন তাদেরও তাই খাওয়াতে হবে।

(৩) পরিবারের সদস্যরা যে ধরণের পোষাক পরিধান করেন, তাদেরও সে ধরণের পোষাক পরাবেন।

(৪) সাধ্যের বাইরে কোন কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবেনা।

(৫) কোন কঠিন কাজ করতে দিলে তাতে তাদের সহযোগিতা করতে হবে।

(৬) নিজেদের সাথে একত্রে বসিয়ে তাদের খাওয়াতে হবে।

অতএব আমাদের প্রিয় নবী (স.), দু:খী মানুষের একান্ত বন্ধু রাসূল (স.) এর আলোচ্য নির্দেশ অনুযায়ী পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট চাকর-চাকরানীদেরকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম মর্যাদায় যাবতীয় অধিকার পরিপূর্ণ ভাবে প্রদান করতে হবে। তাদের সাথে কোন কিছুতেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবেনা।

মেহমানের অধিকার:

ইসলামী দাম্পত্য জীবনে একটি পরিবারকে বিভিন্নমুখী মানব কল্যাণে অংশ গ্রহণ করতে হয়। কল্যাণমুখী কর্মকান্ডের অন্যতম দিক হলো আতিথেয়তা, বস্তুত: মেহমানের সম্মান ও সেবা যত্ন করা ঈমানের দাবীও বটে। আল্লাহ তা'আলার বাণী,'তোমার কাছে কি ইব্রাহীমের মেহমানের খবর এসেছে? [১৮৫]

---

[১৮৪] মুসলীম শরীফ।

[১৮৫] আল কুরআন, সুরা আয্ যারিয়াত ৫১:২৪।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"[১৮৬]

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

"তোমার কাছে কি ইব্রাহীমের মেহমানদের খবর এসেছে?" এই হাদীসে মেহমানদারীকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আবু শুরাইহ আল কা'বী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে। একদিন এক রাত তাকে উম্মত রূপে আপ্যায়ন এবং তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করতে হবে। এর অধিক সাদকা হিসাবে গণ্য হবে। আর মেজবানের কষ্ট হতে পারে এত দীর্ঘ সময় কোন মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়।"[১৮৭]

আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রা.) একদল লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। তিনি (পুত্র) আব্দুর রহমানকে বললেন, আমি নবী করীম (স.) এর কাছে যাচ্ছি। আমি ফিরে আসার পূর্বেই তুমি মেহমানদের আপ্যায়নের কাজ শেষ করবে। আব্দুর রহমান (রা.) উপস্থিত বাড়িতে যা ছিল তা মেহমানদের সামনে পেশ করে বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। মেহমানগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের বাড়ির মালিক কোথায়? আব্দুর রহমান (রা.) বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন বাড়ির মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা খাবনা। তিনি বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমানদারী কবুল করুন। যদি আপনারা খাবার না খান এবং তিনি ফিরে এসে তা দেখেন তবে আমাদেরকে তার অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তবু

---

[১৮৬] সহীহ আল্‌ বুখারী, দশম অধ্যায়, সহীহ্‌ আল বুখারী , (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী) পৃ. ৪৫১, হাদীছ নং ৫৬৯৭।

[১৮৭] বুখারী শরীফ, বাবুন ফি হুকুকুদ-দইফ, সহীহ্‌ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১, হাদীছ নং ৫৬৯৫।

ও তারা খেতে অস্বীকার করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি (আব্বা) আমার উপর অবশ্যই ক্ষুব্ধ হবেন। তিনি ফিরে এলে আমি নিজকে আড়াল করার জন্য একপাশে সরে গেলাম। তিনি এসে জানতে চাইলেন, তোমরা কি করছো? তখন তারা তাকে সবকিছু জানালেন। তিনি ডাকলেন হে আব্দুর রহমান। আমি চুপ থাকলাম। তিনি আবারও ডাকলেন হে আব্দুর রহমান। এবারও আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন ওরে মুর্খ্য, আমি তোকে আল্লাহ তা'আলার কসম দিচ্ছি, যদি আমার কথা শুনতে পেয়ে থাকিস। তখন আমি সামনে এসে বললাম, আপনি আপনার মেহমানকে জিজ্ঞেস করুন। তারা বললেন, সে ঠিকই বলেছে, আমাদের সামনে সে খাবার নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে আবু বকর (রা.) বললেন, তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করছো। আল্লাহর কসম! আমি আজ রাতে খাবনা। মেহমানগণ বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি না খেলে আমরাও খাবনা। আবু বকর (রা.) বললেন, আমি আজকের মত খারাপ রাত দেখিনি। তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কেন মেহমানদারী কবুল করছো না? (তারপর বললেন) খাবার নিয়ে এসো। আব্দুর রহমান খাবার নিয়ে আসলেন। এখন তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাবার খেতে শুরু করলেন এবং বললেন : প্রথম শয়তানের কারণে হয়েছিল। সুতরাং তিনিও খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন।"[১৮৮]

বস্তুত একটি আদর্শ পরিবার তথা ইসলামীক পরিবারের সদস্যদের বহুবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। সদস্যদের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব কর্তব্য,দাম্পত্য জীবনের অধ্যায় মাতা-পিতা ও সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য বা অধিকার অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এই অধ্যায়ে পরিবারের সদস্যদের পরিবারের বাইরের কর্তব্য বা কার্যাবলী আলোচিত হল। একটি ইসলামী পরিবার জান্নাতের এক টুকরো বাগানের মতই। যা থেকে কোন প্রর্থনাকারী বঞ্চিত হয়না। পরশ পাথরের মতই এখানে এসে সবাই সিক্ত হয়ে যায়। একটি সমাজকে সুন্দর করে গড়তে হলে ইসলামী বা মুসলিম পরিবারের প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

---

[১৮৮] সহীহ্ আল বুখারী;বাবুল হুকুকু ফিদ-দইফ।

৪র্থ অধ্যায়

দাম্পত্য জীবন ; স্বামীর কর্তব্য বা স্ত্রীর অধিকার, স্বামীর ক্ষমতা, স্ত্রীর কর্তব্য বা স্বামীর অধিকার,স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌথ দায়িত্ব ।

দাম্পত্য জীবন

বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত। মানুষের জীবনের শারীরিক, মানুষিক ও নৈতিক সুখ-শান্তি, দাম্পত্য জীবনের উপর নির্ভরশীল। একজন পুরুষ একজন নারী বিবাহের সূত্র ধরে একে অপরের প্রতি অধিকার কর্তব্য লাভ করে। দাম্পত্য জীবনকে সুখী সমৃদ্ধশালী করার জন্য তাদের দুজনের উপর সে অধিকার লাভ করবে যা আল্লাহ ও তার রাসূল তাদেরকে দিয়েছেন। পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী শারী'আত উভয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। পারিবারিক জীবন সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করার জন্যে স্বামী - স্ত্রী একে অপরের প্রেম, ভালাবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ, উদারতা উভয়ের সমন্বিত চিন্তা পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দাম্পত্য জীবনের মূল লক্ষ্য হলো দৈহিক আত্ম-তৃপ্তি ও বিশ্ববাসীর জন্যে এক পূত পবিত্র ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিনিধি উপহার দেয়া। বস্তুত "তাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের থাকতে হবে নিষ্কলুষ আন্তরিকতা, সুনিবিড় প্রেম ও ভালবাসা এবং আবেগ উদ্দীপক সহযোগিতা" ও সমব্যাথী[১৮৯]।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

"তাদের সাথে সৎ ভাবে জীবন-যাপন করবে; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃনা কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃনা করতেছ[১৯০]। অতএব "একটি নর ও একটি নারী বিবাহ সূত্রে একত্রিত হয়ে সুষ্ঠ পারিবারিক জীবন যাপনকে বলা হায় দাম্পত্য জীবন"[১৯১]।

দাম্পত্য জীবন কোন ক্ষনস্থায়ী বিষয় নয়। একটি দাম্পত্য জীবন থেকে সূত্রপাত হয় একটি জাতির। এসুত্রের মাধ্যমে একটি ভবঘুরে মানুষ সামাজিক ও দায়িত্ববোধে জাগ্রত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মস্পৃহায় আত্ম নিয়োগ করে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি নির্ভরশীল। তাদের উভয়ের উপর উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর

---

[১৮৯] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

[১৯০] আলকুরআন, সুরা নিসা ৪ : ১৯।

[১৯১] মাও. আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী) পৃ.১৬৮।

দাম্পত্য জীবনকে মাধুর্যময় ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য মহানবী (স.) এর বাণী :

সুলাইমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন-আল আহওয়াচ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতা আমর ইব্‌ন-আল আহওয়াচ (রা.) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন: তিনি রাসুলে করীম (স.) এর সঙ্গে বিদায় হজ্বে উপস্থিত ও শরীক ছিলেন। সেই সময়ে এক ভাষণ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স.) সর্ব প্রথম আল্লাহর হামদ্ ও সানা উচ্চারণ করেন। অত:পর অনেক ওয়ায ও নসীহত করেন, এই ভাষণেই তিনি বলেন: লোকগণ! সাবধান হও। নারীদের প্রতি তোমরা কল্যাণকামী হও এবং তাদেও কল্যাণ প্রসঙ্গে যে নছীহত করেছি তা কবূল কর। মনে রেখ অবস্থা এইযে, তারা তোমাদের হাতে বাঁধা তোমরা তাদের নিকট হতে উহা ছাড়া আর কিছুই পাবার অধিকারী নও। তবে যদি তারা কোন রূপ স্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করে , যদি তারা এইরূপ কিছু করে, তা হলে শয্যায় তাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর। আর শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে তাদেরকে মার তবে জঘন্য ও বীভৎস ধরনের নয়। এর পর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়, তা হলে তাদের ব্যাপারে একবিন্দু সীমালংঘন করবে না, তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের উপর অধিকার আছে। আর তোমাদের স্ত্রীদের ও অধিকার আছে তোমাদের উপর। তা এইযে, তোমরা যাদেরকে অপছন্দ কর তারা তোমাদের শয্যা মাড়াইবে না।, অনুরূপ ভাবে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর না, তাদেরকে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিবেনা। আর জেনেলও তোমাদের উপর াতদের অধিকার হল তাদের যাওয়া ও পরার ব্যাপারে তাহাদের প্রতি তোমরা অধিক মাত্রায় মহানুভবতা ও অনুগ্রহমূলক আচরন গ্রহণ করবে[১২২]।

---

[১২২] তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ, মাও.মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীছ শরীফ খ.৩, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী) পৃ. ১৮২।

স্বামীর কর্তব্য বা স্ত্রীর অধিকার :

মোহরানা

মোহরানা কি?

ইসলামী দাম্পত্য আইনে পুরুষকে যেগুলো মৌলিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে প্রথম অপরিহার্য্য বিষয় হল মোহরানা।

বিয়ে হল নারী পুরুষের মধ্যকার ইসলামী শরী'আতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি স্থায়ী চুক্তি। বিয়ের অন্যতম চুক্তি হচ্ছে মোহর। মোহর নির্ধারণ ছাড়া যেমনি বিবাহ শুদ্ধ হওয়া অকল্পনীয়, তেমনি আবার মোহর পরিশোধ ব্যতীত স্ত্রী স্পর্শ করাও সম্পূর্ন হারাম। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিয়ে মোহর দিয়ে শুরু হয়। আর তা হচ্ছে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ.) এর মধ্যকার ঐশ্বরীক বিয়ে। বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মাদ (স.) এর প্রতি তিনবার দরুদ প্রেরণের মধ্য দিয়ে সেই মোহরানা ও বিয়ে শুদ্ধ হয়।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

"নিজেদের 'সম্পদের' বিনিময়ে তাদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"[১৯৩]

"মোহর হচ্ছে সে জিনিষ যার বিনিময়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুপ্তাঙ্গ বৈধ করে নাও।"[১৯৪]

বস্তুত "দেনমোহর বলতে এমন অর্থ সম্পদ বুঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, হয় বিয়ের সময়ই তা দার্য হবে নয় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজীব হবে।"[১৯৫]

---

[১৯৩] আল কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ২৪।

[১৯৪] হাদীছ শরীফ, মুসনাদ আহমদ।

[১৯৫] রুদ্দুল মুখতার আলা দারুল মুখতার,খ.২, পৃ. ৪৫২।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

মোহরানা অশ্যই পরিশোধযোগ্য বিষয়। যা পরিশোধ না করলে স্ত্রীর যোনাঙ্গ এমন কি দেহ স্পর্শ করা ও সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। পবিত্র কুরআন মজীদের বাণী :

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের থেকে যে স্বাদ গ্রহণ কর তার বিনিময়ে অপরিহার্য ফরয হিসেবে তাদের মোহর পরিশোধ কর।"[১৯৬]

অর্থাৎ তোমরা পুরুষরা বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কার্য সম্পাদন করে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ তার বিনিময়ে তাদের প্রাপ্য মোহরানা পুরাপুরি তাদের নিকট আদায় করে দাও, আদায় কর এ হিসেবে যে, তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।"[১৯৭]

আল্লাহর ঘোষণা হলো:

"এবং মেয়েদের অলিদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে কর এবং তাদের মোহরানা প্রচলিত নিয়মে ও সকলের জানামতে তাদেরকেই আদায় করে দাও।"[১৯৮]

ইব্ন-আল আরবীর মতে "মহান আল্লাহ মোহরানাকে বিনিময় স্বরূপ ধার্য করেছেন এবং যাবতীয় পারস্পরিক বিনিময় সূচক ও একটা জিনিসের মুকাবিলায় আর একটা জিনিষ দানের কারবার ধরে দিয়েছেন।"[১৯৯]

সাহল থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী (স.) এর কাছে এসে নিজকে তার খেদমতে পেশ করলেন। তিনি বলেন: বর্তমানে আমার কোন মহিলা প্রয়োজন নেই। অত:পর জনৈক ব্যক্তি বলল; হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী করীম (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নিকট কি আছে? সে বলল; আমার কাছে কিছুই নেই। নবী করীম (স.) তাকে বললেন। কিছু দাও, একটি লোহার আংটি হলেও। সে উত্তর দিল আমার কিছুই নেই। নবী করিম (স.) বললেন কোরআনের কি পরিমাণ তোমার মুখস্থ আছে? সে উত্তর দিল, এই পরিমাণ,

---

[১৯৬] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ২৪।

[১৯৭] মহাসিনুত তাবীল, খ.৫, পৃ.১১৮৭।

[১৯৮] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ৪৫ ।

[১৯৯] আহকামুল কুরআন, খ.১, পৃ.৩১৭ ।

এই পরিমাণ, নবী করীম (স.) বললেন তুমি যে পরিমাণ কোরআন জান তার বিনিময়ে তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম[২০০]।

এটি একটি বিশুদ্ধ হাদীছ, মোহরানা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইহা অন্যতম প্রধান দলীল। বিশ্ব নবীর জীবনের বাস্তব ঘটনা দিয়ে তা প্রমাণিত। মোহরানা অবশ্যই আদায় করতে হবে। পরিমাণ নিয়ে এখানে মুখ্যতা নয় বরং উভয়ের অবস্থার আলোকে অন্তত সামান্য কিছু হলেও। উক্ত হাদীসে অনোন্যপায় হয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কিছু অংশ তাকে উৎসর্গ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামী শরী'আতে স্ত্রীকে মোহর পরিশোধ করা স্বামীর প্রতি ফরয করে দেয়া হয়েছে। এ হচ্ছে স্ত্রীর মর্যাদার অন্যতম অংশ। জাহেলী যুগে মোহরের কোন প্রচলন ছিলনা। নারী ছিল তখন ভোগের সামগ্রী মাত্র। মহানবী (স.) বিয়ের শর্ত হিসেবে নারীর অলংকার স্বরূপ মোহর ধার্য করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে এটি পুরুষের উপর নারীর অধিকার। কেউ যদি স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করবেনা বলে ভাবে। তবে সে যিনাকারী-ব্যভিচারী। মহানবী (স.) পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

"যে ব্যক্তি কোন নারীকে মোহর দানের শর্তে বিয়ে করেছে, অথচ নিয়্যত করেছে মোহর পরিশোধ করবেনা তবে সে যিনাকারী-ব্যাভিচারী।"[২০১]

মহান আল্লাহর বানী;

"এবং তোমরা মোহরম মেয়েরা ছাড়া আর সব মহিলাকেই তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। এজন্য যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করবে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে'[২০২]। এই আয়াত প্রেক্ষিতে আল্লামা ইব্ন-আল আরাবী বলেন;

"আল্লাহ মহান হুকুম দাতা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহার হালাল করেছেন ধন-মালের বিনিময়ে ও বিয়ের মাধ্যমে পবিত্রতা রক্ষার্থে, যিনার জন্য নয়। আর এ কথা প্রমাণ করে যে, বিয়েতে মোহরানা দেয়া ওয়াজিব"[২০৩]।

কুরআন মজীদের অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

[২০০] বুখারী মুসলিম, দারেকুতনী, মুসনাদ আহমদ, তিবরানী, মাও. আ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩-১০৪, সহীহ আল বুখারী, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী,) পৃ.৬২ ,।

[২০১] হাদীছ শরীফ, মুসনাদ আহমদ ।

[২০২] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪:১৯ ।

[২০৩] আহকামুল কুরআন, খ.১, পৃ.৩৭।

"এবং মুসলমান ও আহলি কিতাব বংশের সতীত্ব পবিত্রতা সম্পন্ন মহিলারাও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে বিয়ে করবে"[২০৪] ।

অন্য আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে,

'তোমরা যদি সে মহিলাদের মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করো, তবে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না"[২০৫] । 'এবং স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারে (ফরজ মনে করে) আদায় কর" ।

"তোমরা যদি তাদের কাউকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ মোহরানা দিয়ে থাক, তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণও ফিরিয়ে নিওনা"[২০৬] । "অথবা তাদের মোহরানা নির্দিষ্ট করে দাও"[২০৭] ।

"হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) এক মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং তাকে খেজুরের আটির সম পরিমাণ স্বর্ন মোহরানা হিসাবে দিলেন। নবী (স.) (তার মুখ মন্ডলে) বিবাহের খুশির উজ্জল্য দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে খেজুরের আটির পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে বিবাহ করেছি। আনাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) খেজুরের আটির পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন'[২০৮] ।

"হযরত সহল ইব্ন সাদ (রা.) বলেন, আমি নবী করিম (স.) এর নিকটে লোকদের সাথে (বসা ছিলাম) এক মহিলা দাড়িয়ে বলল হে আল্লাহর রাসূল (স.) সে (আমি) নিজকে বিবাহের জন্য আপনার কাছে হেবা করেছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন এমনি ভাবে সে তিনবার নিজেকে হেবা করার কথা বলে রাসুলের কাছে উত্তর জানতে চায়, তখন এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল আমি! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী করীম (স.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, না। নবী (স.) বললেন যাও এবং খুজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কিনা? তা লোহার আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না, এমনকি একটি লোহার আংটি ও নয়। নবী করীম (স.) বললেন, তুমি কি কোরআন মজীদের কিছু অংশ

---

[২০৪] আল কুরআন, সুরা মায়েদা ৫:৫ ।

[২০৫] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ২৪ ।

[২০৬] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ২০ ।

[২০৭] আল কুরআন, সুরা বাকারা ২ : ২৩৫ ।

[২০৮] বুখারী শরীফ, হাদীছ নং-৪৭৬৮ ।

মুখস্থ জান? সে উত্তর দিল আমি অমুক অমুক সুরা মুখস্থ জানি, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম”[২০৯]।

“আমর ইব্‌ন রাবী'আতা হতে বর্ণিত, জারা বংশের একটি মেয়ে এক জোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ করলেন। তখন রাসূল করীম (স.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি তোমার মনেও তোমার ধন সম্পদের দিক দিয়ে দুই খানি জুতার বিনিময়ে বিবাহ করতে রাযী হতে পেরেছ? মেয়েটি বলল হ্যাঁ, তখন নবী করীম (স.) এই বিবাহ কে বৈধ ঘোষণা করলেন”[২১০]।

হযরত উমর (রা.) আবু হুরাইরা (রা.) সহল ইবনে সা'আদ, আবু সায়ীদ খুদরী (রা.), আনাস 'আ'ইশা (রা.) জাবির ও আবু হাদরাদ আল আসলামী সহ বহু সাহাবী থেকে এ ধরণের বহু হাদীছ পাওয়া যায় যা মোহরানার পক্ষে একটি মজবুত দলীল। মোহরানা ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে, এমন নজীর কোথাও নেই।

নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন:

“বিয়ের সময় অবশ্যই পূরণীয় শর্ত হচ্ছে তা, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীর যৌন অঙ্গ নিজের জন্য হালাল করে নাও। আর তা হচ্ছে- 'মোহরানা' বা দেন মোহর”[২১১]।

বিয়ের পর স্ত্রীকে কিছু না দিয়ে তার কাছে যেতেও করীম (স.) নিষেধ করেছেন। “হযরত আলী (রা.) ফাতিমা (রা.) কে বিয়ে করার পর তাঁর নিকটে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন নবী করীম (স.) তাকে কোন জিনিষ না দিয়ে তাঁর নিকট যেতে নিষেধ করলেন'[২১২]।

আল্লামা শাওকানী বলেন:

“নবী করীম (স.) স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মনকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য স্ত্রীকে কিছু না কিছু আগে-ভাগে দেবার জন্য স্বামীকে আদেশ করেছেন”[২১৩]।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যেহেতু যৌন সুখ উপভোগ করে থাকে। “মোহরানা এরই বিনিময়ে হয়, তাহলে তা কেবল স্বামীই কোন স্ত্রীকে দেবে? স্বামীর উপরা স্ত্রীর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বাড়া বাড়ি নয় কি?”

---

[২০৯] বুখারী শরীফ, হাদীছ নং-৪৭৬৯।

[২১০] তিরমীজী, ইব্‌ন মাযা, মুসনাদ আহমদ।

[২১১] হাদীছ শরীফ, মুসনাদ আহমদ।

[২১২] আবু দাউদ শরীফ।

[২১৩] নাইলুল আওতার, খ.৬, পৃ.১৯।

বাস্তবিক পক্ষে এর জবাব হচ্ছে। স্বামী বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর এক অধিকার ও কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব লাভ করে থাকে। স্বামী স্ত্রীর যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, আর স্ত্রী নিজেকে নিজের দেহমন প্রেম-ভালবাসা যাবতীয় সম্পদ ঐশর্য- একান্ত ভাবে স্বামীর হাতে তুলে দেয়া এই কতৃত্বের বিনিময় স্বরূপই স্বামীর উপর মোহরানা অপরিহার্য্য করা হয়েছে। হাদীছ শরীফে স্ত্রীকে স্বামীর মতের বাহিরে এমনকি নফল রোযা, হজ্বেও ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

শাফি'ঈ মাজহাবের আলেমদের মতে মোহরানা অর্থ:

"বিয়ে হবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিনিময় মূলক একটি বন্ধন। বিয়ের পর একজন অপরজনকে নিজের বিনিময় লাভ করে থাকে। প্রত্যেক অপরজনের থেকে যেটুকু ফায়দা লাভ করে, তাই হচ্ছে অপর জনের ফায়দার বিনিময় বদল। আর মোহরানা হচ্ছে এক অতিরিক্তি ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা তা স্বামীর উপর অবশ্য দেয়া-ফরয করে দিয়েছেন এজন্য যে, বিয়ের সাহায্যে সে স্ত্রীর উপর খানিকটা অধিকার সম্পন্ন মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে"[২১৪]। বস্তুত মোহরানা স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন প্রকার দান নয়। বরং এটা স্ত্রীর আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। স্বামী তার এ অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারেনা। এমনকি মোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত নিজেকে স্বামী থেকে দূরে রাখার অধিকার ইসলামী শরী'আত নারীকে প্রদান করেছে। আল্লামা সইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র.) মোহর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন:

"কুরআন হাদীছের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের যে অধিকার লাভ করে মোহর হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে তার বিনিময়"[২১৫]।

অতএব উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছের মহান বানী সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের পূর্ব শর্ত হচ্ছে মোহরানা, মোহরানা নির্ধারণ না করে বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারেনা। মোহরানা ছাড়া যেমন বিয়ে শুদ্ধ নয় তেমনি মোহরানা পরিশোধ করা ছাড়া স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহার এমনকি তার গায়ে স্পর্শ ও করতে পারবেনা। জেনেশুনে মোহরানার বিধানের বাহিরে থেকে যতদিন দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করবে ততদিন যিনা-ব্যভিচার ছাড়া কিছুই হবেনা। মোহরানা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি কোন দান বা অনুগ্রহ নয়। বরং তা খোদা প্রদত্ত এক মহন কল্যানময় বিধান। যা স্বামী-স্ত্রী

---

[২১৪] ইব্ন আল-আরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৭ ।

উভয়কে পবিত্র রাখবে। অবির্ভাব হবে পুত-পবিত্র একটি বংশধারার বা জাতির। মোহর বস্তুত পক্ষে স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব লাভের একমাত্র উপায়।

উপরোক্ত বর্ণনায় মোহরের প্রকৃত মর্যাদা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে যে, মোহর কোন সামাজিক ও প্রদর্শনীমূলক বিষয় নয়। বরং মোহর হচ্ছে যে জিনিস যার বিনিময়ে একজন নারী একজন পুরুষের জন্য হালাল হয়ে যায়। "কুরআন হাদীছের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিয়ের পর স্ত্রীর গুপ্তাংগ হালাল করার সময়ই তার প্রাপ্য মোহর পরিশোধ করতে না পারলে ও বাসর রাত্রে মোহরের একটা অংশ অন্তত পরিশোধ করা উচিত। যার বাকীটার ব্যাপারে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী-স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে"[২১৬]। এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রা.) বলেন: মোহরের দাবী হচ্ছে, তা গুপ্তাঙ্গ হালাল করার ক্ষনেই বাসর রাতের প্রথম সাক্ষাত্যে পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধের ব্যাপারে স্বামীকে কিছুটা অবকাশ দেয়াটা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একটা মেহেরবানী মাত্র। আর অবকাশের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার চুক্তি বা না হয়ে থাকলে স্ত্রী যখন ইচ্ছা আংশিক বা পূর্ণ মোহর দাবী করতে পারবে"[২১৭]। তবে স্ত্রী ইচ্ছা করলে মোহরের অংশ বিশেষ বা পূর্ণ্ মোহর মাফ করে দিতে পারে এবং স্বামীর ও তা গ্রহণ করতে পারে। যেমন আল্লাহর বাণী:

"স্ত্রীরা যদি সানন্দে মোহরানার কিছু অংশ তোমাদের মাফ করে দেয়, তবে তোমরাও তা সানন্দে গ্রহণ করতে পার"[২১৮]। তবে এ আয়াত দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, স্বামী স্ত্রীর কাছে মোহরানা পেশ করতে হবে। অতপর; স্ত্রী স্বামীর অবস্থার আলোকে ইচ্ছা করলে কিছু বা পূর্নাংঙ্গ ফেরত দিতে পারে আবার নাও দিতে পারে। এই ব্যাপারে স্ত্রীর উপর বল প্রয়োগ বা কৌশল খাটানো মোটেই উচিত হবে না। বিষয়টি স্ত্রীর সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বাধীন ব্যাপার। এমনকি এটি মহানবী (স:) কর্তৃক সমগ্র নারী জাতির জন্য একটি মহান মর্যাদা ও অধিকার।

মোহরের পরিমাণ, আদায়ের নিয়ম :

400620

ইসলাম মানবতার জন্য একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এমন কোন বিধান ইসলামে নেই যা কোন যুগের মানুষের জন্যে সহজ আর কোন যুগের মানুষের জন্যে কঠিন। এটি

---

[২১৫] মাও: আব্দুসশহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫।

[২১৬] আব্দুসশহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭।

[২১৭] রাসায়েল ও মাসায়েল, খ.১, ফিকহী মাসায়েল অধ্যায় (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী)।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সর্বকালের সর্ব বর্ণ গোত্রের জাতির মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। ইসলামী শারী'আত মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি। কারণ মোহর হল স্বামীর আর্থিক অবস্থা আর স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার উপর নির্ভরশীল। তবে স্বামীর প্রতি ঐ পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করতে হবে যা সে আদায় করতে পারে, নগদে অথবা কিছু অংশ পরিশোধের সময় নেয়ার শর্তে। রাসূল (স.) মদীনা শরীফে যখন হিযরত করেন তখন সাহাবায়ে কেরাম খুব কঠিন পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক জীবন যাপন করতে লাগলেন। তখন এক সাহাবীর বিয়ের মোহর তিনি "কুরআন মাজীদ শিক্ষাদানের" মাধ্যমে নির্ধারণ করেন।

"কুরআনের যা কিছু তোমার জানা আছে, তা স্ত্রীকে শিক্ষা দেবে এরই বিনিময়ে আমি মেয়েটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম"[২১৯]।

ফিক্‌হবিদ মকহুল বলেন:

"এ ধরনের মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে সম্পন্ন করার ইখতিয়ার রাসূল (স.) এর পরে আর কারো নেই।"

লায়স বলেন:

"রাসুলের তিরোধানের পর এই ধরনের মোহরানা নির্দিষ্ট করার অধিকার আর কারো নেই"[২২০]।

ইব্‌ন জাওজী বলেন; "ইসলামের প্রথম যুগে দারিদ্রতার কারণে প্রয়োজন বশতই এধরণের মোহরানা নির্দিষ্ট করা জায়েয ছিল। কিন্তু এখন তা জায়েয নয়।"

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

"তোমরা যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক, তবে তাকে রাশি রাশি সম্পদ দিয়ে থাকলেও তার থেকে কোন কিছুই ফিরিয়ে নেবেনা"[২২১]।.

---

[২১৮] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ৪।

[২১৯] হাদীছ শরীফ মুসনাদ আহমদ শরীফ, খ.১৬, পৃ. ১২১।

[২২০] জাসাস, আহকামুল কুরআন, খ.২, পৃ. ১৮১।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিশোধ করা মোহর ফেরত লওয়া জায়েয নয়এবং রাশি রাশি সম্পদ দ্বারা সামর্থানুযায়ী মোহরের কথা বলা হয়েছে।

পরবর্তী হযরত উমরের (রা.) হাদীছ দ্বারা সর্বোচ্চ মোহরানার কথাটা বাতিল হয়ে সামর্থানুযায়ী মোহরানার কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ রাসূল (স.) এর মোহরানা সর্বোচ্চ যা ছিল সেটা সামর্থ ও মর্যাদা অনুযায়ী হয়েছে।

মালিক ইব্‌ন আনাস বলেন:

"স্ত্রীকে তার মোহরানার কিছু না কিছু না দিয়ে যেন তার নিকট গমন না করে। মোহরানার কম সে কম পরিমাণ হল একটি দীনারের এক চতুর্থাংশ কিংবা তিন দিরহাম। বিয়ের সময় এ পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক আর নাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না"[২২২]।

মহানবী (স.) একদা মিম্বারে উঠে দাঁড়িয়ে লোকদের নসীহত করেছিলেন এবং মোহরানা সম্পর্কেও বললেন, হযরত আবু আজফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত উমর থেকে শুনেছেন।"

"সাবধান হে লোকেরা, স্ত্রীদের মোহরানা বাঁধতে গিয়ে কিছুমাত্র বাড়া বাড়ি করোনা, মনে রেখো মোহরানা যদি দুনিয়ার মান-সন্মান বাড়াতো কিংবা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাকওয়া প্রমাণ হত, তাহলে অতিরিক্ত মোহরানা বাধার কাজ করার জন্য রাসুলে করীমই ছিলেন তোমাদের অপেক্ষা বেশী অধিকারী ও যোগ্য। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের মধ্যে কারো মোহরানাই বার "আউকিয়া" (চারশ আশি দিরহাম কিংবা বড় জোর একশ কুড়ি টাকার বেশী ধার্য করেননি। মনে রাখা আবশ্যক যে, এক-একজন লোক তার স্ত্রীকে দেয় মোহরানার দরুন বড় বিপদে পড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজের স্ত্রীকে শত্রু বলে মনে করতে শুরু করে।"

হযরত সুহাইব ইব্‌ন সালাম (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম (স.) ইরশাদ করেন :

---

[২২১] আল কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ২০।

[২২২] মুয়ালিমুস সুনান, খ.৩, পৃ. ২১৫।

"যে লোক তার স্ত্রীর জন্যে কোন মোহরানা ধার্য করবে অথচ আল্লাহ জানেন যে, তা আদায় করার কোন ইচ্ছাই তার নেই, ফলে আল্লাহর নামে স্ত্রীকেই প্রতারিত করল এবং অন্যায়ভাবে ও বাতিল পন্থায় নিজ স্ত্রীর যৌন অঙ্গ নিজের জন্য হালাল মনে করে ভোগ করবেন, সে লোক আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করতে বাধ্য হবে একজন ব্যভিচারী হিসাবে"[২২৩]।

পরবর্তী হাদীসে হযরত উমরের হাদীছ দ্বারা সর্বোচ্চ মোহরানার কথাটা বাতিল হয়ে সামর্থনুযায়ী মোহরানার কথা পরিস্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ- রাসূল (স.) এর মোহরানার সর্বোচ্চ যা ছিল, সেটা তার সামর্থ ও মর্যাদা অনুযায়ী হয়েছে।

অতএব মোহর নিয়ে বাড়া বাড়ি করা কারো পক্ষেই উচিত নয়, বর্তমান সময়ে মেয়েদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নামে ছেলের উপর বিরাট মোহরের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। সামর্থের বাইরে হওয়ার কারণে স্বামী হয়ত মনে মনে পরিশোধ না করার নিয়ত স্বাভাবিক ভাবেই করতে থাকে। বস্তুত বর্তমান প্রেক্ষাপটে মোহরের পরিমাণ নিয়ে অত্যন্ত বাড়া বাড়ি হয়ে থাকে। উভয় পক্ষই এর সাথে জড়িত। অনেকে মোহরানা বিয়ের পূর্বে ধার্য করা, স্ত্রী স্পর্শ করার পূর্বে পরিশোধ করতে হয় যে, এব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত থাকে। আর কনে পক্ষ মেয়ের নিরাপত্তার নামে যত বেশী পরিমাণ মোহর ধার্য করা সম্ভব এনিয়ে পশু ক্রয়ের হাটের মতই ধর কষা কষি করে। যে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে তা কখনই মোহরের মাধ্যমে রোধ করা আদৌ সম্ভব নয়। আসলে বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনের সুখ একটি বাস্তব ও মানষিক ব্যাপার। আর বিয়েকে রক্ষণ করা ও নারীর নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইসলামী আদর্শকে অনুসরণ করে পাত্র / পাত্রী নির্বাচনের দ্বারাই।

নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন :

"সর্বোত্তম পরিমাণের মোহর হচ্ছে তা, যা পরিশোধ করা খুবই সহজ সাধ্য"[২২৪]।.

---

[২২৩] হাদীছ শরীফ মুসনাদ আহমদ শরীফ, বুলুগুল মায়ানী খ.১৬, পৃ.১২৫।

[২২৪] হাদীছ শরীফ, আবু দাউদ, হাকেম শরীফ।

নবী করীম (স.) স্বয়ং উম্মে হাবীবাকে মোহরানা দিয়েছেন ৪০০ দিনার চারশত স্বর্নমুদ্রা। অপর বর্ননায় মোহরানার পরিমাণ ৮০০ দিনার পাওয়া যায়"[২২৫]।

হযরত 'আ'ইশা (রা.) হতে বর্ণিত :

"রাসূল (স.) তাঁর বেগমদের জন্য দেয়া মোহরানা ছিল বারো আউকিয়া ও অর্ধ আউকিয়া। আর এতে মোট পাঁচশত দীরহাম হয়। রাসূলে করীম (স.) এর দেওয়া মোহরানা গড়ে ইহাই ছিল"[২২৬]।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.), হাসান, সাঈদ, ইব্ন-আল মুসায়্যিব ও আতা প্রমুখ বলেছেন:

"বিয়েতে কম পরিমাণ মোহরানা ও শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ হয় বেশী পরিমাণ মোহরানাও।"

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) তার বিয়েতে নাওয়াত পরিমাণ মোহরানা বাবদ দিয়েছেন। তার পরিমাণ বড়জোর তিন দীরহাম মাত্র। আর কেউ বলেছেন পাঁচ, কেউ বলেছেন দশ দীরহাম।

ইমাম মালিক বলেছেন :

"নিন্মতম মোহরানার পরিমাণ হচ্ছে দীনারের এক চতুর্থাংশ[২২৭]।

"হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন: দশ দীরহামের কমে কোন মোহরানা নেই।" "আল্লামা আবু বকর আল জাস্সাস, হানাফী এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেছেন, মোহরানার নূন্যতম পরিমাণ দশ দীরহাম। দশ দীরহামের কম পরিমাণ মোহরানা ধার্য হলে বিবাহ সহীহ হবেনা।

তিনি এর সমর্থনে উল্লেখ করেন যে,

"হযরত আলী (রা.) বলেছেন, দশ দীরহামের কমে কোন মোহরানা নেই[২২৮]।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা দলিলের প্রমানদারী মাধ্যমে একথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, মোহরের সর্বনিন্ম কোন সংজ্ঞা নেই। কোন কোন হাদীসে ১০ দীরহাম পাওয়া যায়। বস্তুত স্বামীর সামর্থ ও স্ত্রীর মর্যাদার উপর ব্যপারটি সম্পূর্ন রুপে নির্ভরশীল। তবে এত কম ধার্য যাবেনা যা স্বামীর জন্যে সামান্য ব্যাপার হয়। পরিমাণটা এমন হওয়া উচিত নয় যা আবার তার জন্য আদায় করা খুব

---

[২২৫] আহকামুল কুরআন, খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪।

[২২৬] মুসলিম শরীফ ও মুসনাদ আহমদ।

[২২৭] জাসাস, আহকামুল কুরআন, খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

[২২৮] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

কঠিন হয়ে পড়ে। এমন বেশী ধার্য করা ঠিক নয় যে, যা সে উপস্থিত দর্শক বা চক্ষু লজ্জায় উপস্থিত মেনে নেবে। কিন্তু মনে মনে পরিশোধের বাসনা থাকবেনা। যেমন মহানবীর বাণী:

"যে ব্যক্তি কোন নারীকে মোহর দানের শর্তে বিয়ে করেছে অথচ নিয়ত করেছে মোহর পরিশোধ না করার তবে সে ব্যভিচারী"[২২৯]।

বস্তুত ইসলামী শরী'আতে দেন মোহরের কোন পরিমাণ কম বেশী করে দেননি। কারণ যুগের প্রেক্ষাপটে মানুষের রুচি, সামর্থ পরিবর্তন হতে পারে। "তবে একথা সুষ্ঠ যে, প্রত্যেক স্বামীরই কর্তব্য হচ্ছে তার আর্থিক সামর্থ ও স্ত্রীর মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে উভয় পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন পরিমাণ বেঁধে দেয়া। আর মেয়ে পক্ষের ও তাতে সহযে রাজি হয়ে যাওয়া উচিত। ইসলাম এব্যপারে উভয় পক্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে"[২৩০]।

তবে নারীদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বাড়া বাড়ির অন্যতম কারণ আমি মনে করি যে, সামাজিক অবক্ষায় জাতির উপর এক অমানিষা নেমে এসেছে। এ কারণে অনেকে অতিরিক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে অতিরিক্ত মোহরানার দাবী করে। বস্তুত ইসলামী আদর্শ উভয় পক্ষের জন্য একটি ভারসাম্য পূর্ণ মডেল। জীবনের শুরু থেকে যদি মহানবী (স.) এর আদর্শকে পরিপুর্ণরুপে গ্রহণ করা যায়, তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবেনা বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

"হাদীছ থেকে জানা যায়, কিছু মোহর স্ত্রীর হাতে না দিয়ে তার সঙ্গে সহবাস করা অবাঞ্চনীয়। মোহর সম্পর্কে ইসলামের বিধান হচ্ছে:

১. মোহরকে ফরয মনে করে পরিশোধ করতে হবে।
২. মোহর পরিশোধ করতে হবে সানন্দে সন্তোষ সহকারে।
৩. বাসর রাত্রেই মোহর পরিশোধ করা উচিত।
৪. স্ত্রী ইচ্ছে করলে মোহর পরিশোধের জন্য স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে।
৫. স্ত্রী ইচ্ছে করলে স্বামীকে পূর্ণ বা আংশিক মোহর মাফ করে দিতে পারে।
৬. বাসর রাত্রে কিছু না কিছু মোহর স্ত্রীকে প্রদান করা বাঞ্চনীয়।

---

[২২৯] হাদীছ শরীফ, মুসনাদ আহমদ।

[২৩০] মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

৭. ইসলামী আইনবীদগণ এ ব্যাপারে ও একমত যে, মোহরের দাবী প্রত্যাহার করে নেয়ার পর স্ত্রী যদি পুনরায় তা দাবী করে তবে স্বামী তা পরিশোধে বাধ্য হবে।

৮. মোহর নগদ অর্থ এবং দ্রব্য সামগ্রীর মাধ্যমেও দেয়া যায়।

স্ত্রীর খোরপোষ প্রদান :

ইসলামী দাম্পত্য আইনে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের মধ্যে দ্বিতীয় অন্যতম পর্যায় হল স্ত্রীর যাবতীয় ব্যায়ভারের দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হবে। মহান আল্লাহর বাণী :

"যে লোক কে অর্থ সম্পদে সাচ্ছন্দ্য দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সেই হিসাবেই তার স্ত্রী- পরিজনের জন্য ব্যয় করা। আর যার আয় উৎপাদন স্বল্প পুরিসর ও পরিমিত তার সেভাবেই আল্লাহর দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের উপর সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন"[২৩১]।

এই আয়াতের ব্যখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেন :

"এই আয়াতে আদেশ করা হচ্ছে- সচ্ছল অবস্থার লোকদের যে, তারা দুগ্ধ দায়িনী স্ত্রীদের জন্যে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য অনুপাতে বহন করবে। আর যাদের রিযিক নিন্মতম প্রয়োজন মত কিংবা সংকীর্ণ, সচ্ছল নয়, তারা আল্লাহর দেয়া রিযিক অনুযায়ীই খরচ করবে। তার বেশী করার কোন দায়িত্ব তাদের নেই"[২৩২]।

স্ত্রীদের খরচের পরিমাণ আদৌ নির্দিষ্ট কিনা এব্যাপারে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ বর্ননা করেন :

"স্ত্রীর ব্যয়ভারের কোন পরিমাণ শরী'আতে নির্দিষ্ট নয়, বরং তা বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করা হয়েছে। এব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অবস্থা বিবেচনাধীন। সচ্ছল অবস্থার স্বামী

---

[২৩১] আল কুরআন, সুরা তালাক, ৬৫ : ৭।

[২৩২] ফতহুল কাদির, খ.৫, পৃ. ২৩৯।

স্বচ্ছল লোকদের উপযোগী ব্যয় বহন করবে। অনুরুপ ভাবে অভাবগ্রস্থ স্ত্রীর জন্য অভাবগ্রস্ত স্বামী ভরন-পোষণের নিন্মতম দায়িত্ব পালন করবে"[২৩৩]।

ইমাম আযম আবু হানিফার (র.) মতও তাই। বস্তুত তাদের সামর্থ ও অবস্থার আলোকেই ব্যায়ভারের কথা চিন্তা করতে হবে। অবশ্যই স্বামী যদি কৃপণ হয় ভিন্ন কথা।হযরত 'আ'ইশা (রা.) বর্ণনা করেন: আবু সুফিয়ানের স্ত্রী উৎসা কন্যা- রাসূল (স.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেন:

"হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরন-পোষণ দেয়না, তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজনমত গ্রহণ করে থাকি। এ কাজ জায়েয কি? তখন রাসূল (স.) ইরশাদ করেন-

"সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পার"[২৩৪]।

অবশ্য ইমাম শাফেরীর (র.) মত হল, সকল ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী ভরণ-পোষণ করতে হবে। তার মতে শরী'আত যেহেতু স্বামীকে অধিকার দিয়েছে, সেহেতু এখানে স্ত্রীর মতামত পরিতাজ্য।"

ইমাম মুহাম্মাদের মতে স্বামীর সামর্থানুযায়ী স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় চাকর বাকর যোগাড় করে দিতে হবে। ইমাম মালেকের মতে দুই তিনজন খাদেম রাখা প্রয়োজন হলে স্বামীর উপর কর্তব্য।

ইমাম আবু ইউসুফের (র.) মতে, "এমোতাবস্তায় স্বামীর কর্তব্য হবে শুধু খাদেমের ব্যবস্থা করা ও খরচ বহন করা। তাদের একজন হবে ঘরের ভিতরকার জরুরী কাজ কর্ম করার জন্য। অপরজন হবে ঘরের বাহিরের জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্য"[২৩৫]।

---

[২৩৩] তাফসীরুল মাজহারী, খ.৯, পৃ. ৩৩১।
[২৩৪] বুখারী, মুসলিম, পরিবারে ভরণ-পোষণ অধ্যায়।
[২৩৫] তাফসীরুল মাজহারী, খ.৯, পৃ. ৩৩২।

"আল্লাহ অসচ্ছলতা ও দারিদ্রের পক্ষে অবশ্যই সচ্ছলতা প্রাচুর্য করে দিবেন"[২৩৬]।

গরীব ও অসচ্ছল স্বামীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার নিন্মলিখিত বানী প্রনিধান যোগ্য :

আল্লাহ তা'আলা এসম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন :

"সন্তানের পিতার কর্তব্য হচ্ছে প্রসূতির খাবার ও পরার প্রচলিত মানে ব্যবস্থা করা। কোন ব্যক্তির উপরই তার সামর্থের অধিক বোঝা চাপানো যায়না"[২৩৭]।

উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে আল্লামা শাওকানী লিখেন:

"সন্তান, স্ত্রীর ব্যয়ভার , খোরাক ও পোষাক সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা করতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী, যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এ ব্যাপারে কোন পিতাকেই তার শক্তি- সামর্থের বাহিরে তার পক্ষে কঠিন ও দু:সাধ্য হয়ে পড়ে, এমন মান বা পরিমাণ তার উপর চাপানো যাবেনা"[২৩৮]।

রাসূল করীম (স.) স্বামীদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন যে,

"স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে"[২৩৯]।

আল্লাহ তা'আলার বানী:

"হয় যথাযথ নিয়মে ও ভালভাবে স্ত্রীকে রাখবে, নয় ভালভাবে ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাকে ছেড়ে দেবে"[২৪০]।

---

[২৩৬] আল কুরআন, সূরা আত্ তালাক, ৬৫ : ১৭।

[২৩৭] আল কুরআন, সূরা বাকারা, ২ : ২৩৩।

[২৩৮] ফতহুল কাদীর, খ.১, পৃ. ২১৮।

[২৩৯] তিরমীযী শরীফ।

[২৪০] আল কুরআন, সুরা আত্তালাক ৬৫ : ০২।

"যার রিযিক পরিমিত হয়ে পড়েছে সে যেন আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ একজনকে ততটাই দায়িত্ব দেন, যতটার সম্পদ তিনি তাকে দিয়েছেন"[২৪১]।

আল্লার বাণী :

পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে আয় উপার্যন করা এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা"[২৪২]।

কুরআন মাজীদের অপর ঘোষণা :

"পুরুষ নারীদের শাসন কর্তা, আল্লাহ তা'আলা তাদের এক্‌কে অপরের উপর ক্ষমতা দিয়েছেন, কারণ পুরুষ তার জন্য অর্থ ব্যয় করেন"[২৪৩]।

এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মোহর যেমন ওয়াজিব খোর পোষও ওয়াজিব। স্বামী যদি এতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তাহলে আইন তাকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। সে যদি অসমর্থ হয় বা অস্বীকার করে তাহলে ইসলামী শরী'আত তার বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে। এটি এক প্রকারের নপুংশতা। তাই বলে খোরাকীর পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর নয়। এক্ষেত্রে স্বামীর সামর্থই পরিমাণ নির্ণয়ক। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে মূলনীতি বলে দিয়েছেন।

"ধনী ব্যক্তির উপর তার সামর্থ অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির উপর তার সামর্থ অনুযায়ী ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।"

এক ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম (স.) এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সে তার স্ত্রীর ভরন পোষণের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। এমোতাবস্তায় কি করা উচিত? নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন:

"এ দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে।"

---

[২৪১] আল কুরআন,সূরা আত্‌তালাক, ৬৫ : ৭।
[২৪২] আল কুরআন, সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৩।
[২৪৩] আল কুরআন, সূরা নিসা, ৪ : ৩৪।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) তার খিলাফত কালে সৈন্য বাহিনীর উদ্দেশ্যে এক ফরমান পাঠান:

“হয় তারা তাদের স্ত্রীদের ভরণ- পোষণের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবে না হয় তাদের তালাক দিয়ে দিবে”[২৪৪] ।

স্বামীর দৈন্য ও আর্থিক অনটনের সময় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা কতটুকু সমীচিন?

এ ব্যাপারে হযরত আলী, হযরত ওমর ফারুক, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবী, বহু সংখ্যক তাবেয়ী ফিক্‌হবিদ এবং ইমাম মালিক শাফি'ঈ ও ইমাম আহমদ এক মত যে, স্বামী যখন স্ত্রীর ভরণ-পোষণে ব্যর্থ হবে, তখন বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে উভয়কে মুক্ত করে দেয়া সমীচিন। তারা নবী করীম (স.) এর পূর্বোক্ত বাণী, হযরত উমর (রা.) এর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে লিখিত ফরমান এবং ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত দলীল :

“না, কারো ক্ষতি করা হবে, না কাউকে অপর কারো ক্ষতি করতে দেয়া হবে।” তাছাড়া স্ত্রীর সাথে সহবাস ও যৌনসঙ্গম হচ্ছে স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহনের বিনিময়। তবে এতটুকু করা যায় যে, এক্ষেত্রে স্ত্রীর স্বাধীনতা রয়েছে সে ধৈর্য্য ধরে অভাবগ্রস্থ স্বামীর সাথে থাকবে, অন্যথায় বিবাহ বিচ্ছেদ করে শরী'আত তার মুক্তির পথ উম্মুখ করে দেবে।”

আর এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দলিল হল : আল্লাহর বাণী-

“হয় যথাযথ নিয়মে ও ভালভাবে স্ত্রীকে রাখবে নয় ভালভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শণ করে তাকে ছেড়ে দেবে”[২৪৫] ।

উপরোক্ত আলোচনা, ইসলামী আইনের প্রধান উৎস মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীছ শরীফ, বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য, বিভিন্ন ফিক্‌হবিদের মতামত থেকে একথা পরিস্কার যে, স্বামীরা থাকবে কর্তার আসনে, স্বামী যেহেতু স্ত্রীকে অর্থের বিনিময়ে আল্লাহর নামে গ্রহণ

---

[২৪৪] আল কুরআন, সুরা বাকারা, ২ : ২৩৬।

[২৪৫] আল কুরআন , সুরা আত্ তালাক ৬৫ : ০২।

করেছে। সেহেতু তাদের জন্যে এটি একটি মর্যাদার ব্যাপারও বটে। নারী সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবে। আর স্বামী আয় উপার্যন সহ বাইরের জগতের সকল কাজ কর্মের দায়-দায়িত্ব পালন করবে। স্বামী যদি সঙ্গত কারণে স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয় ভার বহনে অক্ষম হয় তাহলে তাকে স্ত্রী পোষণে অক্ষম ধরে নিতে হবে। সুতরাং তাকে দেয়া ক্ষমতা ও মর্যাদা থেকে সে অব্যহতি লাভে বাধ্য। ইসলামী দাম্পত্য আইনে ভাষ্য হল, তার কাছ থেকে স্ত্রীকে মুক্ত করে দিয়ে উভয়ের জন্য বিকল্প চিন্তার সুযোগ করে দিতে হবে। তবে যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় অসচ্ছল স্বামীর সাথে বসবাস করতে ইচ্ছুক হয় সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার, ধৈয্য ও সহনশীলতার পরিচয়ও বটে। বস্তুত ইসলামী দাম্পত্য আইন কোন এক নায়ক বা এক কেন্দ্রিক বিষয় নয় বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমঝোতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং অযোগ্যতার ভিত্তিতে গঠিত হয় এর ভবিষ্যত স্থায়িত্ব। ইসলাম স্বামীর উপর অনেক কর্তব্য দিয়েছে যদি সে তা সম্পূর্ণরূপে পালনে সক্ষম হয় তাহলে তাকে শাসন ও কতৃত্বের ক্ষমতা এবং যৌনাঙ্গ ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়। অন্যথায় সে পরিতায্য।

স্ত্রীদের প্রতি জুলুম ও নির্যাতন না করাঃ

স্ত্রীদের প্রতি জুলুম করা যাবেনা। অপছন্দনীয় স্ত্রীকে আটকে রেখে বিভিন্ন কৌশলে তাকে শারীরিক ও মানুষিক ভাবে কষ্ট দেয়া জগন্য অপরাধ। বার বার তালাক দেয়া আবার ফেরত নেয়া যাবেনা, এটি একটি চাটুকারিতা। দাম্পত্য জীবন তথা স্ত্রীর জীবনকে নিজের অপছন্দ হওয়ার কারণে স্ব-ইচ্ছায় চলে যাবে এ আশায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ফেলে দেয়া যাবেনা। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ-

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নানা ভাবে কষ্ট দান ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখোনা। যে লোক এরূপ করবে, সে নিজের উপর জুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করোনা"[২৪৬]।

তৎকালীন আরবের প্রচলিত কুসংস্কার ছিল, স্ত্রীকে বার বার তালাক দেয়া আবার ফেরত নেয়া, তাকে কঠিন অনুশাসনে রাখা। বস্তুত তাদের মধ্যে বিয়ের নীতিও ছিল অমানুবিক পর্যায়ে।

---

[২৪৬] আল কুরআন, সুরা বাক্বারা, ২ : ৩৩।

নারী, মদ ছিল তাদের কাছে ভোগের সামগ্রী। নারী জাতির পৃষ্ঠপোষক মহানবী (স.) সকল কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে নারীকে মা ও রাণীর মর্যাদায় আসীন করেন। তিনি ঘোষণা করলেন, স্ত্রী হলেন তোমাদের সহধর্মীনি, তাকে কারণে অকারণে জুলুম, নির্যাতন ও মানুষিক ভাবে কষ্ট দেয়া যাবেনা। উপরোক্ত আয়াত থেকে এও পরিষ্কার হয় যে, যিনি নিজের স্ত্রীকে কষ্ট, জুলুম, উৎপীড়ন করবে পরিণামে তার জীবনে অশান্তির কালমেঘে ঢেকে আসবে। নিজে কষ্ট পাবে, মধুময় দাম্পত্য জীবন থেকে বঞ্চিত হবে। নারী জাতির কাছেও সে ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবে।

অতএব স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি মধুর আচরণ করতে হবে, শারীরিক ও মানুষিক ভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতে হবে। এটি আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। আল্লামা আলুসীর মতে:

"এভাবে যে, সে মধুর পারিবারিক জীবন যাপনের ফলে লভ্য সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে বলে সে দ্বীনের ফায়দা হারাবে আর দুনিয়ার ফায়দা হারাবে এভাবে যে, তার এই ভীবৎস কাজের প্রচার হয়ে যাওয়ার কারণে নারী সমাজ তার প্রতি বিরূপ ও বিরাগভাজন হয়ে পড়বে"[২৪৭]।

মহানবী (স:) নিজের জীবন সঙ্গিনী স্ত্রীকে মারপিট করতে নিষেধ করেছেন।

"তোমরা স্ত্রী-অর্ধাঙ্গিনীকে এমন নির্মম ভাবে মারধর করোনা, যেমন করে তোমরা মেরে থাকো তোমাদের ক্রীতদাসীদের"[২৪৮]।

নবী করিম (স.) আরো নিষেধ করেন যে,

"তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসীদের মারার মতো না মারে, আর মারধোর করার পর দিনের শেষে তার সাথে যেন যৌন সঙ্গম না করে"[২৪৯]।

অর্থাৎ দিনে স্ত্রীকে দাসীর মত নির্যাতনে জর্জরিত করবে, মানুষিক ভাবে কষ্ট দেবে। রাতে আবার নিজের প্রশান্তির জন্য শর্যাশায়ী হবে, এধরণের দু-মুখী নীতি ইসলাম পছন্দ করেনা, এব্যাপারে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন:

---

[২৪৭] তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খ.১, পৃ. ১৪২।

[২৪৮] বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ আল মাদারাতু মাও. আন নিসা, মুসলিম, কিতাবুর রাদা, বাবুল ওসিয়াতুবিন নিসা, তিরমিযী।

[২৪৯] বুখারী মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ মা ইয়াকরিহু দরবিন নিসা।

"স্ত্রীকে প্রচন্ডভাবে মারধর করা এবং সে দিনের বা সে রাতেরই পরবর্তী সময়ে তারই সাথে যৌন সঙ্গম করা এদুটো কাজ এক সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব হতে পারেনা, হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, রাসূলে করীম (স.) এর উপরোক্ত বাণীতে সেই কথাই বুঝানো হয়েছে। আর তার কারণ এই যে, যৌন সঙ্গম সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ হতে পারে যদি তা মনের প্রবল ঝোঁক ও তীব্র অদম্য আকর্ষণের ফলে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রহৃতের মন প্রহারকারীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, তা সর্বজনবিদিত"[২৫০]।

হযরত 'আ'ইশা (রা.) হতে বর্ণিত-

"রাসূল করীম (স.) তাঁর কোন স্ত্রীকে কিংবা কোন চাকর খাদেমকে কখনো মারধোর করেননি, না নিজের হাত দিয়ে, না আল্লাহ তা'আলার পথে। তবে যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ পথে এরুপ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রতিরোধ গ্রহণ করতেন"[২৫১]।

মহানবী (স.) অপর হাদীসে ইরশাদ করেন :

"তোমরা স্ত্রীদের আদৌ মারধোর করবেনা এবং তাদের মুখমন্ডল কুশ্রী ও কদাকার করে দিওনা"[২৫২]।

"আল্লাহ তা'আলার দাসীদের তোমরা মারধোর করোনা"[২৫৩]।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে,

"তোমরা স্ত্রীদের মুখের উপর মারবেনা, মুখমন্ডলের উপর আঘাত দেবেনা, তাদের মুখের শ্রী নষ্ট করোনা। অকথ্য ভাষায় তাদের গালাগাল করবেনা এবং নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্নাবস্থায় ফেলবেনা"[২৫৪]।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা স্ত্রীদের গায়ে আঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। মানুষিক এমনকি তাদের মুখে এমন কোন আঘাত ও করা যাবেনা, যাতে মুখে কোনরুপ স্পট পড়তে পারে। কারণ চেহারা মুখমন্ডল হলো নারী সৌন্দর্যের মূল অলংকার। ইসলামী আদর্শ বহু বাস্তব ও যুগোপযুগী তা এখানেই প্রমাণিত। বর্তমান আধুনিক হতাশাগ্রস্থ সমাজে নারীদের মুখমন্ডলে এসিড নিক্ষেপ করে ঝলসে দিচ্ছে, তা আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে মানবতার নবী, নারী জাতির মর্যাদা রক্ষার

---

[২৫০] নাসায়ী শরীফ, উমদাতুল কারী, খ.২, পৃ. ১৯৩।

[২৫১] সুরুলুস সালাম, খ.৩, পৃ. ১৬৪।

[২৫২] আবু দাউদ শরীফ।

[২৫৩] আবু দাউদ শরীফ।

একমাত্র প্রবক্তা আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মোহাম্মাদ (স.) কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। এধরণের অপরাধীরা আখিরাতে লাঞ্চিত ও ঘৃণিত হবে পুরুষেরা যেহেতু নারীর শাসন কর্তা সেহেতু বিশেষ ক্ষেত্রে তাদেরকে মৃদু প্রহার করা যাবে। যাতে স্বামী থাকবে দরদ ভরা অন্তরে আর মুখে হয়তো কঠিন ভাষা উচ্চারিত হবে।

এই প্রসঙ্গে ইমাম খাত্তাবী লিখেছেন :

রাসূলের "মুখের উপর মারবেনা" উক্তি থেকে প্রমাণিত যে, মুখমন্ডল ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশের উপর স্ত্রীকে মারধোর করা সঙ্গত। তবে শর্ত এই যে, তা মাত্রায় বেশী, সীমালঙ্গনকারী ও অমানুষিক মার হতে পারবেনা"[২৫৫]।

বস্তুত বিষয়টির একমাত্র সংশোধনের মানুষিকতায় তাকে ভালবেসে তার কল্যাণ কামনায়।

উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে ইমাম মোহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল কাহলানী লিখেন যে,

"হাদীছটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীকে খুব হাল্কাভাবে মারা জায়েয[২৫৬]।

স্ত্রীকে কখন কি কারণে মৃদু প্রহার করা জায়েয মহাগ্রন্থ আল কুরআন এ ব্যাপারে সুষ্ঠ মতামত দিয়েছে :

"আর যে সব স্ত্রীলোকের আনুগত্য ও বিদ্রোহের ব্যাপারে তোমরা ভয় কর, তাদের ভালভাবে বুঝাও, নানা উপদেশ দিয়ে তাদের বিনয়ী বানাতে চেষ্টা কর। পরবর্তী পর্যায়ে মিলন-শয্যা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখ। এর পরেও যদি তারা তোমাদের অনুগত না হয় তবে তাদের মার (শেষ পর্যায়ে এসে)।

এর ফলে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের উপর অন্যায় ব্যবহারে নতুন কোন পথ খুঁজে বেড়াবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ"[২৫৭]।

এ আয়াতে **প্রথম পর্যায়ে** বলা হয়েছে যে, স্ত্রীর ব্যাপারে যদি আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল (স.)ও স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে ভয় হয়। তাহলে তাকে বিষয়টি বুঝাতে হবে। স্ত্রীকে একথা পরিষ্কার ভাবে বুঝাতে হবে যে, আল্লাহ এবং তার রাসূলের পরে ঈমানদার স্বামীর অবস্থান , যেহেতু সে তাকে মোহরানা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করে গ্রহণ করেছে।

---

[২৫৪] আবু দাউদ শরীফ।

[২৫৫] মু'য়ালিমুস্ সুনান, খ.৩, পৃ. ২২১।

[২৫৬] সুবুলুস্ সালাম, খ.৩, পৃ. ১৬৪, মাও. আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

মোহরানার বিনিময়ে কতৃত্ব লাভেরও অধিকার পেয়েছে। ব্যাপারগুলো সুন্দর ও মিষ্ঠ ভাষায় দরদী মন নিয়ে বিনয়ীভাবে বুঝাতে হবে। এ কথা বুঝাতে হবে যে, দুনিয়ার দাম্পত্ব্য জীবনের উপর নির্ভর করে স্ত্রীর পরকালীন জীবনের সফলতা। আখিরাতের শাস্তির কথাও বুঝাতে হবে। উপরোক্ত পর্যায়ে ব্যর্থ হলে প্রাথমিকভাবে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে। তার সাথে যৌন সম্পর্ক ও শয্যাগত সম্পর্ক উভয় প্রকার বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখবে। **তৃতীয় পর্যায়ে** বলা হয়েছে যে এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে তাকে মৃদু প্রহার করা যাবে। তবে তা হতে হবে শিক্ষামূলক, ক্রীতদাস বা জন্তু জানোয়ারের মত মারধোর করা যাবেনা।

ফতোয়ায় কাজী খানে বলা হয়েছে যে,"স্বামী স্ত্রীকে চারটি অবস্থায় চারটি কারণে মারতে পারবে :

(১) স্বামীর ইচ্ছা ও নির্দেশ শর্তেও স্ত্রী যদি সাজ সজ্জা পরিত্যাগ করে।

(২) পবিত্র ও সুস্থ অবস্থায় স্বামী যৌন সঙ্গমের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে জন্য প্রস্তুত না হওয়া।

(৩) স্ত্রী যদি নামায তরক করে।

(৪) স্ত্রী যদি স্বামীর বিনানুমতিতে ঘর থেকে বাইরে চলে যায়[২৫৮]।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে বলেন যে :

"প্রথমে তাকে মিলন শয্যা থেকে সরিয়ে দেবে। এতে যদি সে মেনে যায় ভাল, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন তাকে মারবার; কিন্তু সে মারাটা নির্দয়-অমানুষিক হবেনা। মারের চোটে তার হাড় ভেঙ্গে দিতে পারবেনা। এতে যদি সে ফিরে আসে ভাল কথা; অন্যথায় তুমি তার কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করে তাকে তালাক দিতে পার"[২৫৯]।

আল্লামা শাহকাণী আয়াতের শেষ অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

"আয়াতে স্বামীদের বলা হয়েছে স্ত্রীদের জন্যে ভালবাসার বাহু বিছিয়ে দিতে, পার্শ্ববিনম্র করতে অর্থাৎ তোমরা স্বামীরা যদি স্ত্রীদের যা ইচ্ছা তা ই করার ক্ষমতা রাখ, তাহলেও তোমাদের উচিত তোমাদের উপর স্থাপিত আল্লাহ তা'আলার অসীম ও অতুলনীয় ক্ষমতার স্মরণ করা। কেননা তা হচ্ছে সর্ব ক্ষমতার উর্ধ্বে-অধিক। মনে রেখো , আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি উম্মুখ তাকিয়ে রয়েছেন"[২৬০]।

---

[২৫৭] আল কুরআন,সুরা নিসা, ৪ : ৩৩।

[২৫৮] বজলুল মজহুদ, খ.৩, পৃ.৪৪, মাও. আবদুর রহীম প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

[২৫৯] মুহাসিনুত তাবিল, খ.৪, পৃ. ১২২২, মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

[২৬০] ফতহুল কাদির, খ.১, পৃ. ৪২৫।

আয়াতে এ কথাও বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, কোন কিছুতেই সীমা লংঘন করা যাবেনা। এ পর্যায়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে; উপদেশ দেয়া, মিলন শয্যা ত্যাগ, মৃদু প্রহার। যদি স্ত্রী শরী'আত নির্দেশিত সীমা আনুগত্য মেনে নেয় তবে তার সাথে কোনরুপ বাড়া বড়ি করা যাবেনা। কারণ আল্লাহ তা'আলা নারীদের সাথে সর্বোপরি ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। যদি স্বামীরা বাড়া বাড়ি করে আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্ট সীমা লঙ্গন করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ্ঠ। শাস্তি দাতা ও ভয় প্রদর্শনের মালিক শুধু আল্লাহ তা'আলা। স্বামী হওয়ার কারণেই প্রভূ বা মালিক হয়ে যাবে তা নয়, মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে অবশ্যই সকলকে উপস্থিত হতে হবে।

স্ত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা :

নারী তার পিতার সংসার ত্যাগ করে স্বামীর গৃহে আসে। এখানে সে একমাত্র স্বামী ছাড়া সম্পূর্ণ অসহায়। নতুন জীবন ও নতুন পরিবেশকে তাকে বরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রথমত স্বামীকেই প্রেম ভালোবাসা, সহানুভূতি, সুন্দর ও মধুময় ব্যবহার করতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ও নতুন অতিথীর প্রতি গুরু দায়িত্ব বর্তায়। তবে মুখ্য ভুমিকা স্বামীরই। যেহেতু স্বামীই তাকে আল্লাহর নামে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা স্বামীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে :

"আর স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর, সদ্ভাবে জীবন যাপন কর"[২৬১]।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাশেমী লিখেন যে,

" স্ত্রীদের সাথে কার্যত ইনসাফ করো আর ভাল ও সম্মান জনক কথা বলো, একত্রে বসবাস করো যেন তোমাদের স্ত্রীদের বিদ্রোহ বা চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়ার কারই হয়ে না বসো। এ ধরনের কোন কিছু করা তোমাদের জন্য আদৌ হালাল নয়"[২৬২]।

আল্লামা আলুশী বলেন যে,

---

[২৬১] আল কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ১৯।

[২৬২] মুহাসিনুত্ তাবিল, খ.৪, পৃ. ১১৫।

" তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। আর 'ভালভাবে' মানে এমন ভাবে যা শরী'আত ও মানবিক দৃষ্টিতে অন্যায় নয়, খারাপ নয়। স্ত্রীকে মারধোর করোনা, তার সাথে খারাপ কথা বার্তা বলবেনা এবং তাদের সাথে সদা হাসিমুখে ও সন্তুষ্টচিত্তে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে"[২৬৩]।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন,

"যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, নিষ্কলুষ সে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভাল"[২৬৪]।

মহানবী (স.) আরো ইরশাদ করেন :

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক সে, যে তার পরিবার ও স্ত্রী- পরিজনদের পক্ষে ভালো। আর আমি নিজের পরিবার পরিজনের পক্ষে তোমাদের তুলনায় অনেক ভালো। তোমাদের সঙ্গী বা স্বামী যদি মরে যায়, তাহলে তার কল্যাণের জন্য অবশ্যই তোমরা দোয়া করবে।"

রাসূল (স.) আরো ইরশাদ করেন যে,

"বরং তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক হচ্ছে তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের মারপিট করেনা বরং তাদের অনেক কিছুই তারা সহ্য করে নেয়। তাদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা পোষণ করে, তাদের কঠিন মার মারোনা এবং তাদের অভাব অভিযোগ গুলো যথাযথ ভাবে দূর করে।"

"হযরত 'আ'ইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এক সফরে রাসূল করীমের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন: আমি তার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। খালি পায়ে আমি অগ্রগামী হই কিন্তু আমার যখন শরীর ভারী হয়ে পড়ে, তখন আবার দৌড় প্রতিযোগিতা করলে তিনি আমাকে হারিয়ে অগ্রগামী হন। এ সময় তিনি (রসিকতার) বললেন, এটা তোমার প্রথম জিতের প্রতিশোধ"[২৬৫]।

অপর একটি হাদীসে হযরত "আ'ইশা (রা.) বর্ণনা করেন : "তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) এর ওখানে হাড়ি পাতিল দিয়ে খেলা করতাম। আমার কয়েকজন খেলার সাথীও ছিল। রাসূল (স.) যখন ঘরে আসতেন, ওরা লুকিয়ে পড়তো। তখন তিনি ওদের খুঁজে খুঁজে বের করে আমার নিকট নিয়ে আসতেন এবং ওরা আমার সাথে খেলতো"[২৬৬]।

---

[২৬৩] তাফসীর রুহুল মায়ানী।

[২৬৪] তিরমিযী শরীফ।

[২৬৫] আবু দাউদ শরীফ, আবদুল গাফফার হাসান নদভী, অনুবাদঃ আব্দুস শহীদ নাসীম এন্তেখাবে হাদীছ, । (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার), পৃ. ১৩৮। মুসনাদ আহমদ, খ.৬, পৃ.৩৯ অনুচেছদঃ ফি সাবাকি আলার রাজুল।

[২৬৬] বুখারী-মুসলীম, আবদুল গাফফার হাসান নদভী, অনুবাদ- আব্দুস শহীদ নাসিম, এন্তেখাবে হাদীছ (ঢাকাঃ আধিনিক প্রকাশনী) পৃ. ১৩৯।

হাকীম ইব্‌ন মুয়াবিয়া (রা.) তার পিতা মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল (স.) স্বামীর উপর স্ত্রীর কি কি অধিকার আছে? তিনি বললেন, তার অধিকার হলো যখন খাবে (যে মানের) তখন তাকেও খাওয়াবে। তুমি যখন কাপড় চোপড় পরবে তাকেও সে মানের কাপড় চোপড় পরাবে। তার মুখে আঘাত করবেনা। অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করবেনা এবং গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবেনা"[২৬৭]।

হযরত 'আ'ইশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন,

"আল্লাহর শপথ, আমি দেখলাম, রাসূল (স.) আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন আর ঈদে হাবশীরা বর্শা দিয়ে খেলছে মসজিদ প্রাঙ্গনে। রাসূল (স.) আমাকে চাদর দিয়ে ঢাকলেন, যেন আমি দেখতে পারি তাদের খেলা তাঁর কাঁধ ও কানের মধ্য দিয়ে, তার পর তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন আমার খাতিরে, যে পর্যন্ত আমি ফিরলাম। এখন অনুমান করে নাও, একজন অল্প বয়স্ক এবং খেলা ধুলার প্রতি লোভী বালিকা খেলা ধূলার প্রতি কত ইচ্ছুক না হয় (তখন ও আমার এ অবস্থা ছিল) [২৬৮]।

হযরত 'আ'ইশা (রা.) বললেন, এগারজন মহিলা (এক যায়গায়) বসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল এবং চুক্তি করলো যে, তারা নিজেদের স্বামীদের কোন খবরই গোপন করবেনা। প্রথম মহিলা বলল : আমার স্বামী ক্ষীণকায় দূর্বল উটের গোস্তের ন্যায় যা এক পাহাড়ের চুড়ায় রাখা হয়েছে, যেখানে আরোহণ করা সহজ নয় এবং গোস্তের মধ্যে কোন চর্বিও নেই, যার কারণে কেউ সেখানে ওঠার জন্য কষ্ট স্বীকার করবে না। দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমি আমার স্বামীর খবর বলবোনা কারণ আমি আশংকা করছি যে, তার কাহিনী শেষ করতে পারবোনা, আমি যদি তার বর্ণনা দেই তাহলে আমি তার সকল দূর্বলতা ও খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করবো। তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী দীর্ঘদেহী। আমি যদি তার বর্ননা দেই তাহলে সে আমাকে তালাক দেবে। আর আমি যদি চুপ করে থাকি তাহলে সে আমাকে তালাক ও দেবেনা এবং আমার সাথে স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবেনা। চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী তিহামার রাতের মত মধ্যম, যা নাতীশীতোষ্ণ। আমি

---

[২৬৭] আবু দাউদ, আল্লামা জলীল আহসান নদভী, অনুবাদ এ, বি ,এম, আব্দুল খালেক মজুমদার, রাহে আমল, (ঢাকা: মুরাদ পাকাশনী), হুনটেক যাত্রা বাড়ি, (ঢাকা; আধুনিক প্রকাশনী) পৃ. ১২৮, স্ত্রীগণের অধিকার অধ্যায়।

[২৬৮] বুখারী মুসলিম, গাজী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

তার সম্পর্কে ভীত নই, অসন্তুষ্ট ও নই। পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে তখন চিতা বাঘের ন্যায় এবং যখন বাহিরে বেরোয় তখন সিংহের ন্যায়। সে ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলেনা। ষষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী আহার করলে সবই সাবাড় করে দেয় এবং পান করলে কিছুই রাখেনা। সে যখন নিদ্রা যায়, একাই লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটি মেরে শুয়ে থাকে, এমনকি হাত বের করেও দেখেনা যে, আমি কি হালে আছি। ৭ম মহিলা বলল, আমার স্বামী পথভ্রষ্ট অথচ দুর্বলচিত্ত এবং বোকার হদ্দ। যত রকমের ত্রুটি থাকতে পারে সবই তার মধ্যে আছে। সে তোমার মাথায় ও শরীরে আঘাত করতে পারে, উভয়ই করতে পারে। অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের ন্যায় এবং তার গন্ধ হচ্ছে যারনাব (এক প্রকার সুগন্ধী যুক্ত ঘাস) এর ন্যায়। নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী উঁচু অট্টালিকার ন্যায় মর্যাদা সম্পন্ন এবং তরবারী ঝুলিয়ে রাখার জন্য চামড়ার ফালি পরিধান করে (সে দানশীল এবং সাহসী) তার ছাই ভস্মের পরিমাণ প্রচুর। (সে অতিথী পরায়ণ) এবং তার বাড়ি হচ্ছে জনগনের কাছে। যাতে তারা সহজেই তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। (তিনি জনগনের আপন বন্ধু)। দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম মালেক, আর মালেকের কি প্রশংসা করব? মালেক হচ্ছে এর চাইতে ও অনেক বড়, যা তার সম্পর্কে আমি বলব (আমার মনে তার যতো প্রশংসাই আসুক না কেন সে তার উর্দ্ধে) তার অধিকাংশ উটই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের উদ্দেশ্যে জবেহ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে) এবং মাত্র কিছু উট চরাবার জন্য মাঠে রাখা হয়। উট গুলো যখন বাঁশির আওয়াজ শুনে তখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে অথিতীদের জন্য জবেহ করা হচ্ছে।

একাদশ মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে আবু যারয়া, তার কথা কি বলব? সে আমাকে এতো বেশী অলংকার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমে গেছে। সে আমাকে এতো সুখে রেখেছে এবং আমি এত আনন্দিত যে, এ জন্য আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি, সে আমাকে এমন এক পরিবার থেকে এনেছে, যারা শুধুমাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক ছিল। অত:পর আমাকে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিয়ে আসে যেখানে অশ্বের হ্রেস্বা ধ্বনি, উঠের হাওদার খটখটানি এবং শষ্য মাড়ানির খসখসানী শুনা যায়। আমি যা কিছুই বলতাম, সে আমাকে ভৎসনা কিংবা বিদ্রুপ করতোনা। যখন আমি নিদ্রা যেতাম, সকালে দেরী করে ঘুম থেকে উঠতাম, যখন আমি পান করতাম তৃপ্তিসহকারে পান করতাম। আবু যারয়ার মা, তার কথা কি বলব, তার থলে ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর ছিল সর্বদা প্রশস্থ। আবু যারয়ার পুত্রের ব্যাপারে

কি আর বলব, সেও খুব ভালো ছিল। তার সয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হতো যেন কোষমুক্ত তরবারী (স্মাট ও স্লিম বডি) আর তার খাদ্য মাত্র ছাগলের একখানা পা, (অর্থাৎ কমভোজী) আর আবু যারয়ার কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে স্বীয় পিতা-মাতার অনুগত। যে যারয়ার ক্রীতদাসী তার কথা বা কতো বলবো। সে আমার ঘরের গোপন কথা বাইরে ফাঁস করেনা বরং নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সে আমাদের সম্পদের ঘাটতি করেনা। আমাদের ঘরকে ময়লা আবর্জনা দিয়ে ভরেও রাখেনা। একদিন এক ঘটনা ঘটল । আবু যারয়া (যখন দুধ দোহন করা হচ্ছিল) এমন সময় বাইরে বের হল এবং সে এক রমনীকে দেখতে পেল, যার দুটি পুত্র রয়েছে। তার তাদের মায়ের স্তন নিয়ে চিতাবাঘের ন্যায় খেলা করছিল (দুধ পান করছিল এবং খেলছিল) এ মহিলাকে দেখে (তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে) সে আমাকে তালাক দিল এবং তাকে বিয়ে করল। অতপর আমি আর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম যে দ্রুত বেগে ধাবমান অশ্বে আরোহন করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। সে আমাকে প্রত্যেক প্রকার গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যারয়া তুমি (এগুলো থেকে) খাও এবং নিজ আত্মীয় স্বজনদেরকেও খুশিমত উপহার - উপঢৌকন দাও। মহিলা আরো বলল : কিন্তু সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে, আবু যারয়ার সামান্য একটি পাত্রও তা পূর্ণ করতে পারবেনা। 'আ'ইশা (রা.) বলেন: রাসূল (স.) আমাকে বললেন, "আবু যারয়া তার স্ত্রী উম্মে যারয়ার প্রতি যেরুপ আমিও তোমার প্রতি তদ্রুপ।" (শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে সে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে আমি তোমাকে তালাক দেয়নি)[২৬৯]।

"একবার হযরত 'আ'ইশা (রা.) নিজের সম্পর্কে নবীর (স.) কাছে একটি সুন্দর উপমা পেশ করলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি যদি গাছপালা ও লতাগুল্ম ভরা উপত্যাকায় যান তাহলে কি আপনার বকরী পালকে পাতা পল্লবধারী গাছ পালার মধ্যে চরাবেন, নাকি যে সব গাছের পাতা পল্লব জীব যন্তু খেয়ে গিয়েছে সেখানে চরাবেন? নবী (স.) জবাব দিলেন : পাতা পল্লবধারী গাছের কাছেই চরাবো"[২৭০]। হাদীছটি মুসলিম শরীফ, নাসায়ী এবং অনেক মুহাদ্দীছ বর্ননা করেন, কোথাও ঘটনার অর্ধেক আবার কোথাও সম্পূর্ন আবার কোথাও

---

[২৬৯] বুখারী শরীফ, কিতাবুন্ নিকাহ, হুসনুল মুআশারাতি, মা'আল আহ্‌ল।

[২৭০] বুখারী শরীফ কিতাবুন্ নিকাহ, অনুচ্ছেদ নিকাহুল আকবর, সাইয়্যেদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩২।

শেষের অংশ বর্ণিত হয়েছে, হাফেজ ইব্‌ন হাজারের (রা.) ব্যাখ্যা অনুসারে নবী করীম (স.) নিজে এই ঘটনা বলেছিলেন[২৭১]।

উপরে হযরত 'আ'ইশা (রা.) বর্ণিত কয়েকটি হাদীছের ঘটনা প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাসূল (স.) ও তার মধ্যে বাক্যালংকার পূর্ণ ও উপমা অনুপম হাসি তামাসা ও সুক্ষ রুচি বোধের কত সুন্দর উদাহরণ। বস্তুত ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে আইনগত বন্ধন ও কঠোরতার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়না বরং তাতে একটা বৈচিত্র ও সৌন্দর্যময়তা সৃষ্টি করে যে, তা নিজেই একটি আলাদা স্বাদ ও আনন্দের দুনিয়ায় রুপান্তরিত এবং কোন আবেদনই বাকী নেই দাম্পত্য বন্ধনের সীমার মধ্যে যার ব্যবস্থা ইসলাম করেনি। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক মধুময় বন্ধন ও স্বভাবের উপর নির্ভর করে গোটা পরিবার ও সমাজের সৌন্দর্য। যার ফলে রাসূল (স.) স্ত্রীদের সাথে সুন্দর সুন্দর কথামালা সাজিয়ে কথা বলতেন। যাতে তারা আনন্দ পায়। বস্তুত এটি একজন প্রকৃত মুমিন মুত্তাকির লক্ষণ ও বটে। বেশী বেশী ভাব গাম্ভীর্যতা ইসলাম পছন্দ করেনা। ইসলাম মানুষের স্বাভাবিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ধৈয্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা :

মেয়েরা সাধারণত লাজুক স্বভাবের হয়ে থাকে। খুব স্বল্প সময়ে রেগে যাওয়া, হঠাৎ আন্দোলিত হওয়া, অভিমানে ক্ষুব্দ হওয়া স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চল হয়ে উঠা নারী চরিত্রের বিশেষ দিক। তাই আল্লাহ এই বিশেষ চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে ঘোষণা করলেন :

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার ও বসবাস করো, তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিষকে অপছন্দ করছ। অথচ আল্লাহ তা'আল তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দেবেন"[২৭২]।

মাওলানা সানাউল্লাহ পানি পতি এ আয়াতের তাফসীর করেছেন এ ভাবে যে,

"স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার ও তাকে নিয়ে ভালভাবে বসবাস করার মানে হচ্ছে কার্যত তাদের প্রতি ইনসাফ করা। তাদের হক-হকুক রীতিমত আদায় করা এবং কথা-বার্তায় ও আলাপ-ব্যবহারে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন। আর তারা তাদের কুশ্রিতা কিংবা খারাপ

---

[২৭১] ফাতহুল বারী, খ.৯, পৃ.২০৩।

স্বভাব-চরিত্রের কারণে যদি তোমাদের অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করো, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেনা, তাদের কষ্ট দেবেনা, তাদের কোন ক্ষতি করবেনা"[২৭৩]। বস্তুত স্বামীদের প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হচ্ছে :

তোমরা যাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলে, যাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে, তার প্রতি সব সময় খুব ভাল ব্যবহার করবে। তাদের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে। সামান্য কারণে যদি পরিস্থিতি একটু বিপরীত হয় তবে ধৈয্য সহিঞ্চুতা, সোহাগ দৃষ্টি, বিচক্ষণতা সহকারে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার চেষ্টা করতে হবে। বস্তুত সমস্ত অন্তর দিয়েই তাকে নিজের করে নিতে হবে। হয়ত স্ত্রীর কোন গুন বৈশিষ্ট্য নিজের কাংখিত নয় তবে আল্লাহর বাণী অনুযায়ী সেটা তিনি অন্যভাবে পুষিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। সর্বোপরী স্ত্রীদের সাথে ধৈর্য্য, সহিঞ্চুতা, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বসবাসই কাম্য। আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেন :

"তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যে রুপ বাড়িতে বসবাস কর, তাদিগকে সেইরুপ বাড়ীতে বাস করতে দিও, তাদেরকে উত্যক্ত করে সংকটে ফেলিওনা"[২৭৪]। এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, স্ত্রীদেরকে সামর্থানুযায়ী ভাল যায়গায় রাখতে হবে। নিজেদের সাথেই রাখতে হবে। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

" কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলাকে তার কোন একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃনা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশীও হতে পারে"[২৭৫]। কেননা কোন নারীর একটা দোষ তার সব গুনকে নষ্ট করে দিতে পারেনা, তার সৎ গুণগুলো বিকাশে সহযোগিতা ও করতে হবে।

আল্লামা শাওকানী এই হাদীছ সম্পর্কে লিখেছেন:

"এই হাদীছ স্ত্রীদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার ও ভালভাবে অভ্যাস করার নির্দেশ যেমন আছে তেমনি তার কোন এক অভ্যাস স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃনা করতে নিষেধও করা

---

[২৭২] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ১৯।

[২৭৩] তাফসীর মাজহারী, খ.২, পৃ. ০৫।

[২৭৪] আল কুরআন, সুরা আত্ তালাক ৬৫ : ৬।

[২৭৫] মুসলিম শরীফ, মুসনাদ আহমদ।

হয়েছে। কেননা তার মধ্যে অবশ্যই এমন কোন গুণ থাকবে, যার দরুন সে তার প্রতি খুশিও হতে পারবে"[২৭৬]।

মহানবী (স.) স্বামীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে ইরশাদ করেন যে, :

"আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম (স.) থেকে বর্ননা করেন, যে লোক আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় আর তোমরা স্ত্রী লোকদের কল্যাণকামী হও। কেননা তারা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্ট। আর পাঁজরের হাড়ের উচ্চ দিকটাই বেশী বাঁকা। তুমি যদি উহাকে সোজা করতে যাও, তাহলে উহা চূর্ণ করে ফেলবে। আর উহাকে যদি এমনিই ছেড়ে দাও তা হলে উহা চিরকাল বাঁকাই থাকবে। অতএব তোমরা মেয়েদের প্রতি কল্যাণকামী হও"[২৭৭]।

ইমাম বায়জাবী এই হাদীছের ব্যাখ্যাংশে উল্লেখ করেন যে,

"আমি তোমদেরকে স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে ভাল উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তাদের ব্যাপারে আমার দেয়া এই অসিয়ত কবুল কর।"

ইমাম তাইয়্যেবী লিখেছেন:

"তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আমার দেওয়া উপদেশ ও নসীহত গ্রহণ কর, সেই অনুযায়ী আমল কর। তাদের ব্যাপারে মোটেই তাড়া হুড়া করোনা- বিশেষ ধৈর্য্য- তিতিক্ষা ও অপেক্ষা-প্রতিক্ষা অবলম্বন করিও। তাদের সাথে খুবই সহৃদয়তাপূর্ণ দয়াদ্র এবং নম্র-মসৃন ব্যবহার গ্রহণ করবে। আর তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পামূলক আচরণ করবে"[২৭৮]। আল্লামা আহমাদুল বান্না উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন :

"এ হাদীছের মানে হচ্ছে, কোন মুমিনের উচিত নয় অপর কোন মুমিন স্ত্রীলোকের সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় ঘৃনা পোষণ করা, যার ফলে চুড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ দেখা দিতে পারে। বরং তার কর্তব্য হচ্ছে মেয়েলোকটির ভাল গুনের খাতিরে তার দোষ ও খারাবী ক্ষমা করে দেয়া আর তার মধ্যে ঘৃনা যা আছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বরং তার প্রতি ভালবাসা জাগাতে চেষ্টা করা। হতে

---

[২৭৬] বুখারী শরীফ, কিতাবুন নিকাহ, হুসুনুল মুআসারাতি মা আল আহল, মুসলিম, নাসায়ী আরো অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় পূর্ণ ও আংশিক হাদীছ পাওয়া যায় হাদীছ শরীফ মাও. আবদুর রহিম, খ.৩, পৃ. ১৪২।

[২৭৭] নাইলুল আওতার, খ.৬, পৃ. ৩৫৯।

[২৭৮] মাও: আ: রহীম,হাদীছ শরীফ, খ.৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

পারে তার স্বভাব অভ্যাস খারাপ; কিন্তু সে বড় দ্বীনদার কিংবা সুন্দুরী রুপসী বা নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পন্না অথবা স্বামীর জন্যে জীবন সঙ্গিনী"[২৭৯]।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন যে,

"এই হাদীসে স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার ও ভালভাবে বসবাস করার নির্দেশ যেমন আছে, তেমনি তার কোন এক অভ্যাস স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃনা পোষণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তার মধ্যে অব্যশ্যই এমন কোন গুন থাকবে, যার দরুন সে তার প্রতি খুশী হতে পারবে"[২৮০]।

"পাঁজর থেকে সৃষ্টি" এ কথাটির অর্থ করেছেন আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী এভাবে যে, "পাঁজর থেকে সৃষ্টি" কথাটা বক্রতা বোঝার জন্য রুপক অর্থে বলা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যে, মেয়েদের এমন এক ধরণের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সেই সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে বক্রতা বাঁকা হওয়া, অর্থাৎ- মেয়েদের এক বাঁকা মূল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অত এব তাদের দ্বারা কোনরুপ উপকারিতা লাভ করা সম্ভব কেবল তখনি, যদি তাদের মেজাজ স্বভাবের প্রতি পূর্ণরুপে সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য রেখে কাজ করা হয় এবং তাদের বাঁকা স্বভাবের দরুন কখনো ধৈয্য হারানো না হয়"[২৮১]।

আল্লামা ইব্‌ন হাজার আসকালানী এ সম্পর্কে বলেন যে,

"নারীদের এই বাঁকা স্বভাব দেখে তাদের এমনি ছেড়ে দেয়া উচিত নয়; বরং ভাল ব্যবহার ও অনুকূল পরিবেশ দিয়ে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করাই পুরুষের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত- নারীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা সব সময়ই প্রয়োজন। তাহলেই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হবে। সেই সঙ্গে মেয়েদের অনেক 'দোষ' ক্ষমা করে দেয়ার গুণও অর্জন করতে হবে স্বামীদের। খুঁটি-নাটি ও ছোট খাটো দোষ দেখেই চটে যাওয়া কোন স্বামীরই উচিত নয়।"

নারী স্বভাবজাত জেদী, নিজের মত ও সিদ্ধান্তে সর্বদা অটল থাকে। তবে পাশা পাশি তারা কষ্টসহিঞ্চু অল্পে তুষ্ট, স্বামীর জন্য জীবন প্রাণ উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। সন্তান

---

[২৭৯] বুলুগুল আমানী, খ.১৬, পৃ. ২৩২।

[২৮০] নাইলুল আওতার, খ.২, পৃ. ৩৫৯।

[২৮১] উমদাতুল কারী, খ.২০, পৃ. ১৬৬।

গর্ভেধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন পালনের কাজ নারীরা- মায়েরা কতখানি কষ্ট সহিষ্ণু মন দিয়ে সম্পন্ন করে, তা পুরুষেরা ভাবতেও পারবেনা। সুতরাং এধরনের কঠিন যন্ত্রনাদায়ক কাজের কথা পুরুষকে ভাবতে গেলে তার অন্যান্য দোষ ত্রুটি ক্ষমা করতেই হবে। ঘর সংসার ব্যবস্থাপনার মত ধৈয্যশীল কাজে নারী সিদ্ধহস্থ এব্যাপারে সে একবারে স্বভাবজাত বিশ্বস্থ।

একজন ইউরোপীয় চিন্তাবিদ লুম ব্রজারের বক্তব্য হল:

"গর্ভ ও প্রসবের কঠিন কষ্ট সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং ভেবে দেখুন যে, নারীরা দুনিয়ার বুকে কত কঠিন দু:খ-কষ্ট সহ্য করছে। যদি নারীদের অনুভূতি শক্তি পুরুষের মতই তীক্ষ্ণ হতো, তা হলে কিছুতেই তারা এত বড় দু:খ নীরবে সহ্য করতে পারতনা, মানব জাতির সৌভাগ্য যে, আল্লাহ নারীদের প্রখর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তা না হলে বনী আদমের গুরুভার বয়ে চলা কারুর পক্ষেই সম্ভব হতনা"[২৮২]।

বিখ্যাত নিহিলিষ্ট দার্শনিক মনীষী প্রুডেন তাঁর "ইবতেখার আন্ নিযাম" গ্রন্থে লিখেছেন:

"মেয়েদের জ্ঞান শক্তি পুরুষের জ্ঞান শক্তি থেকে যতখানি দূর্বল, ঠিক ততখানি পার্থক্য দেখা দেয় তাদের রুচিবোধের ভেতরে। তাদের চারিত্রিক শক্তি ও পুরুষের সমান নয়। তাদের স্বভাবই সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। তাই দেখা যায় যে, তাদের ভাল মন্দ বিচার পুরুষের ভাল মন্দের বিচারের সাথে সাধারণত এক হয়না। এতে প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষের অনৈক্যটা শুধু বাইরেরই নয়। পরন্ত সেই সব প্রকৃতি গত পার্থক্যেরই বহি:প্রকাশ মাত্র"[২৮৩]। তবে এ ব্যাপারে বিপরীত মতও পাওয়া যায় যে,

অধ্যাপক তুন জাযো লিখেছেন: "নারী ও পুরুষের ভেতর মেধা শক্তির যে ব্যবধানটা আজ সবচাইতে বড় দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে যুগ যুগ ধরে পুরুষের দাসত্বে তাদের বন্দী রাখা।"

আবার অধ্যাপক দৌফরানী আসল তথ্য প্রকাশ করে বলেন যে,

---

[২৮২] গাজী শামসুর রহমান, ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ, (ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১), পৃ. ১১১।

[২৮৩] ইফতে খারুন নিজাম, প্রুডেন, ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ, পৃ.১১০।

"নর ও নারীর দৈহিক ও মানসিক ব্যবধান তোমরা যেভাবে সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পারস্যের বাসিন্দাদের ভেতরে দেখতে পাবে, ঠিক তেমনই দেখতে পাবে আমেরিকার চরম অসভ্য জাতিগুলোর ভেতরে"[২৮৪]।

সৈয়দ কাওসার জামাল লিখেছেন,

"গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে, তার আদর্শ রাষ্ট্রে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের কথা আমরা জানি, তাঁর সেই বিখ্যাত রিপাবলিক গ্রন্থটিতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা নারীর চেয়েও বেশী এবং নারীর নিজের ওয়েল বিয়িং এর কারণেই একজন পুরুষকে প্রয়োজন। আবার যখন তিনি Laws লিখেছেন,তখন এ ধারণা তাঁর মধ্যে স্পষ্ট যে, নানা কারণে সমাজ পুরুষ শাষিত হওয়া বাঞ্চনীয়। নারী সম্পর্কে প্লেটোর ধারণায় যে শেষ অবধি নারীর ক্ষমতার বেশী কিছু হয়নি তা উদাহৃ হতে পারে, Timaeus থেকে যেখানে তিনি বলেছেন:

The womb is an animal which longs to generate children. When it remains barrean too long after poberty, it is distressed and Surely disturbed."[285]

আধুনিক সময়ে ও ফ্রয়েড নারীকে "অসম্পূর্ণ পুরুষ" বলে মনে করেছেন। সে কারণে তাঁর ধারণা, পুরুষের জগতে যে কোন প্রতিযোগিতাতেই নারীর অসামার্থ্যতা প্রকাশ পাবে। এখানে উপরোক্ত আলোচনার অবকাশ এ জন্য যে, নারীর শারীরিক ও মানুষিক দুর্বলতা যেহেতু সৃষ্টিগত, সেহেতু পুরুষকে এ সব দূর্বলতায় ধৈয্য, সহিঞ্চুতা ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ফলে অসম্পূর্ণ গুন গুলোতে পরিপূর্ণতা আসবে। উভয়ের যৌথ উদ্যোগ সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশালী পরিবার। যা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণময় সুবাতাস ছড়িয়ে দেবে যুগ-যুগান্তরে, পথে-প্রান্তরে, নগরে-বন্দরে সর্বত্র।

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন:

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা কর, তাদের উপর বেশী

---

[২৮৪] গাজী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

[২৮৫] সৈয়দ কাওসার জামাল, 'নারী-পুরুষ' 'দেশ' পত্রিকা, (কলকাতা: ১লা সেপ্টেম্বর' ১৯৭৯)।

চাপ প্রয়োগ না কর বা জোর জবর দস্তি না কর এবং তাদের দোষ ত্রুটি ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখবে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান"[২৮৬]।

নবী করীম (স.) তাঁর স্ত্রীদের অনেক বাড়া বাড়িই মাফ করে দিতেন। হযরত উমর ফারুকের (রা.) বর্ণিত একদিনের ঘটনা থেকে তা বাস্তব ভাবে প্রমাণিত হয়। "হযরত উমর (রা.) খবর পেলেন, নবী করীম (স.) তাঁর বেগমগণকে তাঁদের অতিরিক্ত বাড়া বাড়ির কারণে তালাক দিয়েছেন। তিনি এ খবর শুনে খুব ভীত হয়ে রাসূলের নিকট উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন: আপনি আপনার বেগমদের তালাক দিয়েছেন? রাসূল (স.) বললেন: না। পরে রাসূল (স.) তার সাথে হাসিমুখে কথা বলেছেন"[২৮৭]।

উক্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী লিখেছেন যে, এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীদের পীড়ন ও বাড়া বাড়িতে ধৈয্য ধারণ করা, তাদের দোষ-ত্রুটির প্রতি বেশী গুরুত্ব না দেওয়া এবং স্বামীর অধিকার পর্যায়ে তাদের যা কিছু অপরাধ বা পদস্খলন হয়, তা ক্ষমা করে দেয়া স্বামীর একান্ত কর্তব্য। তবে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় না করলে সেখানে ক্ষমা করা যেতে পারেনা"[২৮৮]।

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের প্রতি বিরূপ ধারণা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন:

"তোমরা যদি স্ত্রীদের অপছন্দই করে বস, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখ যে, এটা খুবই সম্ভব যে, তোমরা হয়ত কোন একটি জিনিষ অপছন্দ করতেছ, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাতেই বিপুল কল্যাণ রেখে দিয়েছেন"[২৮৯]।

মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন, মহানবী (স.) এর দিক নির্দেশনামূলক বাণী সমূহ এবং বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ - ফিক্হবিদদের মতামতের আলোকে এই কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, নারী-পুরুষ তথা স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের পরিপূরক। সৃষ্টিগতভাবে উভয়ের কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে। মন-মেজাজ, রুচীবোধ, ধৈয্য-সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর চেয়ে অনেকটা অগ্রসর। পুরুষকে নারীর উক্ত দূর্বলতাকে পুঁজি না করে বরং ধৈয্য ও

---

[২৮৬] আল কুরআন, সুরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৪।

[২৮৭] বুখারী শরীফ, নারী অধ্যায়।

[২৮৮] উমদাতুল কারী, খ.২, পৃ. ১৮৩।

[২৮৯] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ১৯।

সহনশীলতা, সহমর্মিতা দিয়ে বরণ করে নেবে। এর ফলে অসম্পূর্ণ গুনাবলীর মাঝে পূর্ণতা এসে যাবে।দুইয়ের মধুময় সম্মিলনে পরিণত হবে এক মহাশক্তির। সৃষ্টি হবে আদর্শ চরিত্রবান বংশ ধারার। রচিত হবে একটি সুন্দর সমাজ, সে সমাজে প্রবাহিত হবে শান্তির ফলগু ধারা।

নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখাঃ

প্রকৃত পক্ষে নারী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট জীবের মধ্যে অন্যতম রহস্যময়ী সৃষ্টি। সুস্থতা পাশাপাশি অসুস্থতা তাদের সহঅবস্থান। একথা পুরুষের জন্যেও প্রযোজ্য। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে বিশেষ অসুস্থতা রয়েছে যা স্বভাবজাত। তারা চিন্তাশক্তি ও দৈহিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ-দুর্বল ও অপূর্ণাঙ্গ"[২৯০]।

মহানবী (স.) স্ত্রীলোকদের প্রকৃতিগত এক মৌলিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য স্বামীদেরকে নির্দেশ করেছেন।

"মেয়েলোক সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। তুমি যদি জীবন ভরেও কোন স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, আর কোন এক সময় যদি সে তার মর্জী-মেজাজের বিপরীতে কোন ব্যবহার তোমার মাঝে দেখতে পায় তাহলে তখনি বলে উঠবেঃ 'আমি তোমার কাছে কোনদিনও সামান্য কল্যাণও দেখতে পাইনি"[২৯১]।

উক্ত হাদীসে যেমন নারীদের মৌলিক স্বভাবজাত দূর্বলতার কথা বলা হয়েছে, তেমনি স্বামীদেরকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের দূর্বলতাকে নীছক স্বভাবজাত ধরে গ্রহণ না করতে পারলে পারিবারিক জীবনে ভূল বুঝা বুঝি ও অশান্তির কালো মেঘে ঢেকে আসবে। এক্ষেত্রে পুরুষ স্বামীকেই অধিক ধৈয্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। সম্ভবত এখানে নারীর ঋতুস্রাব ও নিফাস এবং মানুষিক ব্যবধানকেই স্বভাবজাত দুর্বলতা বলা হয়েছে।

মহানবী (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে এ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন :

আবু দাউদের বর্ণনা :

"হে মুসলিম জনতা, স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আমানত হিসাবে পেয়েছ এবং

---

[২৯০] বুখারী শরীফ, কিতাবুল হায়েজ, অনুঃ তারকুল হায়েজিস সাওমা।

আল্লাহর কালেমার সাহায্যে তাদের দেহ ভোগ করাকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছ। আর তাদের উপর তোমাদের জন্য এ অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির দ্বারা তোমাদের দুজনের মিলন-শয্যাকে মলিন ও দলিত, কলংকিত করবেনা।"

অথবা স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর ঘরে অপর কাউকে প্রবেশ করতে পর্যন্ত দেবেনা"[২৯২]।

অতএব দাম্পত্য জীবনে পরিবারের শাসন কর্তাকে প্রকৃত ন্যায় ও মহানুভব শাষকের ভূমিকাই পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে তার সহযোগী-সহধর্মিনীর স্বভাবজাত দুর্বলতাকে সহনশীল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। নারী মন মেজাজগত দিক থেকে বৈচিত্রময়। শারীরিক অক্ষমতা হেতু দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য স্বামীকে সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। যেহেতু এই সকল মানুষিক ও শারীরিক দুর্বলতা তাদের স্বভাবজাত আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত, সেহেতু স্বামী কতৃক তদ্রুপ আচরণ তাদের অধিকার ও বটে।

হযরত উম্মে সালমা বলেন :

নবী করীম (স.) এর (পরিবারের) মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ চল্লিশ দিন পর্যন্ত নেফাস অবস্থায় থাকতেন। তিনি তাদের সেই সময় নামায কাযা করার নির্দেশ দিতেন"[২৯৩]।

বস্তুত স্বভাবিক ঋতুকালে ও নেফাস অবস্থায় তাদের দৈহিক ব্যবস্থাপনায় এতটা বিশৃংখলা দেখা যায় যে, অধিক মনোযোগ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় এমন কাজ করার আদৌ যোগ্যতা হারিয়ে যায়। সন্তান প্রসব কালীন সমস্যা হলো তার জীবন-মরণ সমস্যা। মাসিক অবস্থায় ইসলামী শরী'আত তার নামায মওকুফ করে দিয়েছেন।

যদিও হায়েজ ও নিফাসের সময় রোযা ফরয হয় কিন্তু এ সময় রোযা পালন না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শারীরিক দিক দিয়ে যোগ্য হলে এ রোযা অন্য সময় কাযা হিসাবে আদায় করতে বলা হয়েছে। হযরত 'আ'ইশা (রা.) বলেনঃ আমাদেরকে হায়েজের সময়ের রোযা কাযা আদায় করার আদেশ দেয়া হতো। কিন্তু নামাযের কথা আদায়ের আদেশ দেয়া হতোনা"[২৯৪]।

---

[২৯১] বুখারী শরীফ বাবুল কুফরান আল আশিরা।

[২৯২] আবু দাউদ, মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, বজলুল মজহুদ, খ.৩, পৃ. ১৫৫।

[২৯৩] আবু দাউদ, কীতাবুস্ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মা জায়া ফি ওয়াকতিন নুফাসা।

[২৯৪] মুসলিম, কিতাবুল হায়েজ : অনুচ্ছেদঃ ওজুবু কাদায়িস সাওমে আলাল হায়েজ।

গর্ভধারণ ও দুগ্ধদানকালে ও কম বেশী একই সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সময়ে রোযার মত কষ্টকর ইবাদত করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এজন্য ইসলামী শরী'আত তাকে অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছে।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের অর্ধেক নামায মাফ করে দিয়েছেন (মুসাফিরকে চার রাকআতের বদলে দুই রাকাআত নামায পড়তে হয়) আর গর্ভবতী আর দুগ্ধদান কারীনী মেয়েদের রোযা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা আবশ্যক করে দেননি। (তারা অন্য মাসে রোযা আদায় করতে পারবে)"[২৯৫]।

স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ না করা:

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক। আল কুরআনের ভাষায়- "তারা তোমাদের জন্য পোষাক, আর তোমরা তাদের জন্য পোষাক"[২৯৬]।

একে অপরের জন্য অলংকার। লজ্জা ও সম্মানের ভূষণ। প্রত্যেক প্রত্যেকের মান সম্মানের হিফাজত কারী। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অন্যতম দাবী হক হল, স্বামী-স্ত্রীর যাবতীয় গোপনীয়তা, একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় সমূহের সংরক্ষণ করবে। অপর কাউকে তা প্রকাশ করা যাবেনা। ইসলামে নারীর মর্যাদার এটিও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেছেন:

"যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় ও স্ত্রী মিলিত হয় তার স্বামীর সাথে, অত:পর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়- প্রচার করে, সে স্বামী আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি"[২৯৭]।

বস্তুত যে স্বামী তার স্ত্রীর গোপন বিষয় ও তাদের সম্পর্কিত একান্ত গোপনীয়তা মানুষের কাছে-বন্ধুদের কাছে বলে বেড়ায়া সে ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ। স্ত্রীর কাছে যেমন সে অপরাধী তেমনি সাধারণ মানুষের কাছেও নিঘৃহীত। আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলের (স.) কাছে ঘৃনিত ব্যক্তি।

---

[২৯৫] ইব্‌ন মাজা, আবওয়াব, মাজায়া ফিস সিয়াম, বাবু মা জায়া ফিল ইফতারি লিল হামেলি ওয়াল মুরদিয়ি। তিরমিযী আবু দাউদ ও নাসায়ী একই অর্থ বোধক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

[২৯৬] আল কুরআন, সুরা বাকারা, ২ : ১৮৭।

[২৯৭] মুসলিম শরীফ, মুসনাদ আহমদ, মাও. আ: রহীম, হাদীছ শরীফ খ.৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে ইমাম নববী বলেন যে:

“স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যৌন-সম্ভোগ সম্পর্কিত গোপন বিষয় ও ঘটনা প্রকাশ করা এ হাদীসে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেয়”[২৯৮]।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত:

একদা মহানবী (স.) নামাযের পর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন:

“তোমাদের মধ্যে এমন পুরুষ কেউ আছে কি? যে তার স্ত্রীর নিকট আসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়, তার পর বের হয়ে এসে লোকদের সাথে কথা বলে ও বলে দেয়: আমি আমার স্ত্রীর সাথে এই করেছি, এই করেছি?......। হাদীছ বর্ণনা কারী বললেন এই প্রশ্ন শুনে সব সাহাবীই চুপ থাকলেন। অত:পর মেয়েদের প্রতি প্রশ্ন করলেন---

“তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি?, যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্যের কথা প্রকাশ করে ও অন্যদের বলে দেয়।

তখন এক যুবতী মেয়ে বলে উঠল-

“আল্লাহ তা'আলার শপথ, এই পুরুষরাও যেমন সে কথা বলে দেয়, তেমনি এই মেয়েরাও তা প্রকাশ করে।”

তখন নবী করীম (স.) বললেন,

“তোমরা কি জান, এইরূপ যে করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সে যেন একটি শয়তান, সে তার সঙ্গী শয়তানের সাথে রাজ পথের মাঝখানে সাক্ষাৎ করল। অমনি সেখানে ধরেই তার দ্বারা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল। আর চারদিকে লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকল”[২৯৯]।

আল্লামা শাওকানী এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেন:

“এ দুটো হাদীছই প্রমাণ করছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গম কার্য প্রসংগে যত কিছু এবং যা কিছু ঘটে থাকে তার কোন কিছু প্রকাশ করা- অন্যদের কাছে বলে দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম”[৩০০]।

আল্লাহ তা'আলা এই ব্যাপারে মেয়েদের উত্তম গুনাবলী বর্ণনা স্বরূপ ইরশাদ করেন-

---

[২৯৮] নববী ফি শরহে মুসলিম, খ.১।

[২৯৯] ইমাম আহমদ, আবু দাউদ শরীফ নাসাই, তিরমিজী শরীফ, মাও. আব্দুর রহীম, হাদীছ শরিফ, খ.৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

[৩০০] নাইলুল আওতার, খ.৬, পৃ. ৩৫১।

"তারা অতিশয় বিনয়ী, অনুগতা, অদৃশ্য কাজের হেফাজত কারিনী। আল্লাহর হেফাজতের সাহায্যে"[৩০১]।

আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে চিন্তা করলেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর একান্ত গোপনীয়তা বাহিরে প্রকাশ পেলে ঐ পুরুষ-স্ত্রীর সম্পর্কে মানুষের ধারণা খারাপ হয়ে যায়। বস্তুত একজন উলঙ্গ নারীকে মানুষের সামনে উপস্থিত করলে ঐ নারীর প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ থাকবেনা। তথাপি মানুষ তাকে পাগল বলবে। এতে গোপনীয়তা বিলুপ্ত হয় স্বাভাবিকতা বর্জিত হয়ে বিকৃত রুচির দৃশ্যপট হয়, ইসলামী দাম্পত্য জীবন হল এক পূত -পবিত্র স্বর্গ ভূমি। গোপন জিনিষকে গোপন রাখা আর প্রকাশ পাওয়া জিনিষকে প্রকাশ করতে দেওয়া সৃষ্টির স্বাভাবিক দাবিও বটে। আসলে অতিরিক্ত কথা ও অপ্রয়োজনীয় কথা কাজ পরিত্যাগ করা এবং লজ্জাশীলতা একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

স্ত্রীর বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শনঃ

স্বামী-স্ত্রী একই গাছের দুটি ডালের মতই, দাম্পত্য জীবন একটি স্থায়ী ব্যাপার। এক্ষেত্রে সার্বিক ও অগ্রবর্তী ভূমিকা স্বামীকেই রাখতে হবে। কারণ স্বামী তার শাসন কর্তা ও অভিভাবকও বটে। রোগে-দু:খে, হতাশায়, শোকে স্বামীকে শান্তনার সুরে একান্ত আপনজনের ভূমিকা পালন করতে হবে। নবী করীম (স.) স্ত্রীর বিপদাপদে সহানুভূতিপূর্ণ হবার নির্দেশ করেন,

তিনি ইরশাদ করেন :

"যে লোক নিজে অপরের জন্য দয়াপূর্ণ হয়না সে কখনো অপরের দয়া-সহানুভূতি লাভ করতে পারবেনা।"

বস্তুত স্ত্রীর বিপদ, দু:খ ভারাক্রান্ত মূহুর্তে স্বামী যদি তাকে আপন করে নিতে না পারে তাহলে স্বামীর বিপদেও স্ত্রী তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেনা, এটি একটি মানবিক ব্যাপার।

একদা হযরত উমর (রা.) বিরহিনী নারীর একটি কাহিনী শুনে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তখন তিনি তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসাকে জিজ্ঞেস করলেন:

---

[৩০১] আল কুরআন, সূরা নিসা ৪ : ৩৪।

"মেয়েলোক স্বামী ছাড়া বেশীর ভাগ কতদিন ধৈর্য্যধারণ করতে পারে।" হযরত হাফসা বললেন: "চার মাস"

তখন হযরত উমর (রা.) বলে উঠলেন:

"সৈন্যদের মধ্যে কাউকে আমি চার মাসের অধিক বাইরে রাখবনা। সাথে সাথে তিনি সেনাপতিকে লিখে পাঠালেন:

"এই চার মাসের অধিক কোন বিবাহিত ব্যক্তিই তার স্ত্রী-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন যেন না থাকে"[৩০২]।

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর মনের বাসনা ও কামনা পূর্ণ ভাবধারার প্রতি স্বামীকে অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি আয়াত এখানে প্রনিধানযোগ্য:

"যেসব লোক তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে কসম খেয়ে বলে যে, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি করবেনা, তাদের জন্যে মাত্র চার মাসের মেয়াদ অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে তারা যদি ফিরে আসে, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা মার্জনাকারী ও অতিশয় দয়াবান। আর তারা যদি তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা সব শোনেন ও সব জানেন"[৩০৩]।

উক্ত আয়াতে ঈলা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

ঈলা:

"কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ[৩০৪] ছাড়াই স্ত্রীকে শুধু শাস্তি ও যাতনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করা থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে ঈলা। এর জন্যে ইসলামী শরী'আত সর্বোচ্চ চার মাসের সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে। স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে এ সময়ের মধ্যে সে তার স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে নেবে। অন্যথায় সময় সীমা অতিক্রান্ত হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে"[৩০৫]।

---

[৩০২] মুহাসিনুত তা'বিল খ.৩, পৃ. ৫৮০।

[৩০৩] আল কুরআন, সুরা বাক্বারা ২ : ২২৬-২২৭।

[৩০৪] ন্যায় সঙ্গত কারণ হল: স্বামী অথবা স্ত্রী রোগাক্রান্ত হওয়া অথবা স্বামীর সফরে থাকা অথবা এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া যে, স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে কিন্তু তার কাছে যাওয়ার সুযোগ হচ্ছেনা।

[৩০৫] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রা.), স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী ২৫-শিরিস দাস লেন, বাংলা বাজার), পৃ.-৩২।

ঈলার ব্যাপারে ইসলামী শরী'আতের সরাসরি দৃষ্টি ভঙ্গি হল:

"কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করা, স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকা।"

অর্থাৎ- "যারা স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করার কসম করে তাদের জন্যে চার মাসের অবসর। এই চার মাস অতিবাহিত হবার পর হয় সে হয়ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তাকে ফিরিয়ে নেবে। আর না হয় তালাক দিয়ে তাকে চিরতরে বিদায় করে দেবে[৩০৬]।

আল্লামা শাওকানী আরও লিখেছেন যে,

"আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর ক্ষতি হয় এমন কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা এক বছর, দুই বছর কি ততোধিক কালের জন্য ঈলা করত আর তাদের উদ্দেশ্য হত স্ত্রীলোককে ক্ষতিগ্রস্থ করা। এসব ক্ষতি -লোকসানের পথ বন্ধ করার এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ জাগ্রত করানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের কথাগুলো বলে দিয়েছেন"[৩০৭]।

অতএব স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অন্যতম হক বা অধিকার হল- স্বামী স্ত্রীর বিপদাপদে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেবে। ইচ্ছা করে স্ত্রীর যৌন দাবীকে প্রত্যাখ্যান করা যাবেনা। স্ত্রীর মন মানুষিকতা অনুযায়ী কথা বার্তা আচার ব্যবহার করতে হবে। সঙ্গত কারণ ছাড়া চার মাসের অধিক সময় সফরে বা স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবেনা। এর বিপরীতে স্ত্রী ইসলামী শরী'আত নির্দেশিত আইনের আশ্রয় নিতে পারবে।

স্ত্রীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলবেনা:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানবজীবনের খুঁটি-নাটি সকল বিষয়ের সঠিক নির্দেশনাই হল ইসলাম। পরিবার ও দাম্পত্য জীবন ইসলামী আদর্শ নীতির অন্যতম স্তম্ভ। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক স্পন্দনের উপর নির্ভরশীল হল পরিবারের সুখ-শান্তি। এক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক তার অর্ধাঙ্গিনীকে কোন প্রকার দুর্বলতার ফাঁদে ফেলা যাবেনা। এমনকি কোন দীর্ঘ সফর শেষে হঠাৎ গন্তব্যে যেন না ফিরে। এক্ষেত্রে স্বভাব ও বাস্তব ধর্ম ইসলাম সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণের

---

[৩০৬] আল্লামা শাওকানী তাফসীর ফতহুল কাদীর, খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭, মুহাসিনুত্ তা'বিল খ.৩, পৃ. ৫৮০।

[৩০৭] ফতহুল কাদীর, খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ রাতের বেলায় গৃহে স্বামীর উপস্থিতি স্ত্রীর জন্যে বিব্রত বোধ বা পীড়াদায়ক হতে পারে। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) ইরশাদ করেন:

"তোমাদের কেউ যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাড়ীতে অনুপুস্থিত থাকার পর ফিরে আসে, তাহলে পূর্বে খবর না দিয়ে রাতের বেলায় হঠাৎ করে বাড়িতে পৌছে যাওয়া উচিত নয়"[৩০৮]।

হযরত জাবির (রা.) বলেন: আমরা এক যুদ্ধে রাসূল (স.) এর সঙ্গে ছিলাম। পরে যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে চলে যেতে ইচ্ছা করলাম। কিন্তু নবী করীম (স.) বললেন:

"কিছুটা অবসর দাও। রাতে ঘরে ফিরে যেতে পারবে। এই অবসরে তোমাদের স্ত্রীরা প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জা করে নেবে। গোপন অঙ্গ পরিচ্ছন্ন করবে এবং তোমাদের গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে"[৩০৯]।

উপরোক্ত দুটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দীর্ঘকালীন সফর শেষে স্ত্রীর কাছে যেতে হলে পূর্বে তাকে জানাতে হবে অর্থাৎ অবকাশ দিতে হবে। কারণ স্ত্রী শারীরিক ও মানুষিকভাবে অপ্রস্তুত থাকতে পারে। শারীরিক হল গোসল করা, স্বাভাবিক নাপাকী থাকলে তা ধৌত করে নেয়া, দাঁত ব্রাস সহ গুপ্তাঙ্গ পরিস্কার করে নেয়ার অবকাশ। আর মানুষিক হল তার প্রাণ প্রিয় জীবন সঙ্গীকে বরণ করে নেয়ার জন্য কিছুটা সাজ-সজ্জা, সুন্দর ও ভাল বস্ত্র পরিধান, নক কাটা, চুল আচড়ানো, সুগন্ধি লাগানো ইত্যাদি কারণে মানুষিক প্রফুল্লতা বয়ে আনে। বস্তুত স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য স্ত্রীর সাজ-সজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার মহানবীর (স.) সুন্নাত ও বটে।

একবার হযরত 'আ'ইশা (রা.) উসমান ইব্‌ন মাযউনের (রা.) স্ত্রীকে দেখলেন তার শরীরে সাজ - গোজ ও সৌন্দর্য চর্চার কোন চিহ্ন নেই। অথচ তখনকার দিনে স্বামীর অনুপুস্থিতে মেয়েরা সাধারণত সাজ-সজ্জা করতো। এ অবস্থা দেখে হযরত 'আ'ইশা (রা.) তখনই তাকে জিজ্ঞেস করলেন: উসমান কি কোথাও সফরে গিয়েছে?[৩১০]

শুধু স্ত্রী স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য সুগন্ধি বা সাজ-সজ্জা করবে তা নয়, স্বামীকেও স্ত্রীকে আকৃষ্ট করার জন্য সাজ-সজ্জা করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত হাদীসে খিযাব তথা সাজ-সজ্জা না করার

---

[৩০৮] বুখারী কিতাবুন নিকাহ্, অনুচ্ছেদ: তালাবুল ওয়ালাদ; মুসলিম: কিতাবুর রাহা, অনুচ্ছেদ: ইস্তিহবাবু নিকাহিল বিকরে।

[৩০৯] বুখারী কিতাবুন্ নিকাহ। অনুচ্ছেদ: আল মাদায়াতু মা' আন নিসা, মুসলিম কিতাবুর রাদা, বাবুল ও সিয়াতুবিন নিসা, তিরমিযী-আল ওয়াবুত তালাক, ভাষা মুসলিমের।

[৩১০] মুসনাদ আহমদ, খ.৬, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬।

কারণে আশ্চার্যন্বিত হয়ে হযরত ‘‘আ’ইশা’ তাকে জিজ্ঞেস করা থেকে প্রকাশ পায় যে, যে সব মেয়েদের স্বামী বর্তমান, স্বামীর জন্য তাদের সাজ-সজ্জা ও রুপ চর্চা করা অতি পছন্দনীয় ব্যাপার[৩১১]।

পুরুষের ক্ষমতা :

মোহরানা ও যাবতীয় ভরন-পোষণের বিনিময়ে স্বামী দুটি ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে।

এক. শাসন

দুই. তালাক

স্ত্রীদের উপর পুরুষদের এধরণের প্রধান্য রয়েছে[৩১২]। ইসলামী আইন পুরুষকে কর্তা বা পরিচালক বানিয়েছে, এটি নারী -পুরুষের সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত প্রবনতাও বটে। এ ক্ষমতা ও কতৃত্ব পারিবারিক শৃংখলা বজায় রাখতে, পরিবারের সদস্যদের চারিত্রিক সংশোধন, সামাজিকতার সংরক্ষণ এবং নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে ইসলাম স্বামীর উপর থাকাটাই কামনা করে। তবে ইসলাম স্বামীর কতৃত্বেরও সীমা নির্ধারণ করে দেয়।

১. শাসন :

“স্ত্রী যদি তার স্বামীর আনুগত্য না করে অথবা অধিকার খর্ব করে, এমোতাবস্থায় স্বামীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাকে উপদেশ দেয়া। সে তা অমান্য করলে স্বামী তার ব্যবহারের প্রয়োগফল অনুযায়ী কঠোরতা অবলম্বন করবে। এর পরও যদি সে তা মান্য না করে তাহলে তাকে মারধোরও করতে পারবে”[৩১৩]। (তবে এর মাত্রা জখম পর্যায়ে হবেনা এবং মুখমন্ডলেও মারা যাবেনা)।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

“আর তোমরা যে সমস্ত নারীর অবাধ্য হওয়ার আশংকা করবে, তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা কর, বিছানায় তাদের থেকে দূরে থাকো এবং প্রহার কর। অত:পর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার অযুহাত তালাশ করোনা”[৩১৪]।

---

[৩১১] নায়নুল আওতার, খ.৬, পৃ.৩৪৪।

[৩১২] আল কুরআন সুরা নিসা ৪ : ১২৮।

[৩১৩] মাও. মওদূদী, অনুবাদ মুহাম্মদ মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

[৩১৪] আল কুরআন, সুরাঃ নিসা ৪ : ৩৪।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"যদি তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের কোন ন্যায় সঙ্গত আদেশের বিরূদ্ধাচারণ করে তাহলে তাদেরকে এরূপ মারধোর কর যেন তা অধিক যন্ত্রনাদায়ক না হয়। মুখমন্ডলে আঘাত করা যাবেনা এবং গালি গালাজ ও করা যাবেনা।"

বস্তুত এই শাস্তি মূলত সংশোধনের মানুষিকতায় একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের ভূমিকায় হতে হবে। আদর্শ ডাক্তার যেমন রুগীকে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয় বরং তার রোগ মুক্তিই আসল উদ্দেশ্য। স্বামীকে এক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত কতৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও অধিকার মনে করেই পালন করতে হবে। বুঝাতে হবে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী শব্দচয়নে, মনের ক্রোধের ভাষায় শালিনতাকে বর্জন করা সম্পূর্ণ হারাম।

রাসুল (স.) ইসলামী আইনের মূলনীতি সম্পর্কে বলেন যে :-

"কেউ যখন তোমাদের সাথে বাড়া বাড়ি করে তোমরাও তার সাথে অনুরূপ বাড়াবাড়ি কর"[৩১৫]।

এখানে ( ) দ্বারা অনুরূপ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ- যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, অপরাধের চেয়ে শাস্তির মাত্রা যেন বেশী না হয়। এমন অপরাধ, যদি তা উপদেশ দিয়েই সমাধা হয়ে যায় তবে তাই যথেষ্ঠ। আবার ২য় পর্যায়ে যদি কথা বার্তা বন্ধ রাখাই সমিচীন তাহলে সে ক্ষেত্রে কথা বার্তা বন্ধ রাখাই যথেষ্ট। যেখানে সহ অবস্থান বর্জন করাটাই উচিত সেক্ষেত্রে তাই যথেষ্ট মনে করতে হবে। যে ক্ষেত্রে বিছানা ত্যাগ করা যথেষ্ট সেখানে তাই করা। মৃদু প্রহার মূলত সর্বশেষ পর্যায়ের ব্যবস্থা। এটি মারাত্মক অসহনীয় অপরাধের জন্যেই দেয়া যেতে পারে, যে সকল অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল শাস্তি ঘোষণা করেছেন। তবে স্বামী যদি আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলের (স.) দেয়া সীমা লংঘন করে শাসন করতে যায় তাহলে স্ত্রী স্বামীর এ বাড়াবাড়ির জন্য তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে।

অতএব আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলের (স.) দেয়া নারী-পুরুষের স্বভাব বাস্তবতায় স্বামী হবে স্ত্রীর শাসনকর্তা। স্বামী-স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার, রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব যথাযথ ও সময়োচিত ভাবে পালন করতে বাধ্য থাকবে। স্বামীদেরকে এ কথা মানতে হবে যে, ইসলামী

---

[৩১৫] আল কুরআন, সুরা, বাকারা ২ : ১৯৪ ।

দাম্পত্য আইন স্বামীকে রাজার মর্যাদা দিয়েছে আবার স্ত্রীকে রাণীর মর্যাদা দিয়ে ভূষিত করেছেন। বস্তুত স্ত্রী সহধর্মিনী, অর্ধাঙ্গিনীই মাত্র কিন্তু দাসী নন।

২. তালাক :

ইসলামী দাম্পত্য আইনে স্বামী- স্ত্রী কাউকে জোর করে আইন মানাতে বাধ্য করা বা আইনের মধ্যে আবদ্ধরেখে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং স্বামী-স্ত্রীর সুখী সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা উদ্দেশ্য। ইসলাম স্ত্রীর উপর পুরুষকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তার দ্বিতীয় পর্যায় হল তালাক। যে স্ত্রীর সাথে একত্রে বসবাস করা সঙ্গত কারণে একবারেই অসম্ভব তাকে তালাক দিয়ে দেবে। এটি ইসলামের বৈধ অধিকার বা কাজগুলোর মধ্যে সর্ব নিম্ন পর্যায়ের। এ অধিকার শুধু স্বামীকেই দেয়া হয়েছে। যেহেতু স্বামী তার ধন মাল ব্যয় করেছে এবং স্ত্রীর যাবতীয় আর্থিক ও শারীরিক রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শপথ/চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ইসলামে তালাকের সুযোগ রাখা হয়েছে এজন্য যে, পারিবারিক জীবনের চুড়ান্ত বিপর্যয় থেকে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে বাঁচানোর জন্য।

"স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে ভাঙ্গন দেখা দেয়, পরস্পরে মিলে মিশে ঠিক স্বামী-স্ত্রী হিসাবে শান্তিপূর্ণ ও মাধুর্যমন্ডিত জীবন যাপন একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পারস্পরিক সম্পর্ক যখন হয়েপড়ে তিক্ত, বিষাক্ত। একজনের মনে যখন অপরজনের জন্যএমন ভাবে বিমুখ হয়ে যায় যে, তাদের শুভ মিলনের আর কোন আশাই থাকেনা, ঠিক তখনই এই চুড়ান্ত পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। এ হচ্ছে নিরুপায়ের উপায়।"

ফিক্হ বিদদের ভাষায়:

"তালাকের সৌন্দর্য হল কষ্টকর অশান্তি থেকে অব্যহতি লাভ।"

রাসূল (স.) ইরশাদ করেন"

"আল্লাহ তা'আলার কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণার ও ক্রোধের উদ্রেক কারী কাজ হচ্ছে তালাক।"

তিনি আরো বলেন: "বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিওনা, কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বাদ অন্বেষণকারী ও স্বাদ অন্বেষণকারিনীদের পছন্দ করেননা।"

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো, সেই ব্যক্তির সে গোনাহ, যে কোন নারীকে বিয়ে করে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার মোহরানা ও পরিশোধ করেনা"[৩১৬]।

যে সব সম্পর্ক পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনে সাহায্য করেনা ইসলাম একদিকে সে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার স্বাধীনতা দেয়। অপর দিকে যে সব সম্পর্ক পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনে সাহায্য করে তাকে দৃঢ়তর করার এবং যথা সাধ্য আঁকড়ে ধরার শিক্ষা দেয়"[৩১৭]।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"যে সব মহিলা অকারণে স্বামীর কাছে তালাক বা 'খোলা' প্রার্থনা করে তারাই মুনাফিক"[৩১৮]।

তিনি আরও ইরশাদ করেন:

"প্রকৃত কোন কারণ ছাড়া যে মহিলা তার স্বামীর কাছে তালাক চায় তার জন্য বেহেশতের সুগন্ধি পর্যন্ত হারাম"[৩১৯]।

ইসলাম যেহেতু অবৈধ সম্পর্কের নিন্দা করে তাই বৈধ সম্পর্কের সম্মান ও মর্যাদা দেয়াও তার কর্তব্য। এই তালাকের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা ও হারাম। যেমন নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন:

"যে ব্যক্তি কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কিংবা কোন দাসকে তার মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে সে আমার দলভূক্ত নয়"[৩২০]।

ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (র.) বলেন: "কেউ কারো স্ত্রীকে নিজে বিয়ে করার জন্য কিংবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য যদি তার স্বামীকে হত্যা আর এ ষড়যন্ত্রে উক্ত নারী অংশীদার থাক বা না থাক উভয় অবস্থায় ইসলামের নীতিমালার দাবী হলো ঐ ব্যক্তিকে উক্ত নারীর সাথে বিয়ে থেকে বঞ্চিত করতে হবে"[৩২১]।

---

[৩১৬] মুসতাদরিক হাকেম, খ.২, পৃ. ১৮২।

[৩১৭] সাইয়্যেদ জালালুদ্দিন উমরী, অনুবাদ মো: মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮।

[৩১৮] নাসায়ী, কিতাবুত্ তালাক, বাবু মা জয় ফিল খোলা।

[৩১৯] তিরমিযী, আবওয়াবুত তালাক লি'আন, বাবু মা জায়া ফিল মুখ তালিয়াত, ইব্‌ন মাজা- আবওয়াবুত তালাক, বাবু কারাহিয়াতুল খোলা লিল মারয়া।

[৩২০] আবু দাউদ, কিতাবুত্ তালাক, বাবু মান খাব্বাবা ইমরাআতান আল যাউজিহা।

[৩২১] ইকামাতীদ আলা ইহতালিত তাহলীল, আল মাতবু মা আল ফাতাওয়া পৃ. ১৪৭-১৪৮।

হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং আরো কিছু সংখ্যক সাহাবা ও তাবেয়ীর মতে শুধু যৌন অক্ষমতার কারণেই নয়, কুষ্ঠ, অন্ধত্ব এবং মানষিক রোগও এমন ত্রুটি হিসাবে গণ্য, যে কারণে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার রয়েছে"[৩২২]।

হানাফী মাজহাব মতে- স্বামীর যদি কুষ্ঠ বা অনুরূপ রোগ, জটিল ত্রুটি থাকে তাহলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করার অধিকার থাকবেনা। তবে স্বামী যদি কর্তিত লিংগ বা খাসি হয় তাহলে তার বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করার অধিকার থাকবে"[৩২৩]।

তালাকের পদ্ধতি :

পুরুষকে তালাকের স্বাধীনতা দেয়ার সাথে সাথে কতগুলো শর্তের অধীন করে দেয়া হয়েছে। বস্তুত এটি হল সর্বশেষ হাতিয়ার। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। তারা যদি তোমাদের মনের মত না হয়, তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন জিনিষকে অপছন্দ কর কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তার মধ্যে অপূরন্ত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন"[৩২৪]।

যদি মিলে মিশে নাই থাকতে পার তাহলে তোমার এই অধিকার আছে যে, তাকে তালাক দাও। কিন্তু এক কথায় বিদায় করা জায়েয নয়। এক এক মাসের ব্যবধানে এক এক তালাক দাও। তৃতীয় মাসের শেষ নাগাদ তুমি চিন্তা ভাবনার সুযোগ পাবে। হয়ত বা সমঝোতার ও কোন উপায় বেরিয়ে আসবে অথবা স্ত্রীর আচরণের মধ্যে পছন্দনীয় কোন পরিবর্তন এসে যেতে পারে, কিংবা স্বয়ং তোমার অন্তরও পাল্টে যেতে পারে। অবশ্য এ সময়-সুযোগের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা পড়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে যদি তোমার ত্যাগ করারই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে তৃতীয় মাসে শেষ তালাক দিয়ে দাও অথবা পূন: গ্রহণ না করে ইদ্দত অতিবাহিত হতে দাও।

সর্বোত্তম পন্থা এই যে, তৃতীয় বার তালাক না দিয়ে এমনিতে ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হতে দেয়া। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে পুণরায় বিয়ে হওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে।

---

[৩২২] আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, খ.৭, পৃ. ২১৪-২১৫।
[৩২৩] আল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আব্বায়া, খ.৪, পৃ. ১৮০-১৮৯।
[৩২৪] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ১৯।

কিন্তু তৃতীয়বার তালাক দিলে তা 'মুগাল্লাজা' বা চুড়ান্ত তালাকে পরিণত হয়। এর পর তাহলীল ব্যতীত প্রাক্তন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পূণরায় বিয়ে হতে পারেনা। বর্তমান সমাজে তালাক সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে যখন তালাক দিতে উদ্যত হয়, একত্রে তিন তালাক ছুঁড়ে মার। পরে আফসোস আর অনুতপ্ত হয়ে কৌশল অবলম্বন করে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"তালাক হচ্ছে দুই বার। অত:পর হয় উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে রাখতে হবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় করে দিতে হবে"[৩২৫]।

"যে সব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে তারা তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। তাদের স্বামীরা যদি পূণরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজী হয়, তাহলে তারা এ অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজেদের স্ত্রী রূপে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে[৩২৬]।

বস্তুত "তিন মাসের এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিওনা, বরং নিজের কাছেই রাখ। আশা করা যায় সহঅবস্থানের ফলে পূণরায় আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের কোন উপায় বেরিয়ে আসবে।"[৩২৭] উভয়ের মাঝে দোষ ত্রুটি সংশোধন বা অনুশোচনার ব্যবস্থা হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

"তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, তাদেরকে তাদের ইদ্দতের মধ্যে পূন: গ্রহণের সুযোগ রেখেই তালাক দাও। ইদ্দতের সময় গুনতে থাক এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। (ইদ্দত চলাকালে) তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিওনা এবং তারাও যেন বের হয়ে না যায়। তবে কেবল তখনি তা করতে পার যখন তারা প্রকাশ্যে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হয়।

এ হচ্ছে আল্লাহ নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করে সে নিজের উপর অত্যাচার করে (পক্ষান্তরে সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আফসোস করে)। তুমি জাননা, হয়ত বা এরপর আল্লাহ তা'আলা সমঝোতার কোন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। অত:পর যখন তারা ইদ্দতের

---

[৩২৫] আল কুরআন, সুরা বাকারা ২ : ২২৯।

[৩২৬] আল কুরআন, সুরা বাকারা ২ : ২২৮।

[৩২৭] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

নির্দিষ্ট সময়ের সমাপ্তিতে পৌছবে, তখন হয় তাদেরকে ভালভাবে ফিরিয়ে রাখ অথবা উত্তম পন্থায় তাদেরকে পৃথক করে দাও”[৩২৮]।

হযরত আলী (রা.) বলেন:

“মানুষ যদি যথার্থ সীমার দিকে লক্ষ্য রাখত, তাহলে কোন ব্যক্তিই নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতনা।”

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হল: এক ব্যক্তি একই সময়ে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, এর হুকুম কি? তিনি বললেন:

“সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ লংঘন করেছে এবং তার স্ত্রী তার থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

তালাকে মুগাল্লাজা সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার বাণী :

“অত:পর (দুই তালাক দেয়ার পর) স্বামী যদি স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে এ স্ত্রী লোকটি তার জন্য হালাল (পুণরায় বিবাহ যোগ্য) হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য পুরুষের তার সাথে বিয়ে না হবে এবং সে তাকে স্বেচ্ছায় তালাক না দেবে। (দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেয়ার পর) যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা বজায় রেখে জীবন যাপন করতে পারে তাহলে তাদের পুণ: বিবাহে কোন দোষ নেই”[৩২৯]।

তাহলীল বা বৈধ করার উদ্দেশ্যে কেবল বিয়েই যথেষ্ট নয়। যে পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার থেকে যৌন তৃপ্তি লাভ করবে, ততক্ষণ সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবেনা। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন:

“দ্বিতীয় স্বামী তার মধূ এবং সে এ দ্বিতীয় স্বামীর মধু (যৌন স্বাধ) পান না করা পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল (বিবাহ যোগ্য) হবেনা।”

যে ব্যক্তি তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে কেবল নিজের জন্যে হালাল করার উদ্দেশ্যে অন্যের সাথে বিয়ে দেয়, আর যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে বিয়ে করে, এদের উভয়কে রাসূল (স.) লানত করেছেন।

রাসূল (স.) ইরশাদ করেন :

“এরূপ ব্যক্তিকে তিনি ভাড়াটে ষাঁড়ের সাথে তুলনা করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের বিয়ে আর জ্বেনার মধ্যে পার্থক্য নেই।”

---

[৩২৮] আল কুরআন, সুরা তালাক ৬৫ : ০১।

[৩২৯] আল কুরআন, সুরা বাকারা ২ : ২৩০।

স্বামী যদি নপুংশক হয়, লিঙ্গ কর্তনকৃত। স্বীয় ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়, দু:চরিত্র, মারাত্মক নেশাগ্রস্থ, মানুষিক রোগী ও উম্মাদ হয়, তাহলে স্ত্রী ইসলামী দাম্পত্য আইনে স্বামীর কাছে অথবা উভয় পক্ষের অভিভাবকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু নিজ ইচ্ছায় তালাক নেয়া যাবেনা। এ ক্ষমতা ইসলাম শুধুমাত্র স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয় ভার বহনের চুক্তিতে স্বভাবজাত ভাবে স্বামীকে দান করেছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

"তোমরা স্ত্রীকে যা কিছু দিয়েছো তা থেকে সামান্য কিছুও ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। কিন্তু তারা উভয়ে যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা অটুট রাখতে পারবেনা (তবে এরূপ অবস্থা) বা আল্লাহ তা'আলার দেয়া সীমা রক্ষা করে জীবনযাপন করতে পারবেনা- এমোতাবস্থায় স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় প্রদান করে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় তাতে কোন দোষ নেই"[৩৩০]।

উপরোক্ত আয়াতে স্ত্রী স্বামীকে মোহরানার কিছু অংশ ফেরত দানে তালাকের আবেদন করতে পারবে। এ প্রসংগে বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রণিধানযোগ্য। এই আইনে বলা হয়েছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে নিষ্ঠুর আচরন করে তবে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের ডিগ্রী পাওয়ার দাবীদার/হকদার। সেই আইনের ধারা সমূহ নিন্মরুপ :

স্বামী স্ত্রীর সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করেন, যেমন-

(ক) স্বভাবতই তাহাকে আক্রমন করেন অথবা নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা তাহার জীবন দুর্দশাগ্রস্থ করিয়ে তোলেন। অনুরূপ আচরণ যদি দৈহিক নির্যাতনে হয় অথবা

(খ) কুখ্যাত নারীদের সংগে থাকেন বা ঘৃন্য জীবন যাপন করেন অথবা

(গ) তাহাকে নৈতিকতা বর্জিত জীবন-যাপনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন অথবা

(ঘ) তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করেন অথবা উহাতে তাহার আইন সঙ্গত অধিকার প্রয়োগে বাধা দান করেন অথবা

(ঙ) তাহার ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্ম চর্চায় তাহাকে বাধা দান করেন অথবা

---

[৩৩০] আল কুরআন, সুরা বাক্বারা ২ : ২২১।

(চ) তাহার একাধিক স্ত্রী থাকিলে যদি তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশানুসারে তাহার সহিত ন্যায় সঙ্গতভাবে ব্যবহার না করেন....."[৩৩১]।

বাংলাদশের Muslim Marrige Disslution Act of Muslim Family Law ordinance নারীদের প্রচলিত অধিকারকে ইসলাম যথাযথ ভাবে প্রদান করেছে।

অতএব যে সঙ্গত কারণে পুরুষ-স্ত্রীর ব্যাপারে অনোন্যপায় হয়ে সর্বশেষ উপায় হিসাবে তালাকের পথ বেছে নিতে পারেন। সেই সকল কারণে স্ত্রী ও তালাকের আবেদন করতে পারেন। তবে পার্থক্য হল স্বামীর এটি শারী'আত প্রদত্ত স্বভাবিক শর্তযুক্ত ক্ষমতা। কিন্তু নারীর জন্য সেটা নয় সে তালাকের আবেদন করতে পারবে তার স্বামী, রাষ্ট্রীয় আইন, দুপক্ষের অভিভাবকের নিকট। স্বামীকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এ কারণে যে, সে স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের শর্তযুক্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছে। ইসলামী দাম্পত্য আইন তালাককে উৎসাহিত করেনি বরং বরাবর নিরুৎসাহিত করেছে। ইসলামে যাবতীয় হালাল কাজ সমূহের মধ্যে তালাক হলো সবচেয়ে ঘৃনীত পর্যায়ের হালাল কাজ। বস্তুত ইসলাম ভাঙ্গণের পক্ষে মত দেয়না বরং গড়তে চায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কল্যাণ এবং পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং মহাবিপর্যয়কে ঠেকানোর জন্যেই শর্ত ও সঙ্গত কারণ যথাযথ পরিস্থিতিতে তালাকের অনুমোদন দেয়। বর্তমান বিশ্বে তালাকের অনুসরন হচ্ছে কিন্ত কি কারণে তালাক নূন্যতম বৈধ, কি পদ্ধতিতে তালাক প্রয়োগ করতে হবে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নীছক অজ্ঞতাই আজ মুসলিম তালাক পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। ইসলাম ও ইসলামের পারিবারিক আইন সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি অপরিহার্য্য। মানুষের জীবনের জন্য ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং আধুনিক বিশ্বের জন্য একটি মডেল।

স্ত্রীর কর্তব্য বা স্বামীর অধিকার ঃ

ইসলামী দাম্পত্য আইনে কাউকে একক কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে, অপর পক্ষের উপর যা ইচ্ছা তাই চাপিয়ে দেবে বা শাসন করবে। এখানে উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও আবেদনের উপর পরিবারের শান্তি-শৃংখলা ও স্থায়িত্ব

---

[৩৩১] গাজী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

নির্ভরশীল। পরিবারের কর্তা হওয়ার কারণে পুরুষের ও কয়েকটি হক বা অধিকার রয়েছে। হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি :

"একজন মানুষের জন্য আরেক জন মানুষকে সিজদা করা যদি জায়েয হতো তবে আমি স্বামীদেরকে সিজদা করার জন্য নারীদের নির্দেশ দিতাম"[৩৩২]।

স্ত্রীর উপর স্বামীর কয়েকটি মৌলিক অধিকার রয়েছে :

১.গোপন বিষয় সমূহের হিফাযত করা : স্ত্রীর উপর স্বামীর মৌলিক অধিকারের অন্যতম হল, স্বামীর গোপন বিষয় সমূহের হিফাজত/সংরক্ষণ করা। স্বামীর অমর্যাদাকর এমন সকল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। স্বামীর অনুপুস্থিতে নিজকে পূর্ণ সংবরণ করে রাখবে।

আল্লাহ তাআলার বাণী :

"সুতরাং সতী নারীরা তাদের স্বামীদের অনুরক্ত হয়ে থাকে এবং তাদের অবর্তমানে আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহে তার যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণকারি হয়ে থাকে"[৩৩৩]।

আলোচ্য আয়াতে স্বামীর অনুপুস্থিতে তার সকল কিছু পূর্ণ আমানাতদারের ভূমিকায় সংরক্ষণ করা বুঝানোই উদ্দেশ্য। তার বংশের হেফাজত, তার মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ইত্যাদি সহ যাবতীয় অধিকারের সংরক্ষণ।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, যে স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ল, রমযানে রোযা রাখল, লজ্জাস্থানের হিফাযত করল, স্বামীর আনুগত্য করল, সে নিজের ইচ্ছাকৃত যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে[৩৩৪]।

বস্তুত উপরোক্ত মৌলিক দায়িত্ব পালনে স্ত্রী ব্যর্থ হলে স্বামী তার বিরুদ্ধে আল্লাহতা'আলার প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেত পারবে।

"সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন কুরআনের এই আয়াত নাজিল হয় তখন আমরা রাসূল (স.) এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ কেউ বলল, সোনা-রুপা জমা করার বিষয়ে এই আয়াত নাযিল হয়েছে (মনে হচ্ছে সোনা-রুপা জমা করা উত্তম নয়) আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম তাহলে ঐ সম্পদই আমরা সংগ্রহ করতাম।

---

[৩৩২] মিহাজুল কাসেদীন।

[৩৩৩] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ৩৪।

[৩৩৪] মিশকাতুল মাসাবিহ, স্বামী- স্ত্রীর অধিকার অধ্যায়, রাহে আমল স্বামীর অধিকার অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

(একথা শুনে) রাসূল (স.) বললেন: সর্বোত্তম সম্পদ হল আল্লাহতা'আলাকে স্মরণ কারী জিহবা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও মুমিনা স্ত্রী। যে আল্লাহতা'আলার পথে স্বামীকে সাহায্য করে"[৩৩৫]।

নবী করীম (স) ইরশাদ করেন:

"তাদের ওপর তোমাদের এ অধিকার রয়েছে যে তারা এমন কোন ব্যক্তিকে তোমাদের ঘরে আসতে দেবেনা যাকে তোমরা আদো পছন্দ করনা।"

অতএব স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল, স্বামীর যাবতীয় গোপনীয়তাকে হেফাযত করবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মান ও মর্যাদার সংরক্ষণ করার ভূমিকা পালন করবে।

২.স্বামীর আনুগত্য :

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দ্বিতীয় অধিকার হচ্ছে- স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে। কুরআন মজীদের নির্দেশ হল, "যারা নেক, সৎ ও চরিত্রবান স্ত্রী তারা আনুগত্যশীলা হয়ে থাকে"[৩৩৬]।

একথার ব্যাখ্যায় মহানবী (স.) ইরশাদ করেন,

"স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার ঘরের কোন বস্তু সে দান খয়রাত করবেনা। সে যদি এরূপ করে তাহলে এর সওয়াব স্বামীই পাবে। কিন্তু স্ত্রী পাপী হিসাবে গণ্য হবে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী বাড়ীর বাইরেও যাবেনা।"

রাসূল (স.) বলেন:

"সর্বোত্তম স্ত্রী হচ্ছে, যখন তুমি তাকে দেখে তোমার অন্তর আনন্দিত হয়। যখন তুমি তাকে কোন কিছু আদেশ কর, সে তা পালন করে এবং যখন তুমি অনুপুস্থিত থাক, সে তোমার ধন সম্পদ ও তার উপর তোমার যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করে।"

তবে যদি স্বামী শরী'আত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ দেয় তা মানা যাবেনা। যেমন মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"স্রষ্টার নাফরমানীমূলক কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা। অতএব ফরয, ওয়াজিব, পর্দা লংঘন সহ শরী'আত বিরোধী কাজে স্বামীর আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করাই তখন ফরয।"

---

[৩৩৫] তিরমিযী শরীফ, অনুবাদ এ, বি, এম, আব্দুল খালে মজুমদার, রাহে আমল, স্বামীর অধিকার অধ্যায়, পৃ. ১৩৮।

[৩৩৬] আল কুরআন সূরা নিসা ৪ : ৩৪।

রাসূল (স.) ইরশাদ করেন : শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে আদেশগত কোন কাজে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য, কোন স্ত্রী ঈমানের স্বাদ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারবেনা, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করবে"[৩৩৭]।

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স.) এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আসার জন্য আহবান জানায় তখন যদি সে আসতে অস্বীকার করে, তাহলে ফেরেস্তাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে[৩৩৮]।

"হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত : রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, তিনজন লোকের নামায কবুল হয়না ও কোন নেক আমল উর্ধ্বলোকে উত্থিত হয়না। তারা হল পলাতক ক্রীতদাস- যতক্ষণ না সে ফিরে না আসে, নেশাপানে অস্থির মস্তিস্ক যতক্ষণ না সে পূর্ণ সুস্থতা পায় এবং সেই স্ত্রীলোক যার স্বামী তার প্রতি ক্ষুব্দ অসন্তুষ্ট- যতক্ষণ না সে স্বামী সন্তুষ্ট হয়"[৩৩৯]।

অপর হাদীসে রাসূল (স.) বলেনঃ

"সে তার স্বামীকে তার ইচ্ছা পূরণ হতে বিরত রাখবেনা যদি তার চুলায় রান্না কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়ও হয়"[৩৪০]।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) ইরশাদ করেন : স্ত্রী যদি স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে যতক্ষন না সে ফিরে আসে"[৩৪১]।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, স্বামীর নিকটে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর রোযা রাখা জায়েয নয়। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে স্ত্রী কাউকেও প্রবেশ করার অনুমতি দেবেনা। অনুমতি দেয়া তার জন্য জায়েয নয়। আর স্বামীর নির্দেশ ছাড়া স্ত্রী যা কিছু ব্যয় করবে তার অর্ধেক স্বামীর প্রতি প্রর্ত্যাবর্তিত হবে[৩৪২]।

---

[৩৩৭] মিফতাহুল খুতাবিয়াহ, পৃ.১৮৫।

[৩৩৮] বুখারী শরীফ, বাবে হুকুকুজ জাওয, মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীছ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

[৩৩৯] ইব্‌ন খাযিমা, ইব্‌ন হাববান , মাও. আ. রহিম, হাদীছ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭২।

[৩৪০] তিবরানী, মাও. আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

[৩৪১] বুখারী শরীফ, কিতাব ফি হুকুকুজ যাওজ।

[৩৪২] ইব্‌ন মাযাহ, মাও. আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২১১ ।

এই হাদীসে তিনটি বিধানের কথা বলা হয়েছে , প্রথমত: স্বামীর নিকট উপস্থিত থাকার সময় তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখতে পারবেনা। রাখলে তার জন্য হালাল হবেনা। এখানে রোযা বলতে নফল রোযা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত: স্বামী উপস্থিত থাকার সময় যে কোন সময় সঙ্গমের জন্য আহবান করতে পারে, তাহলে তার এ আহবানে সাড়া দিতে হবে। তবে স্ত্রীর অসুস্থ্য অবস্থায় এ আদেশ কার্যকর হবেনা।

তৃতীয়ত: স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাকেও তার ঘরে আসার অনুমতি দেবেনা। কোন পুরুষকে তো নয়ই এমনকি তার স্বামী যে মেয়েলোককে অপছন্দ করে তাকেও আসতে দেয়া যাবেনা, পুরুষ বলতে এখানে যাদের সাথে দেখা দেয়া হারাম তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া কোন কারণে স্বামী যাকে অপছন্দ করে তাকেও।

স্বামীর ন্যায় সঙ্গত আনুগত্য করা ইসলামী দাম্পত্য আইনে স্ত্রীর জন্য একটি মর্যাদার বিষয়ও। যেমন রাসূল (স.) ইরশাদ করেন :

"মুসলিমদের জন্যে তাকওয়ার পর সবচেয়ে উত্তম জিনিষ হচ্ছে নেক্কার স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মেনে চলে, স্বামী কোন বিষয়ে কসম দিলে তা সে পূরণ করে। আর স্বামীর অনুপুস্থিতে তার নিজেরও স্বামীর ধনমালে স্বামীর কল্যাণকামী হবে"[৩৪৩]।

অতএব, " আল্লাহতা'আলার ভয় ও তাকওয়ার পর সব মুসলিম পুরুষের জন্যেই সর্বোত্তম সৌভাগ্যের সম্পদ হচ্ছে- সতী-সাধবী, সুদর্শনা ও আনুগত্যশীলা স্ত্রীলোক। প্রিয়তম স্বামীর সে একান্ত প্রিয়তমা, স্বামীর প্রতিটি কথায় সে উৎসর্গকৃতা, সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে সে অতন্দ্র প্রহরী, আর এ রকম স্ত্রী যেমন একজন স্বামীর পক্ষে গৌরব ও মহত্বের ব্যাপার তেমনি এ ধরণের স্ত্রী ও অত্যন্ত ভাগ্যবতী"[৩৪৪]।

রাসূল (স.) কে একদা উত্তম স্ত্রীর গুন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি ইরশাদ করেন :

"সে হচ্ছে সেই স্ত্রী লোক যাকে স্বামী দেখে সন্তুষ্ট হবে, যে স্বামীর আনুগত্য করবে এবং তার নিজের স্বামীর ধনমালে স্বামীর মতের বিরোধিতা করবেনা এমন কাজ করবেনা যা সে পছন্দ করেনা"[৩৪৫]।

---

[৩৪৩] ইব্‌ন মাযাহ, মাও. আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১১।

[৩৪৪] মাও. আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

[৩৪৫] ইব্‌ন মাযাহ।

রাসূল (স.) আরো ইরশাদ করেন,

"যার মুষ্ঠিমে মোহাম্মাদের প্রাণ-জীবন, তার শপথ, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামীর হক আদায় করবেনা ততক্ষণ সে আল্লাহতা'আলার হকও আদায় করতে পারবেনা। স্বামী যদি স্ত্রীকে পেতে চায়- যখন সে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে, তবে তখনো সে স্ত্রীলোক নিষেধ করতে পারবেনা"[৩৪৬]।

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, স্বামী স্ত্রীর কাছে থেকে আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য, এ অধিকার ইসলামী দাম্পত্য আইন স্বামীকে প্রদান করেছে। যা স্বামীর অনেক কিছুর বিনিময়ে প্রাপ্ত অধিকার। এই আনুগত্যের মাপ কাঠি হল: আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্যের পরিপন্থী হবেনা। ফরয ওয়াজিব ও পর্দা লংঘন এবং ইসলামী শরীয়াত বিরোধী অপর কোন কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবেনা। শুধু উভয়ের পারস্পরিক ও পরিবার কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত সকল কাজে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য। স্বামীর পারিবারিক মৌলিক দায়িত্ব পালনে বাধা আসতে পারে এমন কোন নফল নামায ও রোযা তারই অনুমতি ছাড়া পালন করা যাবেনা। বস্তুত ইসলামী দাম্পত্য আইনে পরিবার একটি অপরিহার্য বিষয় যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে একটি সভ্যতা বা জাতি। সুতরাং এ মহান দায়িত্ব পালনে একজনের নেতৃত্ব- আনুগত্যের মধ্য থেকে কাজ করা অধিক যুক্তি যুক্ত। বস্তুত বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হল : স্বাভাবিক যৌন উন্মাদনাকে সুশৃংখল ও পূত পবিত্র ধারায় প্রবাহিত করা ও পাস্পরিক পবিত্র বন্ধন। বিশ্ব বাসীর জন্য সৎযোগ্য ও আদর্শ নাগরীক তৈরী করা বা বংশ বিস্তার। যার কারণে একাধিক হাদীসে স্বামীর যৌন দাবী অধিকারের ক্ষেত্রে স্ত্রীর নির্ভেজাল আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"ইমাম নববী এ ক্ষেত্রে বলেন যে, শরী'আত সম্মত ওযর বা কারণ ছাড়া স্বামীর শয্যা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর জন্য হারাম"[৩৪৭]।

আবার স্ত্রীর শরী'আত সম্মত ওজর থাকলে এ কাজ থেকে বিরত থাকা যাবে। ফিক্হ বিদগণ এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে,

"অধিক মাত্রায় যৌন সঙ্গম যদি স্ত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর হয় তবে তার সামর্থের বেশী যৌন সঙ্গম করা জায়েয নয়"[৩৪৮]।

---

[৩৪৬] ইবুন মাযাহ।

[৩৪৭] শরহে মুসলিম, খ.১, পৃ. ৪৬৪।

[৩৪৮] দুররুল মুখতার, বাবিল কসম।

অতএব স্বামী নারীর - স্ত্রীর স্বভাবজাত ও শরী'আত প্রদত্ত শাসন কর্তা হওয়ার কারণে ইসলামী শরী'আতের যাবতীয় ফরয-ওয়াজীব এবং সষ্টার সীমা লংঘন মূলক কাজ ব্যতীত অন্যান্য কাজে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর উপর অবশ্যই কর্তব্য। আর স্বামীকে মনে করতে হবে যে, তিনি স্ত্রীর যাবতীয় দায় দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করার নিশ্চয়তা দিয়ে আল্লাহতা'আলার নামে স্ত্রীর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। তিনি প্রভু নন আর স্ত্রী ও তার দাসী নন। প্রত্যেকটি ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দন্ডায়মান হতে হবে। উভয়ের যৌক্তিক বা সম্মিলিত আয়োজনেই একটি পরিবারের চিরস্থায়ী শান্তি আসা সম্ভব।

৩. স্ত্রী ঘরের রাণীর ভূমিকা পালন করবেঃ

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মৌলিক পার্থক্য হল চিন্তা, কর্ম শক্তির এবং দৌহিক দুর্বলতা। নারীদের সম্পর্কে রাসূল (স.) ইরশাদ করেন :

"এখানে (আকল) শব্দটি দ্বারা চিন্তা শক্তি আর 'দ্বীন' শব্দ দ্বারা দৈহিক শক্তি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ- উভয় ক্ষেত্রে সে পুরুষের তুলনায় দুর্বল ও অপুর্ণাঙ্গ"[৩৪৯]।

" (যোগ্যতার দিক দিয়ে) পুরুষ নারী অপেক্ষায় উত্তম"[৩৫০]।

ইসলামী দাম্পত্য আইনে পুরুষ ও নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও দৈহিক স্বভাবজাত পার্থক্যের কারণে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর কর্ম নীতি যথাযথ ভাবে গৃহীত হয়েছে। পুরুষ আয় রোযগার করবে, পরিশ্রম ও যাবতীয় অর্থনৈতিক উপার্যনের পরিচালক আর স্ত্রী ঘরের রানী। পুরুষের জন্য কর্মক্ষেত্র বাইরের জগত আর নারীর জন্য অভ্যন্তরীন জগত। পুরুষ অর্থ উপার্যন করবে, সমাজ রাষ্ট্র ও শিল্প সভ্যতা গড়ে তুলবে, নারী সেই সভ্যতার জন্য উপযুক্ত মানুষ গড়ে তুলবে।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"এবং নারী-স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণাবেক্ষণ-কারিনী, কর্ত্রী" [৩৫১]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন :

---

[৩৪৯] বুখারী, কিতাবুল হায়েয, অনুচ্ছেদঃ তারকুল হাযেযিস সাওমা।

[৩৫০] ফাতহুল কাদীর, খ.৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬।

[৩৫১] বুখারী, বাবুল হকুকুল জাওয।

"রাযা- হচ্ছে হেফাযতকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আমানতদার, দায়িত্বের অধীন সব জিনিসের কল্যাণ সাধনের জন্যে একান্ত বাধ্য। যে কোন ব্যক্তির দায়িত্বেই যে কোন জিনিষ দেয়া হবে, এমন প্রত্যেকেরই তেমন প্রত্যেকটি জিনিসে সুবিচার ও ইনসাফ করা এবং তার দ্বীনী ও দুনিয়ার কল্যাণ সাধন করাই বিশেষ লক্ষ্য। এখন যার উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে যদি তা পুরোপুরি পালন করে, তবে সে পর্ণ অংশই লাভ করল, অধিকারী হল বিরাট পুরস্কার লাভের। আর যদি তা না হয়, তবে দায়িত্বে প্রত্যেকটি জিনিসই তার অধিকার দাবী করবে। আর স্ত্রী স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা হওয়ার অর্থ- স্বামীর ঘরের সুন্দর ও পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করা, স্বামীর কল্যাণ কামনা ও তাকে ভাল কাজের পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া এবং স্বামীর ধন মালে নিজের পর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বাস পরায়ণতা রক্ষা করাই স্ত্রীর কর্তব্য[৩৫২]।

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীদের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (রা.) বলেন:

"দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও মিলনই হচ্ছে পারিবারিক জীবনের বৃহত্তম সম্পর্ক। এ সম্পর্কে উপকারিতা সর্বাধিক। প্রয়োজন পূরণের দৃষ্টিতে তা অধিকতর স্বয়ং সম্পূর্ণ। কেননা আরব অনারব সকল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে স্থায়ী নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী সকল কল্যাণময় কাজে-কর্মে স্বামীর সাহায্যকারী হবে, তার খানা-পিনা প্রস্তুতকরণ ও কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখার ব্যাপারে সে হবে স্বামীর ডান হাত তার মাল-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার সন্তানের লালন পালন করবে এবং তার অনুপুস্থিতে সে তার ঘরের স্থলাভিষিক্ত ও দায়িত্বশীল"[৩৫৩]।

তবে এক্ষত্রে একে অপরের পরিপূরক। শুধু দাসীর মত কাজ করতে বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে তত্বাবধায়ক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী।

পবিত্র কুরআনের বাণী হল:

"স্ত্রীদের সেই সব অধিকারই রয়েছে স্বামীদের উপর, যা স্বামীদের রয়েছে স্ত্রীদের উপর।"

---

[৩৫২] উমদাতুল কারী, খ.৬, পৃ. ১৯০।

[৩৫৩] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ.২, বাবুল হকুকুয্ জাওযিয়াহ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও আবু বকর ইবনে শায়বা ও আবু ইসহাক জাওজানীর মতে স্বামী যেমন স্ত্রীর জন্যে প্রাণপত করে, স্ত্রীর ও কর্তব্য স্বামীর জন্য কষ্ট স্বীকার করা। তারা যুক্তির স্বপক্ষে রাসুলের (স.) পবিত্র বাণীর উল্লেখ করেন :

"নবী করীম (স.) তাঁর কন্যা ফাতিমার উপর তাঁর ঘরের মধ্যকার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন এবং হযরত আলীর উপর দিয়েছেন ঘরের বাইরের কাজের দায়িত্ব"[৩৫৪]।

হযরত আসমা (রা.) তার স্বামীর সব রকমের খেদমত করতেন। তিনি নিজেই বলেন:

"আমি আমার স্বামী জুবাইরের (রা.) সব রকমের খেদমত করতাম।"

"রাসূল তনয়া ফাতিমা (রা.) ঘরের যাবতীয় কাজ করতেন, চাক্কি বা যাঁতণ চালিয়ে গম পিষতেন, নিজ হাতে রুটি বানাতেন। এ কাজে তার খুব কষ্ট হত। এজন্য একদিন তিনি তাঁর স্নেহময়ী পিতার কছে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হন।"

বস্তুত স্ত্রীকে নিজ হাতে ঘরের সব কাজ করতে হবে এমন নয় বরং তিনি ঘরের তত্ত্বাবধায়ক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে সন্তান লালন-পালন সহ গৃহের যাবতীয় কাজ কর্ম দেখা শুনা করবেন। শারীরিক ও অর্থনৈতিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আধুনিক বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় নারীরা শুধু ঘরের কাজ নয় বাইরের সমাজ গঠনমূলক অনেক কাজেই পুরুষকে সহযোগিতা করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শরী'আতের সীমারেখা অনুসরণ।

নারীদের কর্ম তৎপরতা বা ইসলামী সমাজে নারীদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে রাসূল (স.) এর পবিত্র স্ত্রীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে:

"তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মত সেজেগুজে রূপ প্রকাশ করে বেড়াবেনা"[৩৫৫]।

বস্তুত এই আহবান শুধু নবীর (স.) স্ত্রীদের জন্য নয়, বরং যারা রাসূল (স.) কে একমাত্র আদর্শ নেতা-নবী হিসাবে গ্রহণে অবিচল সেই সকল দৃঢ় প্রত্যয়শীলা নারীদের জন্য।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু বকর জাস্সাস লিখেছেন:

"এ আয়াতটি এ বিষয়ের দলীল যে, নারীকে তার গৃহের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে"[৩৫৬]।

---

[৩৫৪] আলছু যানী, মুহাসিনুত্ তা'বিল, খ.৩, পৃ. ৫৮৫।
[৩৫৫] আল কুরআন, সুরা আহযাব ৩৩ : ৩৩।

নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন,

"গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠ হল নারীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ"[৩৫৭]।

বিখ্যাত সাহবা আবু ফাতিমা সায়েদীর স্ত্রী নবীর (স.) খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.), আমি আপনার সাথে মসজিদে নামায পড়তে চাই। এতে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন: আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি সত্যি তা চাও। কিন্তু জেনে রাখ, তোমার কোন ছোট কামরায় নামায পড়া তোমার জন্য প্রশস্থ কামরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। কামরার মধ্যে পড়া বাড়ির মধ্যে পড়া থেকে উত্তম, এবং মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে বাড়ির মধ্যে অবস্থান করে পড়া উত্তম। অনুরূপ তোমার মহল্লাহ মসজিদে নামায আমার এই মসজিদে পড়া নামাযের চেয়ে উত্তম। হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, আবু ফাতিমা সায়েদীর স্ত্রীর ওপর নবীর (স.) এ বাণীর এতটা প্রভাব পড়ল যে, তিনি ঘরের নিভৃত অংশে তার নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন এবং সারা জীবন সেখানেই নামায পড়ছিলেন"[৩৫৮]।

"তারেক ইবনে শিহাব নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ক্রীতদাস, নারী, শিশু এবং রোগী এই চার প্রকার লোক ছাড়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুম'আর নামায ফরয।"

হযরত উম্মে আতিয়ার (রা.) বর্ণনা করেন:

"আমাদেরকে জানাযার সহগামী হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নবী করীম (স.) এ ব্যাপারে আমাদের উপর কড়া কড়ি আরোপ করেননি"[৩৫৯]।

"হযরত 'আ'ইশা (রা.) নবী করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স.) বলেছেন: তোমরা গৃহকর্মে লেগে থাকো। এটাই তোমাদের জন্যে জিহাদ"[৩৬০]।

এক মহিলা সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন: আল্লাহ তা'আলা পুরুষের উপর জিহাদ ফরয করেছেন। তারা বিজয়ী হলে গনীমত লাভ করে এবং শহীদ হলে নিজের রবের কাছে জীবিত অবস্থায় রিযিক প্রাপ্ত হয়, আমাদের কোন কাজটি তাদের এ কাজের সমকক্ষ হবে?

নবী করীম (স.) বলেন:

"স্বামীর আনুগত্য ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা"[৩৬১]।

---

[৩৫৬] আহকামুল কুরআন, খ.৩, পৃ. ৪৪৩।

[৩৫৭] মুসনাদ আহমদ, খ.৬, পৃ. ২৯৭, মুসতাদরিকে হাকেম, খ.১, পৃ. ২০৯।

[৩৫৮] মুসনাদ আহমদ, খ.৬, পৃ. ৩৭১, আল ইসতিয়াব, ইব্‌ন আবদিলবার, তাযকিরায়ে উম্মে হুমাযেদ আল সারিয়ায।

[৩৫৯] বুখারী শরীফ, কিতাবুল জানায়েয, বাবু ইত্তিবায়িন নিসাইল জানাযাহ।

রাসূল (স.) নারীদেরকে আল্লাহ তা'আলার পথে জান মাল কুরবানীর অনুপ্রেরণা দেখে আবার বলেন:

"হ্যাঁ তাদের ওপরেও জিহাদ ফরয। তবে তা এমন জিহাদ যাতে যুদ্ধ নেই। আর তা হল হজ্জ ও উমরা"[৩৬২]।

নবী পত্নীগনের পক্ষ থেকে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি উত্তর দেন:

"তোমাদের জিহাদ হলো হজ্জ।"

"তোমাদের জন্যে হজ্জই সর্বোত্তম জিহাদ"[৩৬৩]।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন: পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হল পেছনের কাতার। আর মেয়েদের সর্বোত্তম কাতার হলো সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হল প্রথম কাতার[৩৬৪]।

বস্তুত ইসলাম হল মানুষের স্বভাব ধর্ম, একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ বিপ্লবের নাম। মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগের পরিপূর্ণ সমাধান। স্বামী-স্ত্রীর বৈধ সম্পর্ক - বিবাহ চুক্তির মধ্য দিয়ে মানব জীবনের সূত্রপাত বা সূচনা। ইসলামী দাম্পত্য আইনে মানুষের জন্মগত স্বভাবের বিবেচনায় পুরুষকে নারীর বা গৃহের শাসন কর্তার স্বীকৃতি দেয়। আর নারীকে স্বীকৃতি দেয় ঘরের রাণী হিসাবে।

বস্তুত নারীর দৈহিক ও মানুষিক প্রবনতাও তাই দাবী করে। সেই অনুসারে তাকে অভ্যান্তরীন দায়িত্ব পালনের জন্যই অধিক যোগ্য মনে হয়। তাছাড়া মানুষ গড়ার মত কঠিন, নাজুক, দু:সাহসিক কাজ তার পক্ষেই পালন করা সম্ভব। রাসূল (স.) বাবার চেয়ে মাকে তিনগুন

বেশী সম্মানিত করেছেন। যাকে যে কাজের জন্যে মানায় এবং স্বভাবজাত তাকে সেই কাজ করাই অধিক সমীচিন যুক্তি-যুক্ত, বিজ্ঞানময়।

---

[৩৬০] মুসনাদে আহমেদ, খ.৬, পৃ. ৬৮।

[৩৬১] আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.৩, পৃ.৩৩৬।

[৩৬২] মুসলিম, কিতাবুস্ সালাত্ ও আসহাবুস সুনানিল আর বায়া। ইব্ন মাযাহ, আবওয়াবুল মানাসিক, বাবুল হাজ্জ, জিহাদুন নিসা।

[৩৬৩] বোখারী কিতাবুল জিহাদ, বাবু জিহাদিন নিসা।

[৩৬৪] মুসলিম শরীফ, কিতাবুস সালাত, আসাবুস সুনানিল আরবায়া, ইব্ন মাযাহ, আবওয়াবুল মানাসিক, বাবুল হাজ্জ, জিহাদুন নিসা।

স্বামী স্ত্রী উভয়ের যৌথ দায়িত্ব

প্রেমের সুস্পষ্ট নমুনা প্রদর্শন :

আল্লহ তা'আলা মানুষের স্বভাজাত জৈবিক কামনা বাসনা দান করেছেন তা পূরণ করার জন্য বিয়েকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা পুরণই যে, বিয়ের বা স্বামী স্ত্রীর উদ্দেশ্য তা নয়। এটি স্থায়ী সামাজিক ভালবাসার ও একমাত্র শরী'আতী বন্ধন, এটি বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ও বটে।

বিয়ের উদ্দেশ্য হল:

"প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও মনের পরম প্রশান্তি লাভই হচ্ছে বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কেননা এ জিনিস মানুষ মাত্রই প্রয়োজন, স্বভাবের ঐকান্তিক দাবী। পুরুষ ও নারী উভয়ের এক নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হলেই বিপরীত লিঙ্গ সম্পন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার তীব্র ইচ্ছা ও বাসনা স্বত:স্পূর্তভাবে জেগে উঠে। উভয়ের দেহ মনে যৌবনের বিপ্লবী জোয়ার সৃষ্টি হয়। তখন যৌন মিলনের অপেক্ষা ও প্রেম-প্রীতি ভালবাসা লাভের জন্য নর নারীর মন অধিকতর উদ্দম উৎসাহী, হয়ে উঠে"[৩৬৫]।

দু'জন ভীন্ন বংশ, রূপ, রুচী ও মেজাজের সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বলয়ের। মন, মগজ, চিন্ত াভাবনা, সবকিছুই এক বিপরীত রেখার। বিয়ের মাধ্যমে তা দুইজনই 'একজনে' পরিণত হয়ে এক মোহনায় রুপান্তরিত হয়। এটি মানবতার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার এক অপুরন্ত নিয়ামত। ইসলামই প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, আন্তরিকতা, হৃদ্যতা, মানুষিক প্রশান্তি,জৈবিক আনন্দ লাভের জন্য বিবাহকে একমাত্র উপায় করে দিয়েছেন। বিবাহ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় যৌন তৃপ্তি লাভ ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এই প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী হচ্ছে:

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তার নিকট শান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, হৃদ্যতা, দয়া ও করুণা সঞ্চার করে দিয়েছেন"[৩৬৬]।

---

[৩৬৫] মাও. আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

[৩৬৬] আল কুরআন, সুরা রুম ৩০ : ২১।

"তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি যেন সে তার নিকট থেকে পরম শান্তি ও আরাম লাভ করতে পারে"[৩৬৭]।

কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে আরো একটু অগ্রসর হয়ে একে অপরকে পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন, যেমন:

"তারা (স্ত্রীরা) হচ্ছে তোমাদের জন্য পোষাক আর তোমরা হলে তাদের জন্যে পোষাক"[৩৬৮]।

অর্থাৎ- পোষাক যেমন মানুষের শরীরের সাথে মিশে থাকে তারাও একে অপরের সাথে মিলে মিশে ঘনিষ্ঠজন হয়ে থাকবে। পোশাক যেমন লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধান করে তদ্রুপ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মান সম্মানের হেফাজত কারী। পোষাক যেমন মানুষকে বাইরের আবরণ থেকে রক্ষা করার সহায়ক, তদ্রুপ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য সংরক্ষক।

আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ভালবাসাকে এক মহান সৌন্দর্য্য হিসাবে গণ্য করেছেন।

"আনন্দদায়ক ও মন:পূত জিনিষের ভালবাসা মানুষের জন্য সৌন্দর্য্যের প্রতীক করে দেয়া হয়েছে, যেমন নারী সন্তান সন্ততি....."[৩৬৯]।

বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা ও সম্পর্ক এক মহান সৌন্দর্য ও বন্ধন। আজ এ বন্ধন তথা কথিত প্রগতি ও আধুনিকতার নামে হারিয়ে যাচ্ছে। বহুরুপী স্বাদ ও রুচী বোধের কারণে পারিবারিক প্রথা বিলুপ্তির পথে।

ইসলামের একক পারিবারিক সৌন্দর্য পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে একটা সংকীর্ণ ক্ষুদ্র গন্ডির চিন্তা ধারা মনে করা হচ্ছে। মহানবী (স.) নিজে তাঁর স্ত্রীদের গভীরভাবে ভালবাসতেন। মৃত স্ত্রী খাদিজার (রা.) কথা উঠলে রাসূল হৃদয়াবেগে কেঁদে ফেলতেন। যখন কোন অনুষ্ঠান হত বা বকরী যবাই করতেন তখন খাদীজার (রা.) আত্মীয় স্বজনদের কিছু মাংস পাঠিয়ে দিতেন। খাদিজার কোন বান্ধবী- আত্মীয় সজন রাসুলের (স.) ঘরে আসলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। একদা রাসূল (স.) গোসল খানায় গোসল করছিলেন। এমন সময় হযরত খাদীজার বোন 'হালা' ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (স.) কোথায়? তার আওয়াজ শুনতে পেয়ে রাসূল (স.) গোসলখানা

---

[৩৬৭] আল কুরআন, সুরা আরাফ, ৭ : ১৮৯।

[৩৬৮] আল কুরআন, সুরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭।

থেকেই বলে উঠলেন, "আয় আল্লাহ হালা।" হালার কণ্ঠস্বর ছিল খাদিজার (রা.) মতই। এতে করে বুঝা যায় রাসূল (স.) খাদিজাকে কত ভালবাসতেন। অথচ খাদিজা ছিল ৪০ বছরের বিধবা রমনী আর রাসূল (স.) ছিলেন ২৫ বছরের যুবক। এই হল ইসলামী আদর্শ। বর্তমান সময়ে কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা ব্যতীত সর্বত্রই এর বিপরীত রেখায় অবস্থান। এর কারণ ইসলামের অনুসৃত বিবাহের চর্চা না থাকা, বৈসয়িক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিয়ে করা।

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর স্বর্গীয় বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখার স্বার্থে একে অপরের প্রতি কিছু দায়িত্ব, কর্তব্য বা অধিকার কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কুরআন মাজীদের আয়াত সমূহে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তো 'যাওজ' শব্দ দ্বারাই বেশীর ভাগ উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আহমদ মুস্তফা আল মারাগী লিখেছেন:

"যাওজ শব্দটি পুরুষ নারী উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে এর আসল অর্থ এমন একটি সংখ্যা যা এমন দুটো জিনিসের সমন্বয়ে রচিত ও গঠিত যেখানে সে দুটো জিনিসই একাকার হয়ে রয়েছে এবং বাহ্যত তারা দুটো হলেও মূলত প্রকৃত পক্ষে তারা পরস্পরের সাথে মিলে মিশে একটি মাত্র জিনিসে পরিণত হয়েছে। অত:পর এ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের জন্য। ব্যবহার করা হচ্ছে এ কথা বুঝাবার জন্য যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সাথে অন্তরের গভীর একত্বপূর্ণ ভাবধারা ও ভেদহীন কল্যাণ কামনার সাহায্যে একাকার হয়ে থাকবে, তাই হচ্ছে স্বাভাবিকতার ঐকান্তিক দাবী। তারা একাকার হবে এমন ভাবে যে একজন ঠিক অপরজনে পরিণত হবে"[৩৭০]।

মহানবী (স.) দাম্পত্য জীবনে সু সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি সাহাবায়ে কেরামকে খুব তাগিদ করতেন। নব দম্পতির প্রতি তিনি এভাবে দোয়া করতেন যে:

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বরকত দিন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দুজনের দাম্পত্য জীবনে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন আর তোমাদের মধ্যে কল্যাণের সম্পর্ক দান করুন"[৩৭১]।

---

[৩৬৯] আল কুরআন, সুরা আল ইমরান ৩ : ১৪।

[৩৭০] তাফসীরুল মারাগী, খ.২, পৃ. ১৯০।

[৩৭১] হাদীছ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ।

পারস্পরিক পরামর্শ :

দাম্পত্য জীবন এক নায়ক বা এক কেন্দ্রীক নয়। পরামর্শ ভিত্তিক দাম্পত্য জীবনই হল আদর্শ ও সফল জীবন। পারস্পরিক পরামর্শ গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেয়া যায়। কারণ দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের একান্ত আপন জন ও গোপনীয়তার সংরক্ষণকারীও বটে। মহানবী (স.) স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে জটিল কাজেরও সমাধান পেয়েছেন।

আইন প্রণেতা আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

"স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পরে পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে তাদের কোন দোষ হবেনা "[৩৭২]।

আল্লামা মুস্তফা আল মারাগী এই আয়াতের ভিত্তিতে লেখেন,

"কুরআন মাজীদ সন্তান পালনের মত অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং পিতা মাতার একজনকে অপরজনের উপর জোর জবর দস্তি করার অনুমতি দেয়নি- একথা যদি তোমরা চিন্তাও লক্ষ্য কর, তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণকর কাজ কর্ম ও ব্যাপার সমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারা যায়"[৩৭৩]।

সর্বপ্রথম ওহী লাভ করার পর বিশ্ব নবীর হৃদয়ে ভীতি ও আতংক সৃষ্টি হয়, তার অপনোদনের জন্য তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) এর নিকট পুরো ঘটনার বিবরণ দেন :

"আমি এ ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েছি"

জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বললেন:

"আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনোই এবং কোনদিনই লজ্জিত করবেননা। কেননা আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন অপরের বোঝা বহন করে থাকেন, কপর্দকহীন গরীবদের জন্য আপনি উপার্জন করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদাপদে সাহায্য করেন এজন্য আল্লাহ তা'আলা কখনও আপনার উপর শয়তানকে জয়ী হতে দেবেননা। কোন

---

[৩৭২] আল কুরআন, সুরা বাকারা ২ : ২৩৩।

অযৌক্তিক-অমূলক চিন্তা-ভাবনাও আপনার উপর চাপিয়ে দেবেননা। আর এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ আপানাকে আপনার জাতির লোকদের হেদায়েতের কাজের জন্যেই বাছাই করে নিয়েছেন”[৩৭৪]।

হযরত খাদীজা (রা.) এর এই মূল্যবান পরামর্শ মহানবীর (স.) হৃদয়ে নতুন আশার সঞ্চার করে। তিনি নতুন জীবনে পদার্পণের ইঙ্গিত পেয়ে যান। স্বামী-স্ত্রীর এই আন্তরিকতাপূর্ণ কথা বার্তা ইসলামের সোনালী ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতি স্বরূপ।

যেসব শর্তের ভিত্তিতে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছিল, প্রথমত অধিকাংশ মুসলমান তাতে অসন্তুষ্ট ছিল। এসব শর্তের মধ্যে একটি ছিল মুসলমানরা এ বছর উমরা না করে মদীনায় ফিরে যাবে। এ শর্তের কারণে রাসূল (স.) হুদাইবিয়াতেই মুসলমানদেরকে ইহরাম খুলে কুরবানী করার আদেশ দিলেন। এই আদেশ পালনে সাহাবীদের মাঝে তেমন আগ্রহ দেখা দেয়নি। এই অবস্থায় রাসূল (স.) বিস্মিত ও অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে ঘটনাটি হুজরায় গিয়ে উম্মে সালমার কাছে খুলে বলেন। উম্মে সালমা (রা.) সাহাবায়ে কেরামের আবেগানুভূতি বুঝতে পেরে রাসূলকে বললেন, আপনি কারো সাথে কথা বলবেননা, বরং যে সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করা দরকার তা অন্যদের আগে নিজে করুন। তারপর দেখেন সবাই তা অনুসরণ না করে পারবেনা। সুতরাং তাকে কুরবানী করতে দেখে তৎক্ষণাত সবাই অনুসরণ করতে শুরু করলো”[৩৭৫]। উম্মে সালমার এই যুগান্তকারী পরামর্শ তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি বদলে দিল।

বর্তমান পদ্ধতিতে যে জানাযা পড়া হয় ইসলামের প্রথম দিকে তা মুসলমানদের মধ্যে চালু ছিলনা। হযরত আসমা বিনতে উমাইস হাবশায় খৃস্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখেছিলেন। তিনি এর পরামর্শ দিলে তা গৃহীত হয়”[৩৭৬]।

---

[৩৭৩] আল মায়াগী, খ.২, পৃ. ১৮৮।

[৩৭৪] নুরুল ইয়াকীন ফি সিরাতিল মুরসালীন, পৃ. ২৬।

[৩৭৫] বুখারী, কিতাবুশ শুরুত, অনুচ্ছেদ, আশ শুরুতুফিল জিহাদ ওয়াল মাসালিহাতু মা'আহলিল হারব.....। সাইয়েদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

[৩৭৬] তারকাতে ইবন সা'দ, খ.১, পৃ. ২০৬। ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

এমনি ভাবে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করতে পারেন। তবে স্ত্রী যদি ঈমানদার, সতী সাধবী নারী হয়।

এ কারণে ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের আলাদা আলাদা যোগ্যতার শর্তারোপ করে। ইসলামী দাম্পত্য আইনে স্ত্রী হিসাবে সবচেয়ে উপযোগী নারী হল যে খোদাভীরু।

স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক উপহার বিনিময় :

স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, বন্ধুত্ব ও ভালবাসাকে গভীর ও স্থায়ী রূপ দানে অন্যতম উপায় হল উপহার বিনিময়। সামর্থানুযায়ী স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক জিনিষপত্র বিনিময় করা উচিত। এতে করে পারস্পরিক মধুর আকর্ষণ, কৌতুহল ও হৃদয়াবেগ বৃদ্ধি পাবে। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।"

এই মহামূল্যবান বাণীটি স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"তোমরা পরস্পরে হাদীয়া-তোহফার আদান প্রদান করবে, কেননা হাদিয়া তোহফা দিলের ক্লেদ ও হিংসা-দ্বেষ দূর করে দেয়"[৩৭৭]।

বস্তুত মানুষের মাঝে ধন-মালের মায়া খুবই তীব্র ও গভীর। তা যদি কেউ অন্য কারো নিকট থেকে লাভ করে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই মন তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আকৃষ্ট হয় এবং মাল-সম্পদ দানকারীর মনও ঝঁকে পড়ে তার প্রতি, যাকে সে দান করল"[৩৭৮]।

ইব্রাহীম ইবনে ইয়াজীদ নখয়ী বলেন:

"পুরুষের পক্ষে স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে উপহার দান খুবই বৈধ কাজ। তিনি আরো বলেন: "যদি স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে কোন উপহার দেয়, তবে তা তাদের

---

[৩৭৭] তিরমিযী ও মুসনাদ আহমদ শরীফ।

[৩৭৮] বুলুগুল আমানী, ফি শরহি মুসনাদ আহমদ, খ.১৫, পৃ. ১৬১, মাও. আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

প্রত্যেকের জন্য হবে তার পাওয়া দান।"তিনি অন্যত্র আরো বলেন, এ দুইয়ের কারোর পক্ষেই তার নিজের দেয়া উপহার ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়"[৩৭৯]।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ "এ ধরনের আদান প্রদানকে ফেরত দিতে নিষেধ করেছেন।"

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন:

"স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যা কিছু একবার দিয়েছে, তা ফেরত নেয়া কারো পক্ষেই জায়েয নয়"[৩৮০]।

ইবনে বাত্তাল বলেন:

"কারো কারো মতে স্ত্রী তার দেয়া জিনিস ফিরিয়ে নিলেও পারে; কিন্তু স্বামী তার দেয়া উপহার কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারবেনা।"

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে পারিবারিক কাজ কর্মে অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ কথা কাটা-কাটি, মান-অভিমান হতে পারে, এটি কোন নতুন বা আশ্চার্যের বিষয় নয় বরং মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা।

হযরত উমর (রা.) কে একদিন তাঁর স্ত্রী বলে উঠলেন:

"আল্লাহ তা'আলার কসম, নবীর বেগমরা পর্যন্ত তাঁর কথার প্রতুত্তর করে থাকেন। এমনকি তাঁদের এক একজন রাসূলকে (স.) দিনের বেলায় ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত অভিমান করে থাকেন।"

তখন হযরত উমর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁর কন্যা রাসুলের (স.) স্ত্রী হযরত হাফসার কাছে উপস্থিত হয়ে এ কথার সত্যতা জানতে চান। জবাবে হাফসা তাই বললেন। হযরত উমর এর পরিণাম ভয়াবহ মনে করে কন্যাকে সাবধান করে বললেন:

" সাবধান। তুমি রাসুলের নিকট বেশী বেশী জিনিস পেতে চাইবেনা। তাঁর কথায় মুখের উপর জবাব দেবেনা। আর তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তা আমার নিকট চাইবে"[৩৮১]।

"নিজের কন্যার দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করার একটা নির্দেশ এতে নিহিত রয়েছে। আর এ হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপার এবং এ উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা

---

[৩৭৯] মাও: আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

[৩৮০] উমদাতুল কারী, খ.১৩, পৃ. ১৪৮।

[৩৮১] বুখারী শরীফ।

কর্তব্য। জামাতার নিকট মেয়ে বেশী-বেশী জিনিস চাইলে তার কষ্ট হতে পারে মনে করে কন্যার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হওয়ার নিদর্শন এতে রয়েছে[৩৮২]।

উপরোক্ত ঘটনা ও হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, ইসলামে দাম্পত্য জীবন নিরস কঠিন যন্ত্রনা নয় বরং তা হাসি কান্নায় ভরা এক মুহূর্ত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের উপর নির্ভর করে এর সুখ শান্তি। স্বভাবত উভয়ের মাঝে মান অভিমান হতে পারে। মানবতার বন্ধু মোহাম্মাদ (স.) এর সমাধানের জন্য সঠিক ও যুগান্তকারী নির্দেশনা প্রদর্শন করেছেন। মাঝে মাঝে এক ঘেয়েমী দূর করার জন্য, একে অপরের মধ্যে উপহার বিনিময়, শশুর জামাই কর্তক, জামাই কতৃক শশুর, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে এমনকি সকল ক্ষেত্রেই শ্রেণীভেদে অভ্যাস করা ব্যঞ্জনীয়। এতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে, মধুর সুসম্পর্ক সৃষ্টি হবে, হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি আদর্শ ও অনুপম পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা।

---

[৩৮২] উমদাতুল কারী, খ.২০, পৃ. ১৮৩।

৫ম অধ্যায়

মুসলিম পারিবারিক জীবন : লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন, পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার অধিকার

মুসলিম পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : বাস্তবায়ন

মহান আল্লাহ তা'আলা মানব সভ্যতা দ্বারা পৃথিবী নামক গ্রহকে শোভামন্ডিত করেছেন। ইসলামী দাম্পত্য আইন হল তার একমাত্র বিধি বদ্ধতা। মানব বংশ বিস্তারের মূল সুতিকাগার হল স্বামী-স্ত্রীর বৈধ মিলন। বস্তুত ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবন যাপনের জন্য যেমন গুরুত্ব দেয় তেমনি তারই মাধ্যমে বংশ ধারা সংরক্ষণ ও মানব সভ্যতাকে সঠিক নেতৃত্ব দানের উপযোগী করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। পারিবারিক জীবনের তথা বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য হল:

মানব জাতির প্রকৃতিগত যৌন উদ্দীপনাকে বৈধ, সুষ্ঠু ও কার্যকরী পন্থায় পরিচালনা।

মানব বংশ ধারার সংরক্ষণ বা বিস্তার।

মানব স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"হে মানুষ তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই প্রভুকে যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণী থেকে এবং সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জুড়িকে এবং এ দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী লোক"[৩৮৩]।

এই আয়াতের বক্তব্য থেকে মানব সৃষ্টির রহস্য ও ক্রমধারার আসল তত্ত্ব কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। আয়াতে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও সুক্ষ্ণভাবে আদম সৃষ্টির রহস্য উদঘাটিত হয়। এখানে মানব সৃষ্টির ইতিহাস ও তত্ত্বকথা খুব সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় মানব জাতি সৃষ্টির উদদেশ্যে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আদম (আ.) কে সৃষ্টি করলেন। এরপর তারই থেকে সৃষ্টি করলেন হাওয়াকে তারই জুড়ি হিসাবে। পরে তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জীবন যাপন করতে থাকে। এ স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের ফলেই দুনিয়ায় এ বিপুল সংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব ও বিস্তার লাভ সম্ভব হয়েছে"[৩৮৪]।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের উক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জীবন যাপনের বিকল্প নেই অর্থ্যাৎ মানুষ পরিবার ভুক্ত। আর এ পারিবারিক জীবনের মহান লক্ষ্য হল- পাশবিকতা নয়,

---

[৩৮৩] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ০১।

[৩৮৪] মাও. আব্দুর রহিম পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭।

উদ্দেশ্যহীন যৌন অপচয় নয়, বরং মানব বংশ বিস্তার ও যথাযোগ্য নাগরীক উপহার। পৃথিবীর প্রথম মানব পরিবারের ২০ জন ছেলে ও ২০জন মেয়ে আবির্ভাব ঘটে"[৩৮৫]।

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

"তোমরাদের স্ত্রীলোক তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন কর, যেমন করে তোমরা চাও এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য এখনি ব্যবস্থ গ্রহণ করো। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো: ভালভাবে জেনে রাখো, তোমরা সকলে নিশ্চয়ই একদিন তাঁর সাথে মিলিত হবে। আর ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ দাও"[৩৮৬]।

উপরোক্ত আয়াতে- নারীকে ক্ষেতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আমরা সাধারণত আদর্শ ক্ষেত বলতে বুঝি ফসলি জমি, যা থেকে ফসল উৎপন্ন হয় এবং ভাল ফসল ও হয়। বিভিন্ন মনীষী এই ক্ষেতকে বিভিন্ন ভাবে অর্থ করেছেন।

'বীজ বপন করা এবং যমীনকে ফসলের উপযোগী করে তোলা"[৩৮৭]।

"মেয়ে লোকদের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে এমন জিনিস যার উপর মানব বংশের স্থিতি রক্ষা নির্ভর করে, যেমন করে যমীনের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে এমন জিনিস চাষের, যার ওপর সে ফসলের প্রজাতিকে অস্তিত্ব রক্ষা নির্ভর করে"[৩৮৮]।

আল্লাহ সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম নারীকে পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী করেনি বরং তাদের উভয়ের মধ্যে জমি ও কৃষকের মতো একটা সম্পর্ক রয়েছে। জমিতে কৃষক নিছক বিচরণ ও ভ্রমন করতে যায়না। জমি থেকে ফসল উৎপাদন করার জন্যই সে সেখানে যায়। মানব বংশ ধারার কৃষককেও মানবতার এই জমিতে সন্তান উৎপাদন ও বংশধারাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যেই যেতে হবে। মানুষ এই জমিতে কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার শরী'আতে কোন বক্তব্য নেই। তবে তার দাবী কেবল এতটুকু যে, তাকে জমিতেই যেতে হবে এবং সেখান থেকে ফসল উৎপাদন করার লক্ষ্যেই যেতে হবে"[৩৮৯]। স্ত্রী সহবাসের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ, তা আয়াতের শেষাংশ "তোমাদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করো"। এর

---

[৩৮৫] ইসহাক ইবুন আসাকির হযরত ইবুন আব্বাস থেকে বর্ননা করেন যে, আদমের মোট চল্লিশটি সন্তান হয়, তাদেও মধ্যে বিশজন ছেলে ও বিশজন মেয়ে।

[৩৮৬] আল কুরআন, সুরা বাকারা ২ : ২২৩।

[৩৮৭] আল মুফরাদাত, পৃ. ১১০।

[৩৮৮] আল মুফরাদাত, পৃ. ১১১।

[৩৮৯] সাইয়েদ আবুল আঁলা মওদূদী (র), তাফহীমুল কুরআন। ১ম খন্ড টীকা নং ২৪১, পৃ. ১৮৩, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০১ খৃ.)

অর্থ প্রসঙ্গে আল্লামা পানিপত্তী বলেন" তোমাদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করো"। বরং তা থেকে এমন কিছু লাভ করতে চেষ্টা করো, যার ফলে দ্বীনের কোন ফায়দা হবে, যেমন যৌন অঙ্গের পবিত্রতা বিধান এবং নেক ও সৎস্বভাবের সন্তান লাভ, যার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে মাগফিরাত কামনা করবে"[৩৯০]। আল কুরআন আরও ঘোষণা করে যে, "এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন সম্পন্ন করো এবং কামনা করো যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"[৩৯১]।

আল্লামা ইব্ন আব্বাস মুজাহিদ প্রমুখ তাবেয়ীর মতে আয়াতের লক্ষ্য হল স্ত্রী সহবাস করে সন্তানাদীর লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা আর নির্দিষ্ট করে রাখা অর্থ সন্তানাদী যা লাওহে মাহফুজে সকলের জন্য ঠিক করে রাখা হয়েছে। আল্লামা আলুসীর বক্তব্য হল:

"এই আয়াত অনুসারে স্ত্রী সঙ্গমকারীর কর্তব্য হচ্ছে, সে বিয়ে ও যৌন ক্রিয়ার মূলে বংশ রক্ষা উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করবে নিছক যৌন লালসা পুরণ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রজাতীয় অস্তিত্বকে একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে যেমন আমাদের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন, আমাদের ব্যক্তিদের জৈব জীবন একটা সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিছক যৌন স্পৃহা পুরণ তো নিম্নস্তরের পশু ছাড়া আর কারোর কাজ হতে পারেনা[৩৯২]। আল্লামা শাওকানী লিখেছেন:

"অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন ক্রিয়া দ্বারা বিয়ের বৃহত্তর উদ্দেশ্য লাভের বাসনা পোষণ কর এবং তা হচ্ছে সন্তান ও ভবিষ্যৎ বংশধর লাভ[৩৯৩]। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী বলেন:

"আয়াতে বিয়ের ইচ্ছা করা সম্পর্কে এক সুক্ষ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে যৌন স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন একটা সময় পর্যন্ত মানব বংশের সংরক্ষণ ও স্থিতির জন্য যেমন আমাদের জন্যে খাদ্য স্পৃহা করেছেন, আমাদের ব্যক্তিদের জৈব সত্ত্া একটা সময় পর্যন্তা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। অতএব মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বিয়ে করে সে উদ্দেশ্য লাভ করা। যা জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা ঠিক করে

---

[৩৯০] তাফসীরুল মাজহারী খ.১,পৃ. ২৮৫।

[৩৯১] আল কুরআন সুরা বাকারা ২ : ১৮৭।

[৩৯২] তাফসীরুল রুহুল মায়ানী, খ.৩, পৃ. ২৯।

[৩৯৩] তাফসীরুল ফতহুল কাদীর খ.১, পৃ. ১৫৩।

দিয়েছেন। আর যখনিই কেউ বিয়ের সাহায্যে শারী'আত মুতাবিক আত্ম সংযম ও সরক্ষনের কাজ করবে, সে আল্লাহর লিখন অনুযায়ী উদ্দেশ্য লাভে নিয়োজিত হল"[৩৯৪]।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন:

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের মানুষের মধ্যে থেকেই জুড়ি বানিয়েছেন , যন্তু-জানোয়ারের জন্যে ও তাদের জুড়ি বানিয়েছেন, তিনিই তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন।

এই আয়াতে সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হল:

"তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় বানিয়ে তোমাদের সংখ্যা বিপুল করেছেন। কেননা বংশ বৃদ্ধির এই হল মূল কারণ[৩৯৫]।

আর মুজাহিদ এই সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ বলেছেন :

"তোমাদেরকে বংশের পর বংশে ও যুগের পর যুগে ক্রমবর্ধিত করে সৃষ্টি করেছেন।" বস্তুত সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনই হচ্ছে ইসলামের পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য এবং যে মিলন এ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়, তাই ইসলামের সম্মত মিলন। আর এ মিলনের ফলে স্ত্রীর ভ্রুনের উপরে যে সন্তানের আগমন ঘটে সে ব্যাপারে বিশেষত স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও মনের সুস্থ্যতা সন্তানের উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। সুতরাং ভাবী সন্তানের মাকে আদর্শ ও পরিপূর্ণ নারীর ভুমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। যেমন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথায় আমাকে একজন ভাল মা দাও, তাহলে আমি তোমাদের ভাল জাতি উপহার দেব। সত্যিই মায়ের ভূমিকা এক ঐতিহাসিক যুগান্তকারী। কারণ আদর্শ ও সুসভ্য জাতির জন্য যেমন সৎ ও আদর্শবান ম্যুনষের অপরিহার্যতা রয়েছে, তেমনি আদর্শ চরিত্রবান মানুষের জন্য আদর্শবান পুত পবিত্র মায়ের বিকল্প নেই। সন্তানের জন্মদান পদ্ধতিতে যেমন স্বামী-স্ত্রীর উপর গুরু দায়িত্ব বর্তায় তেমনি জন্মের পরও সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বহুবিধ দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সদা ব্যস্ত থাকতে হবে।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব কর্তব্য বা সন্তানের অধিকার বা হক:-

---

[৩৯৪] তাফসীরুল মুহাসিনুত তাবিল খ.৩, পৃ. ৪৫৪।

[৩৯৫] তাফসীরুল ফতহুল কাদীর, খ.৪, পৃ. ৫১৩ ।

"ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান সন্ততি হচ্ছে পারিবারিক জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠ অলংকার। বস্তুত ইহা পরিবারিক জীবনের সহজাত আকর্ষণ ও বটে। পিতা-মাতার জন্য সন্তান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার একটি অফুরন্ত নিয়ামত ও বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহর বাণী :

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি হতেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমদের এই জুড়ি থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান - সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী বানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত, সন্তান - সন্ততি আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব দান বৈ কিছু নয়"[৩৯৬]।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন। "ধন মাল ও সন্তান - সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ শান্তির উপাদান ও বাহন [৩৯৭]। আল্লামা আলুসী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: ধন মাল হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান - সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম[৩৯৮]।

প্রকৃত পক্ষে মানুষের জীবনটাই একটা পরীক্ষা কেন্দ্র। আল্লাহ তা'আলার দেয়া মাল-সম্পদ, সম্পত্তি আর সন্তান পরীক্ষার বিষয় সম্পদের মধ্যে এ দুটো প্রধান। সন্তান ও ধন মালের প্রতি অধিক ভালবাসা আল্লাহ তা'আলার দেয়া সীমা রেখার মধ্যেই থাকতে হবে। তাদেরকে যেমন অত্যাধিক ভালবাসায় সীমালংঘনের পর্যায়, তেমনি তাদের প্রতি দেয়া দায়িত্ব কর্তব্যে অবহেলার জন্য ও ভয়াবহ প্রার্থীব ও পরকালীন পরিণাম ভোগ করতে হবে। সুতরাং ইহা একটি স্পর্শ কাতর আমানত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের ধনমাল ও সন্তান-সন্ততি ফেতনা বিশেষ, আর কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে বিরাট ফল[৩৯৯]।

আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেন "তোমাদের মাল এবং তোমাদের আওলাদ কোন কিছুই এমন নয়, যে তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে, সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। আমার নিকটবর্তী ও আমার নিকট মর্যাদাবান হবে তো কেবল তারা, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তাদের জন্যেই আমলের দ্বিগুন ফল রয়েছে এবংবেহেশতের সুসজ্জিত কোঠায় তারা অবস্থান করবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তা ও নিরাপত্তা সহকারে[৪০০]।

---

[৩৯৬] আল কুরআন, সুরা নহল, ১৬ : ৭২।
[৩৯৭] আল কুরআন, সুরা কাহাফ, ১৮ : ৪৬
[৩৯৮] তাফসীরুল রুহুল মায়ানী, খ.১১।
[৩৯৯] আল কুরআন সুরা ৮ : ২৮।
[৪০০] আল কুরআন,সুরা নিসা ৪ : ০৫।

উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার দেয়া একটি আমানত ও পরীক্ষার সামগ্রী। ধন-সম্পদ অন্যায় ভাবে ব্যায় করলে যেমন আমানতের খেয়ানত, তেমনি সন্তান সন্ততিকে ভুল পথে পরিচালিত করলে যেমন সামাজিক বিপর্যয় আসবে সেটাও আল্লাহ তা'আলার আমানতের খেয়ানত। কেবল মাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে বিরাট ফল।

তবে পিতামাতার জন্য সত্যিকার আমানত দাতার বৈশিষ্ট হচ্ছে, সন্তান- সন্ততিকে দ্বীনের সঠিক পথে পরিচালিত করা। আয়াতের মর্মবাণী অনুযায়ী বুঝা যায়, সন্তানের প্রতি অধিক ভালবাসা বা ধন সম্পদ কোন কিছুই মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য আনতে অক্ষম। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আমলে সালেহ বা সৎকাজ, খোদাভীরূতার আমলই কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়ে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে সহযোগীতা করে। এ ধরণের ব্যক্তিদের জন্য পরকালে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মহান পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে।

বস্তুত সন্তান - সন্ততির প্রতি যেমন পিতামাতার বিরাট দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তেমনি পিতামাতার প্রতি ও সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেককে প্রত্যেকের এ সংক্রান্ত কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে কঠিনভাবে জওয়াবদিহী করতে হবে।

সন্তানের হক বা অধিকার:

পিতা মাতার উপর সন্তানের অনেক গুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে, যা মানবিক ও বটে। মানবতার শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সংবিধান মহাগ্রন্থ আলকুরআন ও তার সহায়ক গ্রন্থ বা মহানবীর (স.) এর মুখ নিসৃত বাণী সাহবায়ে কিরামের প্রেরণাদায়ক জীবনী থেকে পিতামাতার প্রতি সন্তানের অনেক গুলো অধিকারের বিবরণ পাওয়া যায়, যা মাতাপিতার জন্য অবশ্যই পালণীয়। একে আরো কম বেশী সংখ্যানুপাতেও সাজানো যায়।

১. বংশগত ও জন্মগত পবিত্রতা এবং সুস্থ্যতার অধিকার।

২. বেঁচে থাকার অধিকার।

৩. জন্মগত বৈধতা এবং ভাল নাম - আকিকাহ, খাৎনা লাভের অধিকার।

৪. মাতৃস্তণ্য পান, আশ্রয়, প্রতি পালন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রাপ্তির অধিকার।

৫. পৃথক শয্যায় নিদ্রা যাওয়ার অধিকার।

৬. ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অধিকার, আর্থিক যাবতীয় ব্যয়ভার পাওয়ার অধিকার।

৭. নৈতিক চরিত্র গঠন এবং

৮. সন্তানের ব্যাপারে পিতা মাতাকে অহংকার মুক্ত থাকতে হবে।

৯. লিঙ্গ বেধে সমব্যবহারের অধিকার।

১০.বৈধ আয় থেকে প্রতি পালিত হওয়ার অধিকার [৪০১]।

১। বংশগত ও জন্মগত পবিত্রতা এবং সুস্থ্যতার অধিকার:

এটি একটি মানবিক অধিকার। সুস্থ্য শরীর নিয়ে জন্ম লাভ প্রতিটি শিশুর অভিভাবকেরই কাম্য। রোগাক্রান্ত পিতামাতার সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে অসুস্থ্য হওয়া পিতামাতার অপরাধ নয় বরং অসুস্থ্য অবস্থায় যৌন মিলন, মাত্রাতিরিক্ত সঙ্গম এ ক্ষেত্রে দায়ি হতে পারে। অনেক সময় অনেক যৌন রোগাক্রান্ত পিতামাতার সন্তান অসুস্থ্য হয়ে জন্ম লাভ করে। মহানবীর বাণী:

"কোথায় তোমার বীর্য স্থাপন করবে তা চিন্তা-ভাবনা করে স্থীর করে নাও। বংশ ধারা যেন সঠিক হয়"[৪০২]।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে জন্মগত অক্ষমতার সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সন্তান দৈহিক ক্ষীণকায় এবং নিম্ন মানের মেধায় থাকে। তবে শারীরিক অবস্থা ও স্থান কাল পাত্র ভেদে যৌন সঙ্গম একটি যৌক্তিক দলিলও বটে। মহানবী (স.) সু-সন্তান লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতেন। পবিত্র কুরআনে হযরত যাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর সু-সন্তান লাভের অভিপ্রায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে।

---

[৪০১] ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, মূল আবদেল রহীম উমরান, অনুবাদ- শামছুল আলম। (ঢাকা: জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল, ডিসেম্বর- ১৯৯৫ খৃ.) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আই, ই, এম ইউনিট।

[৪০২] হাদীছ শরীফ ইব্‌ন মাযাহ ।

"সেখানে যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার প্রতি পালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। তুমি প্রার্থনা শ্রবণ কারী।"[৪০৩]। সে বলিল, আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে। বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রজ্জল হয়ে গেছে। হে আমার প্রতিপাপলক! তোমাকে আহবান করে আমি কখনো ব্যার্থ কাম হয়নি। আমি আশংকা করি আমার পর আমার সগোত্রিয়রা দ্বীনকে ধ্বংশ করে দেবে। আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকার। যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতি পালক! তাকে কর সন্তোষভাজন। তিনি বললেন হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পূত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি তার নাম হবে ইয়াহিয়া। এ নামের পূর্বে আমি কারো নামকরণ করি নাই" [৪০৪]।

অত:পর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছি এবং তাকে দান করেছি ইয়াহিয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে করেছিলাম বন্ধ্যাত্ব মুক্ত। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগীতা করত তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভিতীর সাথে এবং তারা ছিল আমার বিনীত" [৪০৫]।

"যারা প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের আদর্শ স্বরূপ কর[৪০৬]।

উপরোক্ত মূল্যবান বাণী সমূহের মাধ্যমে জন্মের পূর্বে পবিত্র ও সৎ মুত্তাকী সন্তান লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে নবী রাসূলদের প্রার্থনার উজ্জল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএব জন্মগত, বংশগত পবিত্রতা ও সুস্থ্যতার জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে মানুষিক ও বাস্তবিক, পদ্ধতিগত অবস্থান থাকতে হবে, যা মানুষিক ভাবে শিশুর দৈহিক ও মনের মধ্যে প্রভাব ফেলবে। তাই একজন শিশুর জন্য এটি একটি মানবাধিকার।

২। বেঁচে থাকার অধিকার :

মুসলিম দাম্পত্য আইনে দারিদ্রতার ভয়ে বা পারিবারিক ঐতিহ্যে শিশু হত্যা সম্পূর্ণ রূপে হারাম। জাহেলীযুগে কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া হত। বর্তমান যুগে ও পত্রপত্রিকার পাতায় দাদ্রিতা, সামাজিক অবক্ষয়ে শিশু হত্যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনেক মেয়েদের সামাজিক

---

[৪০৩] আল কুরআন, সুরা নিসা ৪ : ৩৮।

[৪০৪] আল কুরআন, সুরা মারিয়াম ১৯ : ৪-৭।

[৪০৫] আল কোরআন, সুরা আম্বিয়াহ ২১ : ৯০।

[৪০৬] আল কোরআন সুরা আল ফুরকান ২৫ : ৭৪।

উত্যক্ততা ও সম্ভ্রমহানীর এবং এসিড নিক্ষেপের পরবর্তী যন্ত্রনা ও অবহেলা থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আল কোরআনের জাহেলী চিত্র এভাবে পাওয়া যায়: "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার চেহারা কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে এবং মনোকষ্টে তার হৃদয়মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। লোক চক্ষু থেকে সে নিজেকে আড়াল করে চলার চেষ্টা করে। কারণ এর দু:সংবাদ লাভের পর কি করে সে মানুষকে মুখ দেখাবে? সে তখন ভাবতে থাকে লাঞ্চনা বহন করে তাকে জীবিত থাকতে দেবে না মাটির নিচে পুতে ফেলবে"[৪০৭]।

"আরবের অধিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক মনে করত। কন্যা সন্তান জন্ম নেয়া ছিল তাদের জন্য গভীর দু:খ ও মনোকষ্টের কারণ। পূত্র সন্তান নিয়ে তারা গর্ব ও অহংকার করত কিন্তু কন্যা সন্তানদের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদাকে ভুলণ্ঠিত করত[৪০৮]।

কায়েস ইবন আসেম জাহেলীযুগে ১০টি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাপন করেছিল[৪০৯]। এক ব্যক্তি নবী করীম (স.) কে তার জাহেলি যুগের কাহিনী শুনিয়ে বললেন "আমার একটি মেয়ে ছিল সে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। আমি যখনই তাকে আহবান করতাম সে বড় আনন্দ চিত্তে আমার কাছে দৌড়ে আসত, এ ভাবে একদিন আমি তাকে ডাকলে সে আমার পেছনে পেছনে দৌড়ে এল। আমি তাকে সাথে করে নিকটবর্তী কুপের পাশে গেলাম এবং ধাক্কা দিয়ে কুপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনও সে আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করতে লাগল।" ঘটনাটি শুনে নবী করী (স.) এর দুটি চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল এমন কি তার পবিত্র দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল"[৪১০]।

মহানবী (স.) এর সকল কিছুর মূলোৎপাটন করে একটি সোনালী অধ্যায় সূচনা করেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে "দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করবে না, আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিজিক দিয়ে থাকি[৪১১]।

"দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা। ওদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিজিক দিয়ে থাকি। সন্তান হত্যা করা মহাপাপ"[৪১২] / আল কোরআনের অন্যত্র শেষ

---

[৪০৭] আল কোরান সুরা- আয-যুখরুফ ৪৩ : ১৭ ।

[৪০৮] সাইয়েদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরি অনুবাদ মো. মোজাম্মেল হক, ইসলামী সমাজে নারী (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, মে ১৯৯৭ খৃ.)।

[৪০৯] তাফসীর ইবন কাসীর, খ.৪, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

[৪১০] সুনান দারমী, অনুচ্ছেদ - মাকানা আলাইহিন্নাস কাবলা বাছিন নবী (স:) ।

[৪১১] আল কুরআন সুরা আনয়াম ৬ : ১৫১ ।

বিচারে কন্যা সন্তান হত্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "ঐদিন যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাস করা হবে কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল? সে দিন প্রত্যেকেই জানতে পারবে পৃথিবী হতে কি নিয়ে তারা পরকালে হাজির হয়েছে[৪১৩]।

"যে সন্তান প্রসবিত হয়নি, দুনিয়ার আলো দেখেনি, মাতৃ গর্ভে থাকা কালে তারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ক্রুনে জীবন এসে গেলে তাকে হত্যা করা যাবে না। কারো কারো মতে চল্লিশ দিনে জীবন আসে, কারো মতে চারমাসে। জীবন এসে গেলে গর্ভপাত সম্পূর্ণ হারাম। তবে মা ও ক্রুনের জীবনের অধিকারের ক্ষেত্রে মায়ের জীবনের মূল্য বেশী অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সন্তানদের কারণে অবক্ষয় ও মহা দারিদ্রতার আশংকায় ফকিহগণ আজলের অনুমতি দেন। আজল হল পরিকল্পিত উপায়ে সঙ্গম বা বীর্যকে বাহিরে নির্গমন। অতএব পিতামাতার কাছে সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার একটি মৌলিক অধিকারের অন্যতম।

দারিদ্রতা বা অন্য কোন কারণে সন্তান হত্যা করা যাবে না, এটি ইসলামে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: এবং তোমার পরিবার বর্গকে সালাতের আদেশ দাও, এবং উহাতে অবিচল থাক। আমি তোমার নিকট কোন জীবন উপকরণ চাই না, আমি তোমাকে জীবন উপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো সাবধানিদের জন্য" [৪১৪]।

"বল, তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন, তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই। উহা এই! তোমরা তার সাথে কোন শরিক করবেনা। পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করবে দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক অশ্লিল আচরণের নিকটেও যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না।" [৪১৫]।

অতএব ইসলামী দাম্পত্য আইনে যে কোন কৌশলে হোক সন্তান হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পিতামাতার কাছে সন্তানের এই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, পিতা-মাতা তাকে পৃথিবীতে আসতে বা জন্ম গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারবেনা।

---

[৪১২] আল কুরআন সুরা ইসরায়া ১৭ : ৩১।

[৪১৩] আল কুরআন সুরা তাকবির ৮১ : ৮,৯,১৪,৮১।

[৪১৪] আল কুরআন,সুরা ত্বহা ২০ : ৩২।

[৪১৫] আল কুরআনা সুরা আল আন্ আম ৬ : ১৫২।

৩। জন্মগত বৈধতা এবং ভাল নাম, আকিকাহ খাৎনার অধিকার:

ইসলাম ও মুসলিম দাম্পত্য আইনে বিবাহ বহি:র্ভূত সকল প্রকার যৌনাচার সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ। যার কারণে ইসলামী আইনে বিবাহ ও পরিবার, জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সন্তানের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় বৈধ যৌনতার উপর নির্ভরশীল তাই এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর বৈধ, পবিত্র এবং সন্দেহ মুক্ত জীবন যাপন অপরিহার্য, সন্তানগণ ও যাতে বলিষ্ঠভাবে ও সন্দেহ মুক্তভাবে নিজের বংশ পরিচয় দিতে পারে, এ ব্যাপারে যাতে তাকে লজ্জিত হেয়প্রতিপন্ন হতে না হয়। জাহেলীযুগে সন্দেহ জনক ব্যক্তিত্ব নিয়ে অনেক শিশুকে বেঁচে থাকতে হতো। একাধিক ব্যক্তি একটি শিশুর পিতা বলে দাবি করত। স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে যুক্তি ও প্রেম করত, অবশ্যই বর্তমান ইউরোপের তথাকথিক সভ্যতা ও প্রগতির নামে এবং নারী স্বাধীনতার পোশাকে এ ধরণের ঘটনা পত্র পত্রিকায় ভেসে আসছে। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, আল ওলাদু লিল ফারাস' যে (পিতা) শয্যায় (সংসারে) সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, শিশু সেই শয্যারই"। ইসলামী দাম্পত্য আইনে যে পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সন্তান সে পরিবারের, যদি না বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হয়। অবশ্যই আজকের বিজ্ঞানের যুগে পিতৃত্ব অস্বীকার করে রক্ষা পাবেনা, কারণ রক্ত ও জ্বীন পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে যায়।

নামের ও কিছু প্রতিক্রিয়া রয়েছে, কিয়ামতের দিন রাসূল (স.) তার উম্মতদেরকে নাম ধরে ডাকবেন। তিনি ইরশাদ করেন "সন্তানের এটা অধিকার যে, পিতা-মাতা তাকে একটি সুন্দর নাম দিবেন এবং সম্মান জনক সৎ পরিবেশে প্রতিপালন করবে[৪১৬]।

হযরত আবূ মূসা (রা.) তিনি বলেন: আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করলে আমি তাকে নিয়ে নবী করিম (স.) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহিম এবং খেজুর দিয়ে তিনি তার তাহনীক করলেন, আর তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। অত:পর আব্বাস তাকে কোলে ফিরাইয়া দিলেন। ইব্রাহিম ছিলু আবূ মূসার বড় সন্তান[৪১৭]। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন (রা.) হতে বর্ণিত তিনি নিজে বলেছেন: "৭টি কাজ সুন্নত, (১) ৭ম দিনে সদ্য জাত শিশুর নাম করণ করতে হবে। (২) খাৎনা করতে হবে, (৩) তার দেহের ময়লা দূর করতে হবে, (৪) কানে ছিদ্র করতে হবে (নারী শিশু)। (৫) তার নামে আকিকাহ করতে হবে। (৬) তার

---

[৪১৬] বায়হাকী।

[৪১৭] বুখারী ও মুসলীম।

মাথা মুন্ডন করতে হবে, এবং আকিকায় জবেহ করার যন্তুর রক্ত শিশুর মাথায় মাখতে হবে। (৭) তার চুলের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ বা রোর্প ছদগা করতে হবে[৪১৮]। বদরুদ্দিন আইনী এই হাদীছের সনদকে দুর্বল বলেছেন।

হযরত ইব্‌ন শোয়াইব তার পিতা হতে- তার দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল করীম (স.) কে আকিকাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন আল্লাহ তা'আলা উকুক পছন্দ করেন না। সম্ভবত তিনি এ নাম টাকে অপছন্দ করেছেন। এক সাহাবী জিজ্ঞাস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আমাদের ঘরে সন্তান জন্ম লাভ করলে কি করতে হবে? তিনি বললেন যদি কেউ নিজের সন্তানের নামে জবেহ করা পছন্দ করে, তাহলে তা তার জন্য উচিত। পুত্র সন্তান জন্মিলে দুইটি সমান সমান আকারের ছাগী এবং কন্যা সন্তান জন্মিলে তার পক্ষ থেকে একটি ছাগী জবে করতে হয়[৪১৯]।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের বাবা দাদার নামে ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের জন্য উত্তম নাম ঠিক করবে"[৪২০]। হযরত আবু ওয়াহাব নবী করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন নবীদের নামে নাম রাখা এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় নাম হল আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান, প্রিয় নাম হল হারেস এবং হাম্মাম, অত্যন্ত অপছন্দনীয় নাম হল হারব ও মুররাহ (হারব অর্থ যুদ্ধ, মুররাহ অর্থ তিক্ততা)[৪২১]। তছাড়া কোন মুজাহিদ ওয়ালী এবং দ্বীনের খাদেমের নামানুসারে নাম রাখা, যেমন উমর ফারুক, খালিদ আব্দুল কাদের, হাজেরা, মরিয়ম, উম্মে সালমা, সুমাইয়া ইত্যাদি, দ্বীনি আবেগ অনুভুতির সাথে সম্পর্কিত নাম ও রাখা যায়।

নাম রাখার সময় বর্জনীয় :

১. এমন চিন্তা ও অনুভতি যা ইসলামী আকিদা এবং আদর্শের পরিপন্থী বিশেষ করে যে নামে তাওহীদি ধ্যান-ধারণায় আঘাত লাগে। যেমন নবী বখশ, আব্দুর রসূল ইত্যাদি।

২. কোন এমন শব্দ যা দিয়ে গর্ভ অহংকার অথবা নিজের পবিত্রতা ও বড়াই প্রকাশ করে।

---

[৪১৮] দারে কুতনী আল আসওয়াত।

[৪১৯] মুসনাদ আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইমাম মালিক (র.), মুয়াত্তা।

[৪২০] মুত্তাফাকুন আলাইহি।

[৪২১] আদাবুল মুফরাদ ও জমউল ফাওয়াতেদ খ.২, পৃ.৪০৬, আবুদাউদ, নিসায়ী শরীফ ।

৩.এমন নাম যা অনৈসলামিক আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটায় এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত প্রাপ্তির কোন আশা করা যায় না[৪২২]।

অতএব সন্তানদের নাম রাখতে হবে আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলের (স.) নামের সাথে মিলিয়ে এবং ইসলামের বিভিন্ন বিখ্যাত ওয়ালী সাহাবী ও বিশেষ ব্যক্তিদের নামের সাথে মিলিয়ে। কারো নামকে বিক্রিত করে ডাকা যাবে না বা তিরস্কার ও করা যাবে না। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, যখন কারো নাম মোহাম্মাদ রাখবে তখন তাকে তোমরা মারবেনা এবং বঞ্চিত ও করবে না[৪২৩]।

হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন:

"তোমরা শিশুদের নাম মোহাম্মাদ রাখবে আবার তাকে অভিশাপ ও গালাগালিও করবে তা হতে পারে না।

হযরত 'আ'ইশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম (স.) খারাপ নাম পরিবর্তন করেন দিতেন[৪২৪]।

হযরত আলী (রা.) ও নিজের তিন পূত্রের নাম রাখেন হারব। প্রিয় নবী (স.) তাদের নাম পরিবর্তন করে হাসান, হোসাইন এবং মুহসিন রাখেন[৪২৫]।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, ৫টি কাজ স্বভাব সম্মত, তা হল-খাৎনা করা, নাভির নীচে খুর ব্যবহার করা, মোচ কাটা এবং বগলের পশম উঠানো,আকিকার মাধ্যমে নাম রাখা[৪২৬]।

অতএব সন্তানের জন্মগত বৈধতা, ভাল নাম ও আকিকাহ, খাৎনা করা মহানবীর (স.) রীতি বা সুন্নত। যেহেতু বিষয়গুলো সন্তানের উপর ইহকালীন পরকালীন সমভাবে প্রভাবাধীন, সেহেতু পিতামাতার কাছে সন্তান এগুলো পাওয়ার অধিকার রাখে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত নবী করিম (র.) ইরশাদ করেন পিতামাতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমত তিনটি- জন্মের পরপরই তার জন্য উত্তম একটি নাম রাখতে হবে,

---

[৪২২] আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, অনুবাদ আবদুল কাদের, মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রীল ২০০০ খৃ.). পৃ. ১৪১-১৪২।

[৪২৩] জামউল ফাওয়ায়েদ ।

[৪২৪] জামে তিরমিযী ।

[৪২৫] আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, অনুবাদ আবদুল কাদের মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রীল' ২০০০ খৃ.) পৃ. ১৪৬।

[৪২৬] বুখারী ও মুসলীম শরীফ।

জ্ঞান বুদ্ধি বাড়লে তাকে কোরআন তথা ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে, সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রা.) বলেন:

"আকিকাহর সাহায্যে খুব সুন্দর ভাবে সন্তান জন্মের ও তার বংশ সম্পর্কে প্রচার হতে পারে। কেননা বংশ পরিচয়ের প্রচার একান্ত জরুরী। যেমন কেউ কারো বংশ সম্পর্কে অবাঞ্ছিত কথা বলতে না পারে। আর সন্তানের পিতার পক্ষে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তার সন্তান হওয়ার কথা চিৎকার করে বলে বেড়ানো ও কোন সুষ্ঠু ও ভদ্র পন্থা হতে পারে না। অত:পর আকিকার মাধ্যমেই এ কাজ করা অধিকতর সমীচীন বলে প্রমাণিত হল। এ ছাড়াও এর আরেকটি ফায়দা হচ্ছে এই যে, এতে করে সন্তানের পিতার উপরে বদান্যতা ও দানশীলতার ভাবধারা অনুসরণ প্রবল ও কার্পণ্যের ভাবধারা প্রশমিত হতে পারে"[৪২৭]।

জাহেরী মতের আলিমদের দৃষ্টিতে আকিকাহ করা ওয়াজিব। তবে অধিক সংখ্যক ইমাম ও মুজতাহিদের মতে তা করার সুন্নত। যদিও ইমাম আবু হানিফার (র.) মতে তা ফরজ ওয়াজিব ও নয়, আর সুন্নত ও নয়, বরং নফল- অতিরিক্ত সোয়াবের কাজ[৪২৮]।

৪. মাতৃস্তণ্য পান, আশ্রয় প্রতিপালন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রাপ্তির অধিকার:

আপন সন্তানকে দুধ পান করানো এটি মায়ের স্বভাবজাত দায়িত্ব। শিশুর জন্য যেমন মহা উপকারী পুষ্টিকর, মায়ের জন্য স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিদায়ক। জাতিসংঘ স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ দুই বছর মায়ের দুধ পান এবং শিশুকে শাল দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যে সব মহিলা তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার চাকচিক্যে প্রভাবিত হয়ে নিজের রূপ যৌবন ও কমনীয়তা, লাবন্য এবং যৌবন ধ্বংস হওয়ার আশংকায় সন্তানকে দুধ খাওয়ানো থেকে বঞ্চিত রাখে, তারা আসলে মা হয়েও মায়ের অন্তর ও মমতা থেকে বঞ্চিত। কোন দুধই শিশুর জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই। তাছাড়া দুগ্ধ পানের মধ্য দিয়ে মায়ের সাথে সন্তানের এক মহান হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। সেভাবেই সে বেড়ে উঠে। আল্লাহর রাসূল দুগ্ধ দানে অস্বীকার কারী মহিলাদের জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন:

---

[৪২৭] ইমাম গাজ্জালি (র.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ.১।

[৪২৮] মাও: আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪৪।

"অত:পর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হল। ইত্যবসরে কতিপয় মহিলাকে দেখলাম, যাদের বুকের ছাতি (স্তন) সাপ দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কোন মহিলা? বলা হল, তারা সে মহিলা যারা নিজের সন্তানকে নিজের দুধ পান করাতো না [৪২৯]।

তবে আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মায়েরা সন্তানদের অন্য নারীদের দুধ পান করাতেন। মায়ের স্বাস্থ্যহানী, মারাত্মক অসুস্থতার কারণে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। নিছক আনন্দ, রূপ-যৌবন ক্ষতির আশংকায় নয়। মহানবী (স.) দুগ্ধদানকারিনী মায়েদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন:

"এবং মুসলিম মহিলা যে নিজের সন্তানকে দুধের প্রথম ঢোক পান করায়, সে একটি মানুষের জীবন দানকারীর বরাবর সওয়াব পাবে"[৪৩০]। দুগ্ধদানকারিনীকে প্রিয় নবী (স.) সে মুজাহিদের সমমর্যাদা দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় অব্যহতভাবে পাহারারত। যদি সে মহিলা এ সময়ে মারা যায় সে শাহাদাতের সওয়াব পাবে।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হল:

"যে পিতামাতা সন্তানের স্তন্যপানকালে পুর্ণ করতে চান, তাদের জননীগণ সন্তানগণকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবেন[৪৩১]।

বস্তুত মায়ের দুধ শিশুর স্বভাবজাত প্রাকৃতিক খাদ্য। শারীরিক পূর্ণ সুস্থ্যতা ও বলিষ্ঠতা ছাড়া ও এটি আত্মিক ও নৈতিক খাদ্য বটে। মায়ের দুধ শিশুর অন্তর আবেগ অনুভূতির বিশেষ করে চরিত্রের উপর কঠিনভাবে প্রভাব ফেলে। মায়ের সাথে শিশুর যে অসাধারণ সম্পর্ক ও ভালবাসা সৃষ্টি হয় তা এ মাতৃদুগ্ধের কারণে হয়ে থাকে। "ইসলামী শরী'আত তথা (দাম্পত্য আইনে) দুধের ব্যাপারে শুধু গুরুত্ব স্বীকার করা হয়নি বরং তাকে এমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, তার ভিত্তিতে হালাল হারামের আইন প্রণীত হয়েছে[৪৩২]।

দুধ খাওয়ান শব্দটি বাঙলা, এর আরবী হল রাদায়াত। ইসলাম একে বংশের সমান শ্রদ্ধারযোগ্য মনে করে। যদি কোন শিশু কোন অপরিচিত মহিলির দুধ পান করে তাহলে সে

---

[৪২৯] আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৮।
[৪৩০] কানযুল উম্মাল।
[৪৩১] আল কোরআন সূরা বাকারা ২ : ২৩৩।
[৪৩২] মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

মহিলার সাথে তার দুধ মায়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঐ মহিলার স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও তার দুধ পিতা ও দুধ ভাই বোন হয়ে যায়। দুধের সম্পর্কিত কারণে যারা বিবাহ নিষিদ্ধ, অনুরূপ তারা ও নিষিদ্ধ। আল কোরআনের বাণী :

"এবং তোমাদের যে সব মা (তোমাদের জন্য হারাম) যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধে অংশীদার বোন সকল[৪৩৩]।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"আল্লাহপাক দুধ খাওয়ানোর কারণে সে সকল আত্নীয়কে হারাম করে দিয়েছেন, যাদেরকে নসবের কারণে হারাম করেছেন[৪৩৪]। হযরত উকবাহ ইব্‌ন হারিছ (রা.) এক মহিলাকে বিয়ে করলেন, বিয়ের পর একজন মহিলা আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের উভয়কেই দুধ পান করায়েছি। হযরত উকবাহ স্ত্রী বংশের লোকদের নিকট ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অবশেষে হযরত উকবাহ (রা.) প্রিয় নবী (স.) এর খিদমতে হাজির হয়ে ঘটনা খুলে বললেন। নবী করীম (স.) ঘটনা শুনে বললেন, এখন তোমরা কি করে এক সাথে থাকতে পার। হযরত উকবাহ (রা.) সেই মহিলাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং সে কোন পুরুষকে বিয়ে করে নিলেন" [৪৩৫]। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমাগত গবেষনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্রামগত নিকট আত্নীয় স্বজনদের মধ্যে পুন: পৌনিক বিবাহ সম্পাদিত হলে বংশধারায় নানাবিধ রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। যেমন যকৃত, ফুসফুস, অগ্নাশয় ও রক্ত সংক্রান্ত, Sickle cell, Anemia, Crysistic, fibrosis of the lung and pencreas, the lasmia (blood disease) phenyketonuria (a deficiency of an essential liver enzyme) ইত্যাদি রোগ, নিকট পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ হলে সন্তানদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে।

৫. পৃথক শয্যায় নিদ্রা যাওয়ার অধিকার:

প্রত্যেক শিশুরই পৃথক এবং একক শয্যায় নিদ্রা যাবার অধিকার আছে। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন: "সাত বছর বয়সে শিশুদেরকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও, ১০ বছর বয়স হয়ে

---

[৪৩৩] আল কোরআন সুরা নিসা ৪ : ২৩।

[৪৩৪] সহীহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ।

[৪৩৫] হাদীছ শরীফ বুখারী ও মুসলিম ফি কিতাবুন নিকাহ।

গেলে তাদেরকে নামাজ না পড়লে শাস্তি দাও এবং তাদের জন্য পৃথক পৃথক শয্যার ব্যবস্থা কর[৪৩৬]।

এ ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সকল সন্তানের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা করা অনেকের জন্য অসম্ভব। তবে আর্থিক সংগতি ও সাদিচ্ছার সাথে মিল রেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই উত্তম।

৬. যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ও ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার অধিকার :

বস্তুত সন্তানের প্রথম অধিকার হচ্ছে তার খানাপিনা, থাকা ও পোশাক- পরিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা বিশেষ করে যতদিন পর্যন্ত সে নিজস্বভাবে উপার্জন করতে অক্ষম থাকবে। নবী করীম (স.) বলেন "যাদের ভরন-পোষণের দায়িত্ব কারো উপর বর্তে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তারা বড় অপরাধী সাব্যস্ত হবে[৪৩৭]।

তিনি আরও ইরশাদ করেন: "যাদের খাওয়া পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে একাজই তার বড় গুনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট[৪৩৮]।

রাসূল (স.) পরিবারও সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যায়ের ফযীলত এভাবে বর্ণনা করেন যে,

"যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম অর্থ হচ্ছে সেটি, যা সে ব্যয় করে পরিবার বর্গের জন্যে, যা সে ব্যয় করে জিহাদের ঘোড়া সাজানোর জন্যে এবং যা সে ব্যয় করে জিহাদের পথে সঙ্গী সাথীদের জন্যে[৪৩৯]।

এ হাদীসে ধারাবাহিকভাবে অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে, প্রথমত সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। মানবতার বন্ধু মহানবী (স.) বলেন:

"যে লোক তার ছোট ছোট শিশু সন্তানদের জন্য এমন অর্থ ব্যয় করে, যাতে করে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন, তাদের বৈষয়িক উপকার দিবেন। সে লোক অপেক্ষা পুরস্কার পাওয়ার দিক দিয়ে অধিক অগ্রসর আর কেউ হতে পারে না[৪৪০]।

---

[৪৩৬] হাদীছটি মুসনাদ আহম্মদ আমর ইব্‌ন শুয়াইব তারপিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন।

[৪৩৭] মুসনাদ আহমদ আমর ইব্‌ন শোয়াইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ননা করেন।

[৪৩৮] বুখারী শরীফ।

[৪৩৯] মুসলীম শরীফ।

[৪৪০] নাসায়ী শরীফ।

এ ব্যাপারে অধিকাংশ মনীষীর মত এই যে, পুত্র সন্তানের পুর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্তই পূর্ণ বয়স্ক হওয়া এবং তাদের প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পত্তির অর্জিত হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পিতার উপরই অর্পিত থাকবে[৪৪১]। বিশ্বনবী (স.) সন্তানের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার কথা ও বলেছেন:

"নিজের সন্তানকে অন্যের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর ফেলে যাওয়ার চেয়ে অভাব মুক্ত রেখে যাওয়াই ভাল"[৪৪২]।

হযরত সা'য়াদ ইব্‌ন আবু ওক্কাচ (রা.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স.) আমাকে দেখবার জন্য আসলেন, এ সময়ে আমি মক্কায় অবস্থান করতেছিলাম। তিনি যে স্থান হতে হিজরত করে গিয়েছেন, সেই স্থানে মৃত্যুবরণ করাকে অপছন্দ করতেন। রাসূল (স.) বলেন আল্লাহ তা'আলা ইব্‌ন আফরাকে রহমত দান করুন। আমি বললাম হে রাসূল! আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ অসীয়ত করেছি। তিনি বলেলেন, না, আমি বললাম, তাহা হলে অর্ধেক? বললেন, না; বললাম, এক তৃতীয়াংশ, বললেন, হ্যাঁ; এক তৃতীয়াংশ করতে পার এবং ইহাকে অনেক। তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীগণকে সচ্ছল ও ধনশালী রেখে যেতে পার, তবে তাদেরকে নি:স্ব দরিদ্র ও লোকদেরকে জড়ায়ে ধরে ভিক্ষুক বানিয়ে রেখে যাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। আর তুমি যা কিছুই ব্যয় কর, তা সদকা হবে।এমন কি, যে খাদ্যমুষ্টি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তাও। আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাকে ভাল করে দেবেন। অত:পর তোমার দ্বারা বহু লোক উপকৃত হবে এবং অন্যান্য বহু লোক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই সময় হযরত সা'য়াদ ইব্‌ন ওক্কাচের একটি কন্যা ছাড়া আর কোন সন্তান ছিল না[৪৪৩]।

অতএব পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অন্যতম হক হচ্ছে সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এবং নিজ উপার্জনক্ষম হওয়া পর্যন্ত ব্যয়ভার ও যাবতীয় ভরন-পোষণের দায়িত্ব পালন করা। এটি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অন্যতম অধিকার।

---

[৪৪১] মুসলীম শরীফ, পরিবার পরিজনের জন্য অর্থ ব্যয়ের ফযীলত অধ্যায়।

[৪৪২] সুবুলুস সালাম, খ.৩, পৃ. ২২২।

[৪৪৩] বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ইব্‌ন মাজাহ, মাও. আব্দুর রহীম, হাদীছ শরীফ, খ.৩, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০০ খৃ.), পৃ.-২৪৪।

৭। ইসলামী জ্ঞান, চরিত্র ও বাস্তব মুখী শিক্ষা দানঃ

পিতামাতার উপর সর্বোত্তম ও গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে তারা তাদের সন্তানাদেরকে নৈতিক শিক্ষাদান করবেন। এমন শিক্ষা যা ইহকাল ও পরকালীন মুক্তি উপায় হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরও পরিবার পরিজনদের সুশিক্ষা ও ভাল অভ্যাসের সাহায্যে পরকালীন জাহান্নাম থেকে বাঁচাও"[৪৪৪]। আয়াতের আল্লাহ তা'আলার এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমরা আমাদের সন্তানদের দ্বীন ইসলাম ও সমস্ত কল্যাণময় জ্ঞান এবং অপরিহার্য ভাল চরিত্র শিক্ষা দেব[৪৪৫]।

হযরত আলী (রা.) এই আয়াতের প্রেক্ষিতে বলেন: তোমরা নিজেরা শেখো ও পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতিনীতি এবং তাদের সে কাজে অভ্যস্থ করে তোল[৪৪৬]।

এতএব আয়াতের অর্থ হল তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও নিজেদের কাজের সাহায্যে, আর তোমাদের পরিজনকে বাঁচাও তাদেরকে সৎ শিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়ে[৪৪৭]।শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মল্যবোধ সৃষ্টি পিতা-মাতার নৈতিক দায়িত্ব। তাদেরকে নামায রোজায় অভ্যস্থ করা, সৎ এবং চরিত্রবান করার প্রাথমিক দায়িত্ব মাতা-পিতার উপর। সন্তান যাতে মদ,নেশা ও বিবাহ বহির্ভুত যৌনকর্মে লিপ্ত না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও মাতা পিতার দায়িত্ব। নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করার দায়িত্ব পিতা-মাতার উপর[৪৪৮]।

বস্তুত যে সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত নয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামুলক নয় সেখানে পিতা-মাতাকে এ গুরু দায়িত্ব আরও বেশী করে পালন করতে হবে।

---

[৪৪৪] আলকুরআন, সুরা তাহরীম, ৬৬ : ৩।

[৪৪৫] তাফসীর মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান।

[৪৪৬] ইমামুল মুফাস্সিরীন ইব্ন জারীর তাবারী।

[৪৪৭] ফতহুল কাদীর খ.৫, পৃ. ২৪৬।

[৪৪৮] আবদেল রহীম উমরান, অনুবাদ শামছুল আলম, ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, (জাতসিংঘ জনসংখ্যা তহবিল, ডিসেম্বর ১৯৯৫ খৃ.) পৃ. ৫৪ ,।

হযরত লোকমান (আ.) তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেন:" হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম কর। সৎ কর্মের নির্দেশ দাও, অসৎ কর্মে নিষেধ কর এবং বিপদে-আপদে ধৈয্য ধারণ কর। এটাই দৃঢ় সংকল্পপূর্ণ হৃদয়ের কাজ[৪৪৯]।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন: "সন্তানের সুন্দর আচরণ ভিন্ন পিতামাতার পক্ষে সন্তানের জন্য রেখে যাওয়ার মত উত্তম আর কিছুই নেই[৪৫০]। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পিতা-মাতা সন্তানদেরকে নৈতিক চরিত্র গঠনমুলক শিক্ষা যথা- তাওহীদ, রেসালাত আখেরাতের পাশাপাশি প্রার্থীব জীবনে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা, শারীরিক সুস্থ্যতা ও সামাজিক জীবনকে সুশৃংখল করার জন্য বাস্তব ও যুগোপযোগী শিক্ষা দান। এমন ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যা বাস্তবমুখী কর্মকান্ড পরিচালনায় সক্ষম এবং ব্যক্তিকেন্দ্রীক মুক্ষাপেক্ষীহীন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন: যে সন্তানই জন্মগ্রহণ করে তার জন্ম হয় স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম ও ভাবধারার ভিত্তিতে । পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, বানায় খৃষ্টান, কিংবা অগ্নিপূজক। ইহা সঠিক তেমন, যেমন চতুস্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত কোন অঙ্গহানী বা কর্তিত দেখতে পাও? অত:পর আবু হোরায়রা (রা.) বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে পড়; সৃষ্টি ব্যবস্থা ও ভাবধারা, যার উপর ভিত্তি করে আলাহ তা'আলা মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোনরূপ পরিবর্তন নেই[৪৫১]।

এতএব পিতা-মাতাকে সন্তানদের আদর্শ চরিত্রবান ও কর্মমুখী করে গড়ে তোলার জন্য নৈতিক ও বাস্তব শিক্ষা দান করার ব্যাপারে বলিষ্ঠ ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

ইসলাম একটি পরিপুর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আংশিক জ্ঞানার্জন পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জশীল হতে পারেনা। মহানবী (সা.) যেমন ইরশাদ করেন:"পিতা-মাতা হতে সন্তানের অধিকার হলো তাঁরা সন্তানকে লিখতে শিক্ষা দেবে, সাঁতার শিক্ষা দেবে এবং তীরন্দাজ হতে শিক্ষা দেবে, তাঁরা এমন কিছু শিক্ষা দেবেনা যা সন্তানকে ন্যায়নিষ্ঠ করেনা[৪৫২]।

তীরন্দাজ বাহিনী তখনকার প্রেক্ষাপটে অত্যাধুনিক সাহসী সুকৌশলী, সুনিপণ সামরীক ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান যুগে তার অর্থ হবে আত্মরক্ষার সর্বাধুনিক সামরীক প্রশিক্ষণ, যা যুগের সাথে

---

[৪৪৯] আল কুরআন, সুরা- লোকমান ৩১ : ১৭।

[৪৫০] হযরত কাতাদাহ ইব্ন মুজাহিদ ।

[৪৫১] মুসলীম শরীফ বাবু ফি হুকুকুল ওয়ালিদু আলাল ওলাদি ও তারবিয়াতু, মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীছ শরীফ, খ.৩।

[৪৫২] বায়হাকী ফি কিতাবুল ইলম।

সামঞ্জস্যশীল। সাতার হলো সাগর-মহাসাগর পাড়ি দেয়া নাবিকদের একমাত্র আত্মরক্ষামূলক শারীরিক সর্বোত্তম ব্যায়াম । অতএব মহানবী (স.) পিতা-মাতাকে তার আদরের সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। বস্তুত মহানবী (স.) এর জীবনাদর্শ সর্বযুগের সকল গোত্র ও বর্ণের মানুষের জন্য এক মহান পাথেয়।

৮.সন্তানের ব্যাপারে পিতা-মাতাকে অহংকারমুক্ত থাকতে হবেঃ

আল্লাহর বাণী, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে"[৪৫৩]। "এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে"[৪৫৪]। "সেই সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম হতে ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে; যেদিন তাদের অন্তরদৃষ্টি ভীতি- বিহবল হয়ে পড়ে"[৪৫৫]। "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা, তোমাদের জন্য আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার"[৪৫৬]। "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে মৃত্য কাল পর্যন্ত"[৪৫৭]। নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজী, গবাদী পশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুন্দর করা হয়েছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু, আর আল্লাহ তা'আলা, তার নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল[৪৫৮]।

তোমরা জেনে রাখ, প্রার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁক-জমক, পারস্পরিক অহংকার ও ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্ধারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার অবিশ্বাসীদেরকে চমৎকৃত করে, অত:পর উহা শুকিয়ে যায়।

---

[৪৫৩] আলকুরআন, সুরা আল মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯২।

[৪৫৪] আল করআন গুরা আল মুনাফিকুন, ৬৩ : ২৮।

[৪৫৫] আলকুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩৭।

[৪৫৬] আলকুরআন, সুরা আত্ তাগাবুন, ৬৪ :১৫।

[৪৫৭] আলকুরআন, সুরা আত্ তাকাছুর, ১০২ : ১-২।

[৪৫৮] আল কুরআন সুরা আল - ইমরান, ০৩ : ১৪।

ফলে তুমি পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে উহা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়[৪৫৯]। এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে[৪৬০]। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকর্ম, যার ফল স্থায়ী উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরুস্কার প্রপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং করুণা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ঠ[৪৬১]।

মহগ্রন্থ আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা সন্তান-সন্ততি, নারী ও প্রার্থিব ধন-সম্পদকে একটি পরীক্ষার বস্তু হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রার্থীব জীবনের এই ধন-সম্পদ নিয়েই মানুষ অহংকারে মেতে উঠে। বস্তুত পার্থিব ক্ষণস্থায়ী অহংকারের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে কঠিন জওয়াব দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অহংকারীকে পছন্দ করেননা। মানুষ স্বাভাবত সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পরিজনের মোহে আল্লাহকে ভূলে যায় ও তাদের সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতার কাছে সন্তান-সন্ততির অন্যতম দাবী বা হক হল তাদের ব্যাপারে পিতা-মাতার অহংকারমুক্ত জীবন।

৯. লিঙ্গভেদে সমব্যবহার পাওয়ার অধিকার:

নারী-পুরুষ ও বয়সের প্রার্থক্য সৃষ্টি না করে প্রত্যেক সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সমান দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামী দাম্পত্য আইনে পুরুষ ও নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কাছে কোন প্রার্থক্য নেই। বিশ্বব্যাপী সাম্য-মৈত্রীর মূল নায়ক মহানবী (স.) ইরশাদ করেন:

"তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করো, যেমন তোমরা তোমাদের সংগে আচরণে ও ইনসাফ কামনা করে থেকো[৪৬২]। শিক্ষা দিক্ষা সভ্যতায় কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের মধ্যে সুবিচার ও সমতা রক্ষা করতে হবে। কেউ এস.এস.সি পাশ করবে, কেউ এম,এ পাশ করবে এটি সমতা নয়। প্রাক ইসলামী যুগে কন্যা সন্তান হত্যা করা হত। নারীর প্রতি ঘৃনা অবজ্ঞা

---

[৪৫৯] আলকুরআন, সুরা আল হাদিদ, ৫৭ : ২০ ।

[৪৬০] আলকুরআন, সুরা আল আনফাল, ৮ : ২৮।

[৪৬১] আলকুরআন, সুরা আল কাহাফ, ১৮ : ৪৬।

[৪৬২] আল্লামা সুয়ুতী ।

এত চরমে পৌছল যে, কোন ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে সে সেটিকে অলক্ষণে মনে করে পরিত্যাগ করত"[৪৬৩]।

"তাদেরকে জীবন্ত দাফন করতো। কন্যা সন্তানের জন্মের সংবাদে তাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে যেত"[৪৬৪]।

Encyclopadia of Biblica:-

The right of inharitance among the Israelites belong only to angates.......only sons, not daughter's still less wife can herit.

"উত্তরাধিকারী লাভের অধিকারী ছিল কেবল পুত্ররা; কন্যাদের তাতে কোন অধিকার ছিলনা, স্ত্রীর কোন অধিকার ছিলনা"[৪৬৫]।

আল্লাহর ঘোষণা: "পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং নারীর ও অংশ আছে, উহা অল্প হউক অথবা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ"[৪৬৬]।

মহানবী (সা.) এর বাণী: হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবী (সা.) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর শিশুপুত্র তার নিকট এলো। উক্ত সাহাবী তাকে চুম্বন করলেন এবং কোলে বসালেন। একটু পরে তাঁর কন্যা এলো। তাকে তিনি তাঁর সন্মুখে বসালেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) খুশী হলেন না এবং সাহাবীকে বললেন তোমার কি উচিত ছিল না দুজনের প্রতি সম আচরণ করা[৪৬৭]।

বশির ইব্ন সা'য়াদুল আনসারীর স্ত্রী তার পুত্র নু'মান ইব্ন বশিরের জন্য তাঁর কাছে বিশেষ ধন-মাল যেমন বাগান ও ক্রীতদাস দেবার জন্য দাবী করে ও এই দলকে সুদৃঢ় করিয়ে দেবার ইচ্ছা করে। আর এজন্যে এই দানের উপর রাসুলে করীম (সা.) কে সাক্ষী বানাবারও দাবী জানায়। হযরত বশীর তখন নবী করীম (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন:

হে রাসূল! অমুক মেয়ে আমার কাছে দাবী করছে যে, আমি তার পুত্রকে আমার ক্রীতদাস দিয়ে দেব। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: তার কি আরও ভাই-বোন আছে?

---

[৪৬৩] সাইয়েদ জালাল উদ্দিন উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬।

[৪৬৪] আলকুরআন, সুরা আল মু'মেনুন ২৩ : ১৭।

[৪৬৫] Encyclopadia of biblica, biblica law justice, গাজী শামছুর রহমান, ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ, (ঢাকা: ইসলামীক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ খৃ.), পৃ.৩০৭।

[৪৬৬] আল কুরআন সুরা আন নিসা, ৪ : ৭।

[৪৬৭] আল বাজ্জার।

বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন তাহলে তাদের প্রত্যেককেই কি এরকম দেবে? বললেন না।' তখন নবী করীম (সা.) বললেন: 'তাহলে তা কিছুতেই ভাল হবেনা। আর আমি তো সত্য ও সুবিচার ছাড়া অন্য কিছুতেই সাক্ষী হতে পারবোনা'[৪৬৮]। অপর বর্ণনায় রাসুলের কথার শেষাংশ: আমাকে তুমি অবিচার ও হুকুমের স্বাক্ষী বানাবেনা। তোমার পুত্রদের যে অধিকার তোমার উপর রয়েছে, তার মধ্যে এও একটি যে, তুমি তাদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ বন্টন করবে। যেমন তোমার অধিকার রয়েছে তাদের উপর এবং এই যে, তারা তোমার খেদমত করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচার করবে[৪৬৯]। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন: যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, আর সে তাকে জ্যান্ত (জাহেলী যুগের মত) কবরস্থ করেনি কিংবা তার সাথে লাঞ্চনাকর আচরণ করেনি তাহকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন[৪৭০]।

দান-দক্ষিণা, আদর স্নেহ বাৎসল্য, সম্পত্তির ভাগাভাগিতে কন্যা পুত্রে বা পুত্রে অসামাঞ্জস্য আচরণ করা যাবেনা, কাউকে কম বেশী করার মাধ্যমে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের সুত্রপাত হয়। আস্তে আস্তে পরিবার ও সামাজিক বিশৃংখলায় রূপ নেয়। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: সন্তানদের মধ্যে ধন বন্টনে পার্থক্য করা যায় যদি তাতে বাস্তবিকই কোন কারণ থাকে। যেমন দুর্বিপাকে পড়ে যায়[৪৭১]। আলমুগনী গ্রন্থের ভাষ্য মতে অন্ধত্ব, একাধিক সন্তান জ্ঞান অর্জনে ব্রতী, ভাল-খারাপ এ সকল ভিত্তিতে কমবেশী করা যায়। বেশী করাতে ইমাম আহমদের মতে জায়েয হবে। এক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ করা ও জায়েয। তবে বিনা প্রয়োজনে কম-বেশী করা মাকরুহে তানযিহী।

অতএব পিতা-মতাকে তার সন্তানদের প্রতি সমব্যবহার, সমবন্টনও সমঅধিকার প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষ কোন কারণ ছাড়া এ ক্ষেত্রে কম-বেশী করা সম্পূর্ণ অবৈধ। মহানবী (সা.) বলেন- তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার করো। তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা সংস্থাপন কর। তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝেই ইনসাফ রক্ষা কর[৪৭২]।

---

[৪৬৮] মুসলীম, ইব্‌ন আহমদ, আবুদাউদ।

[৪৬৯] বুখারী ও মুসলীম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ।

[৪৭০] আবুদাউদ, কিতাবুল আদাব, ফি ফদলে মান আলা ইয়াতামা, মুসতারিক হাকিম, খ.৪, পৃ. ১৭৭।

[৪৭১] আল্লামা ইউসুফ আল্ কারযাভী, অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামে হালাল হারামের বিধান, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জানু. ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ৩০১।

[৪৭২] মুসনাদ আহমদ, আবুদাউদ, নিসায়ী।

বস্তুত সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব, আর বেশী কম করা হারাম[৪৭৩]।

১০ বৈধ আয় থেকে লালিত - পালিত হওয়ার অধিকার:

আল্লাহ তা'আলার রাসূল (স:) নির্দেশ দিয়েছেন যে, বৈধ সম্পদ হতে সন্তান প্রতিপালন করতে হবে। অবৈধ আয় যথা ঘুষ, চুরি, সুদ, প্রতারণা, অসৎকর্ম, নেশা, জুয়া ইত্যাদি প্রকারের অর্থ উপার্জন সন্তান প্রতিপালনের বিধান ইসলামে নেই। এধরণের অপকর্মের জন্য সন্তানের কোন দায়িত্ব নেই[৪৭৪]।

একটি পরিবার গড়ে তুলতে হলে পিতা-মাতাকে গুণেগুণে তালিকা করে কয়েকটি দায়িত্ব পালন করলে হবে না। পরিবার প্রতিপালনের সার্বিক দায়িত্ব পিতা-মাতার।

'তোমাদেও প্রত্যেকেই একএকজন দায়িত্বশীল। তোমরা সকলেই ব্যক্তিগতভাবে অধীনস্থদের জন্য দায়ী হবে। পিতা তার সংসারের সকলের জন্য দায়ী এবং তার আওতাধীন যারা আছে তাদের সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের জন্য দায়ী। তার সংসারের সকলের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে[৪৭৫]।

হযরত লুকমান (আ.) তার স্বীয় পুত্রকে প্রদত্ত নসীহত:

১. "হে প্রিয় পুত্র, আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্‌ক করবেনা, কেননা শির্‌ক হচ্ছে অত্যন্ত বড় জুলুম।

২. হে পুত্র, অনু পরিমাণ শির্‌কও যদি কোন জিনিসে ও যদি কোন প্রস্তরের অভ্যন্তরে কিংবা আসমান যমীনের কোন এক নিভৃত কোণেও লুকিয়ে থাকে, তবু ও আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই এনে হাযির করবেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা বড়ই সুক্ষদর্শী, গোপন জিনিস সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল[৪৭৬]।

৩. হে পুত্র, নামায কায়েম কর,

---

[৪৭৩] নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ১১২।

[৪৭৪] আবদেল রহীম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

[৪৭৫] বুখারী মুসলীম, হযরত ইব্‌ন উমর (রা.)হতে বর্ণিত।

[৪৭৬] আলকুরআন, সুরা লুকমান, ৩১ : ১৪।

আল্লাহর বাণী:

"এবং তোমার পরিবারবর্গ ও সন্তান সন্ততিদের নামায পড়ার জন্য আদেশ করো এবং তা রীতিমত আদায় করায় তাদের অভ্যস্থ করে তোল"[৪৭৭]। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের সন্তান সন্ততিদের নামায পড়তে আদেশ কর যখন তারা সাত বছর বয়সে পৌছবে এবং নামাযের জন্যই তাদের মারধোর কর, শাসন কর যখন তারা দশ বছর বয়স্ক। আর তখন তাদের জন্যে আলাদা আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করা ও কর্তব্য[৪৭৮]।

(৪) এবং ভাল কাজের আদেশ কর আর অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখ।

(৫) যা কিছু দু:খ কষ্ট লাঞ্ছনা আসবে একাজে তা সব উদারভাবে বরদাশ্ত করো, কেননা এমন কাজ, যা সম্পন্ন করার একান্তই জরুরী ও অপরিহার্য।

(৬) লোকদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করোনা। অহংকার ভরে ঘৃনা করে লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না।

(৭) যমীনের উপর গৌরব অহংকার করে চলাফেরা করোনা, কেননা আল্লাহ তা'আলা যে কোন অহংকারীকে মোটেই পছন্দ করেননা, তাতে সন্দেহ নেই।

(৮) মধ্যম নীতি অবলম্বন করে মাঝামাঝি ধরণের চালচলন অবলম্বন কর। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ও সাধারণ জীবন যাপন ও চলাফেরার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(৯) তোমার কণ্ঠ ধ্বনী নিচু কর, সংযত ও নরম কর, কেননা সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে গর্দবের কর্কশ আওয়াজ। বস্তত চিৎকার করা, চিৎকার করে কথা বলা শালীনতা বিরোধী, সাধারণ সভ্যতা ও সভ্য সমতাজে এধরণের আচরণ অপছন্দনীয়।

হযরত লুকমান (আ.) স্বীয় পুত্রকে নয়টি নসীহত করেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোন পিতামাতা ও যদি এ নসীহতের আলোকে নিজ সন্তান সন্ততিকে তৈরী করতে পারেন, যা সময়োপযোগী একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে গন্য হবে। একটি সন্তানের জন্য পিতামাতার কতধরণের দায়িত্ব হতে পারে, তার কিছু কিছু দিক এ যাবত (১-১০) আলোচনা করা হয়েছে। দায়িত্ব শুরু হয় গর্ভধারণের

---

[৪৭৭] আলকুরআন, সুরা তাওবা, ৯ :১৩২ ।

[৪৭৮] আবুদাউদ শরীফ।

পূর্ব হতে এমনকি বিবাহে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে, সন্তানকে সময়োপযোগী সর্বোচ্চ শিক্ষিত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত। নিম্নে মানুষের একটি জীবন চক্র দেয়া হল:

মানব জীবন চক্র:

উন্নয়নের স্তর (Pase of develofment)	অবস্থান্তর প্রাপ্তি (Transitional event)
গর্ভপূর্ব অবস্থা	গর্ভধারণ
ভ্রুন জীবন	জন্ম
স্তন্যপান	দুধ ছড়ানো
মক্তব/মাদরাসা/বিদ্যালয় পূর্ব বয়স	বিদ্যালয়ে ভর্তি
বিদ্যালয়ের বয়স	কৈশর
পূর্ণ যৌবন	সন্তান উৎপাদন
সন্তান উৎপাদন	প্রাক বার্ধক্য
বার্ধক্য	মৃত্যু

শিশু সর্ম্পকে বাংলাদেশের আইন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে নিম্নবর্ণিত বিধান বিধৃত:

“২৮(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরীকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেনা।

২. রাষ্ট্র ও গনজীবনের সর্বস্তরের নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

৩. কেবল র্ধম, গোষ্ঠী, বর্ণ, পুরুষভেদে বা জন্মস্তানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবেনা।

৪. নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরীকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রনয়ণ এই অনুচ্ছেদে কোন কিছুই নিবৃত করবেনা।

৫. বাংলাদেশের দন্ডবিধিতে বলা হয়েছে যে, সাত বছরের নীচে যে শিশুর বয়স; সে কোন অপরাধী হতে পারেনা (৮২ধারা) সাত বছর থেকে ১২ বছরের মধ্যে যে শিশুর বয়স, তার মাথায়

যদি যথেষ্ট বুদ্ধি হয়ে থাকে তবে তার অন্যায় কাজকে অপরাধ বলা যাবে (৮৩ ধারা) কিন্তু রেলওয়ে আইনের ১৩০ ধারায় এই দায় হতে মুক্তি দেওয়া হয়নি। দন্ডবিধির ৮৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ক্ষতি করলে ও এতে কোন অপরাধ হবেনা:

(ক) বার বছরের কম বয়স্ক বা উন্মাদ ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য যদি উহা করা হয়, এবং

(খ) যদি উহা উক্ত ব্যক্তিদের অভিভাবক ব আইনানুগ তত্ত্বাবধায়নকারীর প্রাকাশ্য বা পরোক্ষ সম্মতিক্রমে করা হয়, এবং

(গ) যদি উহা সৎ বিশ্বাসে করা হয়, তবে ইচ্ছাকৃত হত্যার প্রচেষ্টা এই ব্যতিক্রমে পড়ে না এবং মৃত্যু ঘটাতে পারে জেনে উহা করলে তাও এই ব্যতিক্রমে আসবেনা। কিন্তু

(চ) উহা যদি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত বা গুরুতর পীড়া নিবারণ করার জন্য হয় তবে উহা এই ব্যতিক্রমের মধ্যে আসবে, এবং

(ছ) গুরুতর আঘাত বা গুরুতর আঘাতের প্রচেষ্টা এই ব্যতিক্রমে আসবে না,

(জ) উহা যদি গুরুতর আঘাত বা মৃত্যু বা গুরুতর পীড়া বা অন্য কোন প্রকার কষ্ট নিবারণের জন্য করা হয় তবে উহা এই ব্যতিক্রমের মধ্যে আসবে, এবং যে অপরাধের প্রতি এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য নহে সেই অপরাধের সহায়তার প্রতি এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য নয়। দন্ডবিধির ১০ ধারায় বলা হয়েছে যে, ১২ বছরের কম বয়সের শিশুর প্রদত্ত সম্মতিকে আইনগত সম্মতি বলা যায়না।

৩৬১ ধারায় বলা হয়েছে, ১৪ বছরের কম বয়স্ক বালককে এবং ১৬ বছরের কম বয়স্ক বালিকাকে জোর করে বা প্রলুব্ধ করে স্থানান্তরে নেওয়া অপরাধী। ৩৬৪ ক ধারায় দশ বছর হতে কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে খুন গুরুতর আঘাত। দাসত্ব এবং কাম লালসার শিকারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে হরণ বা অপহরণে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শাস্তির পরিমাণ হচ্ছে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবাজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ড অথবা অনুর্ধ্ব চৌদ্দ বছরের কারাদন্ড। শাস্তি সাত বছরের কম কারাদন্ড হতে পারেনা।

৩৬৬ ক ধারায় বলা হয়েছে, আঠার বছর যে মেয়ের বয়স হয়নি, সেই অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার অভিপ্রায়ে বা সম্ভাবনা জেনে তাকে নিয়ে কোন স্থান হতে গমন করা বা তাকে অন্য কোন কাজ করার প্রলোভন দেখান এই ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তির অপরাধ অনুর্ধ্ব দশ বছর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

বাংলাদেশে অমুসলিমদের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তালাক আইন (Divorce act ১৮৬৯) প্রচলিত আছে। স্বামী স্ত্রী যখন দাম্পত্য কলহে লিপ্ত হয় তখন শিশুর লালন-পালন, তত্ত্বাবধান, ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার জন্য আদালত নির্দেশ দিতে পারেন। ফৌজদারি কার্যবিধি (code of criminal proceedure 1898) ম্যাজিস্ট্রেটকে শিশু বিষয়ে কিছু ক্ষমতা দিয়েছে। তিনি পিতাকে তার ঔরসজাত শিশুকে ভরণ-পোষণের আদেশ দিতে পারেন (৪৮৮ ধারা)। ২১ বছরের নীচে যার বয়স, এমন প্রথম বারের অপরাধীকে তিনি মুক্তি দিতে পারেন (৫৬২ ধারা)। দেওয়ানী কার্যবিধিতে (code of civile proceedure 1908) বলা হয়েছে যে, নাবালেগ। অভিভাবক মামলা করতে পারে বা মামলায় আত্মরক্ষা করতে পারে।

তামাদি আইনে বলা হয়েছে (limitation act 1908), নাবালেগ থাকা অবস্থায় মামলার কারণের উদ্ভব হলে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে পারে। খনি আইনে (Mines act-1923) বলা হয়েছে যে, পনের বছর কম বয়সের শিশুকে মাটির নীচে কাজে লাগানো যাবেনা। শিশু বিবাহ নিরোধ আইনে বলা হয়েছে যে, ১৫ বছরের শিশু বিবাহ আইনে দন্ডযোগ্য অপরাধ। বেশ্যাবৃত্তি নিরোধ আইনে (Suppresion of immoral traffic act 1998) বলা হয়েছে, ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়ে যাওয়া দন্ড যোগ্য অপরাধ।

শিশুর শ্রম আইনে (The Children pledgeing of labour Act 1998) বলা হয়েছে যে, পনের বছরের কম বয়সের শিশুকে কাজে লাগানো যাবেনা। শিশুকে কর্মে নিয়োগের আইনে পনের বছর কম বয়সের শিশুকে শ্রমে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাতৃকল্যাণ আইনে (Matornity benifit act, 1939) বলা হয়েছে যে, শিশু প্রসবের ছয় সপ্তাহ আগে এবং পরে মাকে কোন কাজে লাগানো যাবেনা। দোকান আইনে (Shops and Estt Act, 1965) বলা হয়েছে যে, চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুকে দোকান প্রভৃতিতে কাজে লাগানো যাবেনা। পরিত্যক্ত শিশু আদেশে (Abandoned Children order, 1972) বলা হয়েছে যে, শিশুকে দত্তক গ্রহণ করা যাবে। ১৯৭৪ সালে শিশু আইনে (The Children Act, 1974) শিশুদের সার্বিক কল্যাণের ব্যবস্থা হয়েছে। শিশু অপরাধীদের সংস্কারের ব্যবস্থা এই আইনে বিদ্যমান[৪৭৯]।

---

[৪৭৯] গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭ ৩৪২।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অধিকার:

মানুষের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে তার সৃষ্টি কর্তার নির্দেশ পালন করা। আল্লাহ ও রাসুলের পরেই মানুষের উপর সবচাইতে বড় অধিকার হল মাতা-পিতার অধিকার। সন্তানের কাছে সর্বাধিক সেবা যত্ন পাবার অধিকারী হলেন তাদের মা ও বাপ। পিতা-মাতার সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীছ গ্রন্থ সমুহে মাতা-পিতার অধিকার নিয়ে বিশদ আলোচনা এসেছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে: আদেশ বা ফয়সালা করে দিয়েছেন তোমাদের প্রভূ যে, তোমরা কেবল মাত্র তার ছাড়া কারো ইবাদত করবেনা। পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমার নিকট যদি তাদের কোন একজন বা দুজনই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তাদের 'উহ' পর্যন্ত বলবে না। তাদের ভৎসনা/তিরস্কার করবেনা। বিশেষ সম্মানের সাথে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। তাদের সম্মুখে নম্র ও বিনয়াবনত থাকবে। আর তাদের জন্যে দোয়া করতে থাকবে। প্রভু তাদের প্রতি রহম করো, যেমনি করে তারা বাল্যকালে আমাকে পরম স্নেহ মমত্ববোধের সাথে পালন করেছেন[৪৮০]।

উক্ত আয়াতে প্রথমত তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে, পরবর্তীতে পিতা-মাতার প্রতি সময়ভেদে কি আচরণ করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। বস্তুত মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসুলের পরপরই পিতা-মাতার অবস্থান ঠিক করে দেয়া হয়েছে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখায় ড. আব্দুল আজীজ কামেল মাতা-পিতার প্রতি নিম্নোক্ত অধিকার সমূহ বর্ণনা করেন :

(১) তাদের সন্তান- সন্ততি কর্তৃক শ্রদ্ধাভাবে সম্বোধন করতে হবে। কোন প্রকার বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞাসূচক শব্দ উচ্চারণ করা যাবেনা। নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে।

(২) তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। তাদেরকে ধমক দেয়া যাবেনা এবং তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে পরিত্যাগ করা যাবেনা।

(৩) পিতা-মাতার প্রতি নম্র ভদ্র, আনুগত্য এবং অবনতভাবে আচরণ করতে হবে।

---

[৪৮০] আলকুরআন, সুরা বনী ইসরাইল ১৭ : ২৪।

(৪) পিতা-মাতার প্রতি শুধুমাত্র নম্রভাবে আচরণ করলেই চলবে না, তাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে মোনাজাত করতে হবে। এই মোনাজাতের মধ্যে তারা শিশুকালে সন্তানের প্রতি যেমন স্নেহ মমতা প্রদর্শন করেছিল তার স্বীকৃতি এবং কৃতজ্ঞতা বোধ থাকতে হবে। আর এই মোনাজাত শুধু একবার, দুবার করলে হবে না, বারবার করতে হবে এবং প্রতিদিন নামাজের পর করতে হবে। হবে। এই মোনাজাতের মাধ্যমে পিতা-মাতার প্রতি অধিকতর দায়িত্ব সচেতন হবে হবে[৪৮১]।

এই আয়াতে পিতা-মাতার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তার পরিস্কার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সাইদ ইব্‌ন মুসাইব বলেছেন, পিতা-মাতার সাথে কথা বল এমন ভাবে "যেমন করে অপরাধী ক্রীতদাস কথা বলে রূঢ়ভাষী মনিবের সঙ্গে।"

মুজাহিদ বলেছেন: "পিতামাতা তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌছালে তাদেরকে ময়লার মধ্যে ফেলে রাখবেনা এবং যখন তাদের পায়খানা পেশাব সাফ করবে তখনো তাদের প্রতি কোনরূপ ক্ষোভ দেখাবেনা। অপমানকর কথা বলবে না, যেমন করে তারা তোমার শিশু অবস্থায় তোমার পেশাব পায়খানা সাফ করত, ঠিক তেমনি দরদ দিয়ে করবে। আলাহ তা'আলার ঘোষণা হল "আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর কোন কিছুকেই তার সাথে শরীক করবে না। পিতামাতার প্রতি স্নেহপূর্ণ সৎ ব্যবহার কর"[৪৮২]। এখানে এহসান শব্দের অর্থ হল: সৎ, সুন্দর, প্রেমময় ও কোমল আচরণ, উপকার ইত্যাদি। সুরা বাকারায় বলা হয়েছে "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবেনা বা পুজা অর্চণা করবেনা এবং পিতা মাতার সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার করবে"[৪৮৩]।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরও ইরশাদ করেন: "মানুষকে সাধারণত তাদের পিতা মাতার সাথে ইহসান করতে নির্দেশ দিয়েছি[৪৮৪]। এখানে ইহসান শব্দের অর্থ চরম পর্যায়ে ও পরম মানের সর্বোত্তম ভাল কাজ করা, ভাল ব্যবহার করা। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে"এবং আমরা সাধারণত সব মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তাদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার "[৪৮৫]। কেননা তাদের মায়েরা খুবই কষ্ট সহকারে তাদের গর্ভে ধারণ করেছে এবং আরো কষ্ট সহকারে

---

[৪৮১] Abdul Aziz kamel AL Onlmouma, Fil islam, Conference proceeding, p p.84-109.

[৪৮২] আলকুর আন, সুরা নিসা ৪ : ৩৬।

[৪৮৩] আলকুর আন, সুরা বাকারা ২ : ৮৬।

[৪৮৪] আল কুরআন, সুরা আনকাবুত ২৯ : ০৮।

[৪৮৫] মাও: আবুদর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

তাদের প্রসব করেছে[৪৮৬]। এবং মানুষকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি তাদের পিতা-মাতা সম্পর্কে বিশেষ করে তাদের মায়েরা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাদের গর্ভে ধারণ করেছে ও বহন করেছে। আর দু'বছর তাদের স্তন দিয়ে দুধ খাওয়ানোর কাজ সম্পন্ন করেছে। এতএব তুমি আমার ও তোমাদের পিতা-মাতার শোকর আদায়ে সকলেকেই ফিরে আসতে হবে চুড়ান্ত পরিণতির জন্য"[৪৮৭]। তাদের মৃর্ত্যুর পর কেমন আচরণ করতে হবে এ প্রসঙ্গে নির্দেশ হচ্ছে"বল, হে আল্লাহ পরওয়ার দিগার, আমার পিতামাতার প্রতি রহমত নাযিল কর। যেমন করে তারা দুজনে আমাকে আমার ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছে"[৪৮৮]। অর্থ্যাৎ তাদের ইন্তেকালের পর তাদের জন্য এভাবে সাঁবক্ষণিক দোয়া করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেন: তোমাদের আল্লাহ তোমাদের মনের অবস্থা ও ভাবধারা সম্পর্কে খুব ভাল ও সবচেয়ে বেশী অবহিত রয়েছেন। তোমরা যদি হক আদায়কারী হও, তবে হক আদায়কারী লোকদের ক্ষমা করে দেবেন"[৪৮৯]। অতীতে যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। অভাব অনটনে রোগে অসুস্থতায় পরিবারের এক সদস্য আর একজনের কাছে এসে দাড়াত। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের ফলে পরিবার হয়ে যাচ্ছে ছোট, সন্তান সন্ততি পিতা-মাতার প্রতি উদাসীন হয়ে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়। বার্ধক্যে মা বাবা সঙ্গহীন হয়ে উঠেছে, সন্তাত সন্ততি বা পৌত্রীদের সান্নিধ্য পায়না। বাধ্য হয়ে অনেককে বয়স্কদের আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হয়। বেতনভুক্ত সেবক সেবিকাদের সেবা কখনো সন্তান-সন্ততির স্নেহময় সেবার বিকল্প হতে পারেনা। ইসলাম মানব সমাজের এই চিরন্তন সমস্যার সমাধান পারিবারিক পর্যায়ে করতে চেয়েছে। একটি শিশু তার শিশুকালে যেরূপ পথে প্রতিপালিত হয়ে বয়স্কদের ও তাদের সন্তানদের থেকে সেরূপ আদর যত্ন পাবার স্বাভাবিক এবং মানবিক অধিকার আছে[৪৯০]।

বস্তুত পিতা মাতা যদি ভিন্ন ধর্মী এবং সন্তানদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান, তাহলে পিতা-মাতার সেইরূপ আল্লাহদ্রোহী নির্দেশ পালন করতে বাধ্য নয়। কিন্তু পিতা-মাতা ভিন্ন ধর্মী হলেও তাদের সংগে কোনদিন রূঢ় ব্যবহার করতে পারবেনা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা হল: "যদি পিতা-মাতা আমার সংগে শরীক করতে তোমার উপর জোর জবরদস্তি করে,

---

[৪৮৬] আল কুরআন, সুরা আহকাফ ৪৬ : ১৫।
[৪৮৭] আলকুর আন, সুরা লুকমান ৩১ : ১৪।
[৪৮৮] আল কুরআন, বনী ইসরাঈল ১৭ : ২৪।
[৪৮৯] আল কুরআন, সূরা ইসরায়া ১৭ : ২৫।

যে বিষয়ে তোমার দোষ নেই সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মানবে না কিন্তু এই জীবনে তাদের সংগে বিনম্রভাবে বসবাস করবে এবং যারা আমার পথ অবলম্বন করে তাদেরকে অনুসরণ করো[৪৯১]।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পিতা অমুসলিম ছিলেন, তা সত্বেও তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করেননি। তাঁকে সুকৌশলে ইসলামের দাওয়াত দেন তিনি যখন অস্বীকার করেন, সন্তানকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সুন্দর আচরন ও সালাম বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিদায় নেন।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, "পিতা-মাতা বিহিস্তে প্রবেশের মাধ্যম। অতএব তুমি চাইলে তার সেই মধ্যস্থতাকে রক্ষা করতে পার, তাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পার আর চাইলে নষ্টও করতে পার।"[৪৯২]। তিনি আরও বলেন: "আল্লাহ তা'আলর সন্তুষ্টি লাভ পিতার সন্তুষ্টি লাভের উপর নির্ভর করে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি- আক্রোশ বা ক্রোধ পিতার অসন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে"[৪৯৩]।

রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হে রাসূল (সা.) সন্তানের ব্যাপারে পিতা-মতার অধিকার কি? তিনি ইরশাদ করেন, "তারা দুজনই হচ্ছে তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম" তিনি আরও বলেন: 'যে লোক পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয় (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পিতা-মাতার সেবাযত্ন করে) তার জন্য বিহিস্তের দুটি দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। একজন হলে একটি দ্বার উন্মুক্ত হবে। আর যদি কেউ পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তবে তার জন্যে জাহান্নামের দুটো দুয়ারই খুলে যাবে আর একজন হলে একটি দুয়ার খুলবে।'

অত:পর এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন: হে রাসূল (স.) পিতা-মাতা যদি সন্তানের উপর যুলুম করে আর তার ফলে সন্তানরা তাদের নাফরমানী করে বা তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করে, তবুও কি সন্তানদের জাহান্নামে যেতে হবে?

রাসূল (সা.) এর জওয়াবে বলেন: 'হ্যাঁ, পিতা-মাতা যদি সন্তানের উপর জুলুমও করে, তবুও তাদের নাফরমানী করলে জাহান্নামে যেতে হবে।'

---

[৪৯০] আবদেল রহীম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।

[৪৯১] আল কুরআন, সুরা লুকমান ৩১ : ১৫।

[৪৯২] মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাযাহ, হাকেম।

[৪৯৩] তিরমিযী, ইব্‌ন হাকেম।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন: "আল্লাহ তা'আলা চাইলে যত গুনাহ এবং যে কোন গুনাই মাফ করে দেবেন। তবে পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের নাফরমানী করলে তিনি তা মাফ করবেন না। কেননা, এর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই এ দুনিয়াই শিঘ্নীর করে দেয়া হবে[৪৯৪]।

রাসূল (সা.) বলেছেন: "মানুষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বর পাপ সর্ম্পকে আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, তা হলো আল্লাহ তা'আলার সংগে কাউকে শরীক করা এবং পিতামাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করা"[৪৯৫]।

রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সব চেয়ে প্রিয় কাজ কোনটি ? উত্তরে তিনি বললেন: ঠিকমত নামায পড়াই তাঁর কাছে অধিক প্রিয়"। এরপর কোন কাজ অধিক পছন্দনীয় জিজ্ঞেস করা হলে রাসূল (সা.) বললেন: পিতা-মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার।"

ইসলামী দাম্পত্য আইনে পিতা-মাতার মধ্যে সন্তানের কর্তব্যের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকারের গুরুত্ব বেশী দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদের সুরা লুকমানে বলা হয়েছে:

"এবং মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি, তার পিতা-মাতার সম্পর্কে, বিশেষ করে তার মা, সেই তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব করেছে দূর্বলতার উপর আবার এক দূর্বল অবস্থার মধ্যে এবং দু'বছর মেয়াদ পর্যন্ত দুধ সেবন করিয়ে তা সম্পন্ন করেছে, কাজেই হে মানুষ! তুমি আমার ও তোমার পিতা-মাতার শোকর আদায় কর। জেনে রাখ, শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে[৪৯৬]।

আল্লাহ তা'আলা আর ও বলেন:

"এবং মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি, বিশেষত তার মা তাকে খুবই কষ্টসহকারে গর্ভেধারণ ও বহন করেছে এবং খুবই কষ্ট-যন্ত্রনাসহকারে তাকে প্রসব করেছে। এভাবে তাকে গর্ভেধারণ এবং দুধ খাওয়ায়ে লালন পালনে ত্রিশটি মাস অতিবাহিত হয়ে থাকে[৪৯৭]।

---

[৪৯৪] উপরোক্ত হাদীছ তিনটি আবুবারা (রা.) থেকে বায়হাকী দি শু'বুল ঈমান বর্ণনা করেন।

[৪৯৫] বুখারী শরীফ ফি হুকুকুল ওয়ালিদাইন।

[৪৯৬] আল কুরআন, সূরা লুকমান ৩১ : ১৪।

[৪৯৭] আলু কুরআন, সূরা আহকাফ ৪৬ : ১৫।

মানবতার বন্ধু মোহাম্মদ (সা.) বলেন: "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত[৪৯৮]। অর্থাৎ মায়ের সেবা শুশ্রুষা করলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ ও জান্নাত লাভের পথ সুগম হবে। তিনি আরও বলেন : "মায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন[৪৯৯]। এক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, কে সবচেয়ে বেশী আমার সাহাচর্য ও সেবার অধিকারী? রাসূল (স.) বললেন তোমার মা, লোকটি জিজ্ঞেস করলেন তারপর কে? রাসূল (স.) পুণরায় বললেন তোমার মা, লোকটি ৩য় বার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? রাসূল পূণরায় বললেন তোমার মা. তারপর সাহাবী ৪র্থবার জিজ্ঞেস করলেন তারপর কে? রাসূল (স.) বললেন তোমার বাবা[৫০০]।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসুদ (র.) বনেন," আমি নবী করীম (স.) কে জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কি? তিনি বললেন সময়মত নামায আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করা। রাসূল (সা.) বললেন, সে ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্য। প্রশ্ন করা হল, কে সে ব্যক্তি?

রাসূল (স.) বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার দুইজনকেই কিংবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়ে ও জান্নাত বাসী হতে পারলনা"[৫০১]। অধিকাংশ মনীষীর মতে, "সন্তানের কাছে মা বাবার চেয়ে বেশী ভাল ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী আর কেউ হতে পারেনা, কাজেই মা ও বাবার হক যখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে-এক সঙ্গে দজনেরই হক আদায় করা সম্ভব হবেনা, তখন মার হকই হবে অগ্রবর্তী[৫০২]।

উপরোক্ত হাদীছ ও পুর্ববর্তী আয়াত সমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বাবার সন্তষ্টি অপেক্ষা মার সন্তষ্টি অগ্রবর্তী এবং প্রথমত দেখার জিনিস। ইব্ন বাত্তাল বলেছেন," এর অর্থ এই যে, বাবার যা পাওনা মায়ের পাওনা তার তিন গুণ[৫০৩]। এ মতের উপরই মুসলীম ইজমাহ বা ঐক্যমত[৫০৪]। সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (স.) কে বললেন আমরা বুঝলাম পিতা-মাতার জীবিত অবস্থায় সন্তানের উপর তাদের হক রয়েছে, কিন্তু তাদের ইন্তেকালের পর সন্তানের উপর পিতা-

---

[৪৯৮] নাসায়ী শরীফ, বাবুল হুকুকুল ওয়ালিদাইনে।

[৪৯৯] বুখারী শরীফ, বাবুল হুকুকুল ওয়ালিদাইনে।

[৫০০] বুখারী শরীফ, বাবুল হুকুকুল ওয়ালিদাইন, হযরত আবু হোরায়রা(রা.) বর্ণনা করেন।

[৫০১] ,মুসলীম শরীফ বাবু হকুকুল ওয়ালিদু।

[৫০২] সুবলুস সালাম খ.৪, পৃ.১৬৪।

[৫০৩] সুবুলুস সালাম খ.১১।

মাতার হক আদায়ের বা কল্যাণকর কোন কিছু করার আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ তাদের মৃত্যুর পর ও চার পন্থায় তাদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করতে পার এবং তাদের কল্যাণ ও করতে পার:

১. তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা ও প্রার্থনা করে

২. তাদের কৃত ওয়াদা ও অসীয়ত পূর্ণ করে

৩. তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করে

৪. তাদের সূত্রে যারা তোমাদের আত্মীয় তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা[৫০৫]।

পিতা মাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কবীরা গুনাহ:

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তোমরা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা যদি যমীনে পির্যয় সৃষ্টি কর এবং রেহেম (রক্ত সর্ম্পক) ছিন্ন কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অভিসম্পাত করবেন এবং এরপর তোমাদের বধীর ও অন্ধ করে দেবেন[৫০৬]। তিনি আর ও ঘোষণা করেন-যে সব লোক আল্লাহর প্রতিশ্রুতি শক্ত করে বাঁধার পরে তা ভঙ্গ করে এবং যার সাথে সর্ম্পক স্থাপন করতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে, এরই ফলে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাদের অভিশাপ এবং তাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাপ[৫০৭]। রাসূল (স.) বলেছেন, রেহেমের সর্ম্পক কর্তনকারী বেহেস্ত প্রবেশ করতে পারবেনা[৫০৮]। রাসূল (স.) সবচেয়ে বড় গুনাহর কথা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করা এবং পিতা-মাতার সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করা, তিনি আর ও বলেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে তার পিতা মাতাকে গালাগালি করাও কবীরা গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন ব্যক্তি কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি প্রতুত্তরে বলেন, "এক ব্যক্তি কারো বাপকে গালি দেয়, পতুত্তরে সে দেয় নিজের বাপকেই গালি, এমনিভাবে কেউ অপর ব্যক্তির মাকে গালাগাল করে, পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি নিজের মাকে গাল দেয়। রাসূল (স.) আরও বলেন-নিজের বাপমার উপর অভিসম্পাত করা সবচেয়ে কবীরা গুনাহ[৫০৯]। তিনি বলেন- নিশ্চয়ই

---

[৫০৪] হারিস মোহাসিবী।

[৫০৫] আদাবুল মুফরাদ।

[৫০৬] আলকুরআন সুরা মহাম্মদ ৪৭ : ২২-২৩।

[৫০৭] আলকুরআন সুরা রায়াদ ১৩ : ২৫।

[৫০৮] বুখারী, মুসলীম শরীফ।

[৫০৯] আল কুরআন, বাকারা ২ : ২২৫।

আল্লাহ তা'আলা মায়েদের সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা ও তাদের হক নষ্ট করাকে চির দিনেরতরে হারাম করে দিয়েছেন[৫১০]। কোন ব্যক্তির পক্ষে তার পিতার বন্ধু বান্ধবদের সাথে ভাল ব্যবহার ও সম্মান করাটাও রেহেমের সর্ম্পক সৃষ্টি কারী কাজ[৫১১]। অতএব পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যেমন কবীরা গুনাহ তেমনি তাদের বন্ধু-বান্ধব ও তাদের মাধ্যমে যাদের সাথে আত্মীয়তা, সকলের সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করা ও গুরুতর অপরাধ। ইসলাম সাম্য মৈত্রীর র্ধম। ইসলাম সৃষ্টিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। ভাঙ্গন ও বিশৃখলা সৃষ্টি ইসলামী দাম্পত্য আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সন্তানের ধন-সম্পদে পিতা-মাতার হক:

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 'হে রাসূল! লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কোথায় ধন-মাল ব্যয় করবে তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তা করবে পিতা-মাতার জন্য, নিকটাত্মীয়দের জন্য, ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের জন্যে[৫১২]। অর্থাৎ সন্তানের অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সর্ব প্রথম খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই কারণে যে, সন্তানের অর্থ সম্পদের উপর, পিতা-মাতার যে অধিকার রয়েছে, তা আদায় করা সন্তানের উপর ওয়াজিব। কেননা এ পিতা-মাতাই হচ্ছে সন্তানের এ দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভের ব্যহ্যিক কারণ ও মাধ্যম[৫১৩]।

রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, "সন্তান পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ, অতএব তোমরা পিতা-মাতার সন্তানদের ধন-সম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ সহকারে পানাহার কর"[৫১৪]। এক ব্যক্তি রাসূল (স.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার মাল-সম্পদ রয়েছে, আর সন্তান-সন্ততি ও রয়েছে, কিন্তু এমোতাবস্থায় আমার বাবা আমার মাল নিতে চায়, এই সম্পর্কে রায় কি? রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, তুমি আর তোমার মাল-সম্পদ সবই তোমার বাবার[৫১৫]। উপরোক্ত হাদীছ সমূহের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পিতা তার সন্তানের মাল সম্পদ ন্যায়ত অংশীদার।

---

[৫১০] বুখারী-মুসলীম শরীফ।

[৫১১] মুসলীম ও আবুদাউদ শরীফ।

[৫১২] বুখারী-মুসলীম শরীফ।

[৫১৩] নওয়াব সিদ্দীক হাসান, ফতহুল বয়ান খ.১, পৃ. ২৭২।

[৫১৪] হাদীছ শরীফ মুসনাদ আহমদ।

[৫১৫] ইব্‌ন মাযাহ।

অতএব সন্তান অনুমতি দিক আর নাই দিক, পিতা তার সন্তানের মাল-সম্পদ থেকে পানাহার করতে পারে এবং তা নিজের মালের মতই ব্যয়-ব্যবহার করতে পারে, যতক্ষণ না সে ব্যয়-ব্যবহার অযথা বেহুদা ও নিবুদ্ধিতার খরচের পর্যায়ে পড়ে[৫১৬]।

ইমাম শাওকানী আর ও বলেন-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ পিতা-মাতার জন্যে অর্থ ব্যয় করা স্বচ্ছল অবস্থায় সন্তানের পক্ষে ওয়াজিব, এ সম্পর্কে শরী'আতবিদদের ইজমাহ হয়েছে[৫১৭]। রাসূল (স.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পিতা-মাতার ধনমাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দায়ী, সে দায়ীত্ব যতাযথভাবে পালন করা হল কিনা সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জবাব দিহী করতে হবে, জিজ্ঞাসাবাদের একাজ ইহকাল-পরকাল সব যায়গায়ই হতে পারে[৫১৮]। অতএব উপরোক্ত আলোচনায় একথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, সন্তানের অর্জিত ধন-সম্পদে পিতা-মাতার হক রয়েছে। আর পিতা-মতার অর্জিত ধন-সম্পদেও সন্তান-সন্ততির হক রয়েছে। বস্তুত প্রত্যেককে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

পিতা-মাতার খিদমত ও জিহাদে যোগদানঃ

হযরত আবুদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলের (স) কাছে জিহাদে যোগদানের অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি? লোকটি বললেন জী জীবিত আছেন। তখন রাসূল করীম (স.) বললেন, তাহলে তুমি তাঁদের খেদমতে প্রাণ-পণে লেগে যাও। এটাই তোমার জিহাদ"[৫১৯]। অপর এক হাদীসে হাজেম নামক এক সাহাবী বললেন, আমি রাসুলের কাছে জিহাদে যোগদানের পরামর্শ চাই, তিনি জানতে চাইলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কিনা? আমি বললাম হ্যাঁ, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তোমার মার সম্মান ও খেদমতে লেগে যাও। কেননা তাঁর দু' পায়ের তলাতে তোমারবেহেস্ত রয়েছে[৫২০]।

"একদা এক দুধর্ষ বেদুইন, সাহাবী বেষ্টিত নবী (স.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সঙ্গে মিলে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে ভালবাসী এবং আপনার

---

[৫১৬] ইমাম শাওকানী, নাইলুল আওতার, খ.৬, পৃ. ১১৭।

[৫১৭] নাইলুল আওতার, খ.৬, পৃ. ১১৭।

[৫১৮] বুখারী শরীফ .।

[৫১৯] বুখারী শরীফ, কিতাবুল জিহাদ।

সম্মুখে নিহত হতেও পছন্দ করি। রাসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাপ-মায়ের কেউ জীবিত আছেন কি?' লোকটি বললেন হ্যাঁ, তখন রাসূল (স.) তাকে বললেন,

"তাহলে তুমি ফিরে যাও, পিতা-মাতার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হও এবং তাদের জন্য কল্যাণকর কাজ কর, আর আল্লাহ তা'আলা ও তোমার বাপ-মায়ের শোকর আদায় কর।' সে আবার বললো, আমি তো যুদ্ধ করার শক্তি রাখি এবং শত্রুর সাথে লড়াই করতে ভালবাসি। তখন রাসূল (স.) বললেন, 'যাও তোমার বাপ-মায়ের সাথে গিয়ে বসবাস কর"[৫২১]। আবুদাউদের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজরত করে রাসুলের কাছে বসাবস করার জন্য ও জিহাদে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্য মদীনায় এসে উপস্থিত হল, রাসুলে করীম (স.) জিজ্ঞেস করলেন বাড়ীতে তোমার কে কে আছে? সে বললো, বাপ-মা সবই আছেন। তখন নবী করীম (স.) বললেন, তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দুজনের কাছে অনুমতি চাও। অনুমতি দিলে জিহাদে এসে শরীক হবে, আর অনুমতি না দিলে তুমি তাদেরই কল্যাণময় খেদমতের কাজে লেগে থাকবে[৫২২]।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহের দলীল ভিত্তিক আলোচনা থেকে এ কথাটি পরিস্কার হয়ে যায় যে, মানব সৃষ্টি জগতের মধ্যে মাতা-পিতার স্থান সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা এবং রাসুলের পরপরই পিতা-মাতার নির্দেশ পালন অপরিহার্য। অতএব সংক্ষেপে;

১. "গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে পিতা-মাতার মর্যাদা সর্বোচ্চ।

২. পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার ও তাদের সেবা যত্ন করা আল্লাহ তা'আলার অলংঘনীয় নির্দেশ।

৩. তাদের বৃদ্ধ বয়সে তাদের সাথে এমন কোন আচরণ করা যাবেনা, যাতে তাদের মুখ দিয়ে উহ্ শব্দ বের হয়।

৪. তাদের সংগে কথা বলতে হবে আদবের সাথে, আচরণ করতে হবে সম্মানজনক ভাবে।

৫. তাদের নিকট সবসময় নম্র ও বিনীত থাকতে হবে।

৬. তাদের জন্যে আল্লাহর শিখানো ভাষায় দোয়া ও ক্ষমা প্রর্থনা করতে হবে।

---

[৫২০] নাসাই শরীফ, মুসনাদ আহমদ।

[৫২১] উমদাতুল কারী, শরহুল বুখারী, খ.১৪, পৃ. ২৫১।

[৫২২] উমদাতুল কারী, খ.১৪, পৃ. ২৫১, সহাহ্ ইবন হাব্বান।

৭. পিতা-মাতা যদি শির্কের দিকে নিয়ে যেতে চায়, সে অবস্থায় তাদের আনুগত্য করা যাবেনা, তবে মুশরীক পিতা-মাতার সাথেও ভাল ব্যবহার করতে হবে।

৮. পিতার চাইতে মায়ের অধিকার তিনগুন বেশী, মায়ের পরই পিতার অধিকার।

৯. পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করা যাবেনা।

১০. পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ।

১১. পিতা-মাতার অকৃতজ্ঞ হওয়া জাহান্নামের কাজ।

১২. তাদের শুকরিয়া আদায় করা জান্নাত লাভের উপায়।

১৩. তাদের অভিশাপ দেয়া কবীরা গুনাহ।

১৪. সন্তানের উপার্জিত সম্পদে তাদের অধিকার রয়েছে।

১৫. তাদের মৃর্ত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে, তাদের ওয়াদা-ওসীয়ত পুরণ করতে হবে। তাদের বন্ধু-বান্ধবদের তাযীম করতে হবে এবং আত্মীয়ের সাথে সর্ম্পক অটুট রাখতে হবে"[৫২৩]।

–:শেষ:–

---

[৫২৩] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত , পৃ. ৯০।

গ্রন্থপঞ্জী

আ

১. আল কুরআনুল-কারীম : খাদেমুল হারামাইনিশ শরিফাইন বাদশা ফাহাদ ইব্ন আবদুল আজীজ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ৩৫৬১ মদীনা মুনাওয়ারা, ১৪১৩ হি.।

২. আল কুরআনুল কারীম : ফরিদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনূদিত, ঢাকা-১০০০, মার্চ' ১৯৯০ খৃ.।

৩. আল্-বাস্ সাস : আহকামুল কুরআন, খ.২।

৪. আবদেল রহিম উমরান : ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, শামসুল আলম অনূদিত, প্রকাশনায় - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আই,ই,এম, ইউনিট জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এর যৌথ প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর' ১৯৯৫ খৃ.।

৫. আব্দুল গাফ্ফার হাসান নদভী : এন্তেখাবে হাদীছ খ.১ ও খ.২, আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫, শিরিশদাসলেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ , মার্চ' ২০০২ খৃ.।

৬. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) : গুনিয়াতুত তালেবীন।

৭. আল্লামা পানি পতি (র.) : তাফসীর মাজহারী।

৮. আল্লামা কুরতুবী (র.) : তাফসীর কুরতুবী

৯. আল্লাআ শাওকানী (র.) : ফতহুল কাদীর

১০. আহম্মদ মুস্তফা আল মারাগী : তাফসীর মারাগী, খ.২

১১. আল্লামা শাওকানী : নাইনুল আওতার শরহি মুনতাকীল আল-আখবারু।

১২. আবুল কাশেম ভুঁইয়া, অধ্যাপক : যুগ জিজ্ঞাসা ও পরিবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭ খৃ.।

১৩. আব্দুল হাই ,আবুসলীম মুহাম্মদ : হায়াতে তাইয়্যেবাহ

১৪. আব্দুস শহীদ নাসিম : ইসলামের পারিবারিক জীবন। আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশদাসলেন,বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ৬ষ্ঠ প্রকাশ-জুলাই' ১৯৯৬ খৃ.।

১৫. আল্লামা খতীব আযম : ফিকহুল ইসলাম ।

১৬. আতীকুর রহমান ও দিলরওশন জিন্নাত আরা নাজনীন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী'১৯৯৩ খৃ.।

১৭. আলী রেজা ,কাজী : নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনায়, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা। প্রকাশ কাল: সেপ্টেম্বর' ১৯৯৮ খৃ.।

১৮. আবদুল কাদের, ড. : ইসলাম ও নারী সমস্যা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা-১০০০, ১৯৮১ খৃ.।

১৯. আব্দুল হামিদ ,দেওয়ান : ইসলাম প্রসঙ্গ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০, নভেম্বর' ১৯৮০ খৃ.।

২০. আবুল খায়ের সিদ্দিকী : কোরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন। সোলেমানীয়া বুক হাউস, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স ঢাকা, প্রকাশকাল-জুন' ১৯৯৯ খৃ.।

২১. আবুল কালাম আজাদ : ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, নুরুদ্দীন আহম্মদ অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০, জুন'১৯৮১ খৃ.।

২২. আবদুর রহিম, মাও. মোহাম্মাদ : পরিবার ও পারিবারিক জীবন, খায়রুন

প্রকাশনী , ৯ম প্রকাশ মার্চ' ২০০০ খৃ. ।

২৩. আশ্রাফ আলী থানভী, মাও. (র.): দাম্পত্য জীবনে ইসলামী রীতিনীতি, মুজীবুর রহমান অনূদিত, এমদাদিয়া লাইব্রেরী,৩৮-বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ফেব্রুয়ারী' ২০০২ খৃ. ।

২৪. আবদুল লতিফ, মোহাম্মদ : পি এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ২০০১, ২৯১, ২১৩, LAS.C.1.

২৫. আজরফ দেওয়ান, মোহাম্মদ : জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০, ফেরুয়ারী' ১৯৭৭ খৃ. ।

২৬. : আবু দাউদ শরীফ

২৭. আবদুর রহীম ,মাও,মোহাম্মাদ : হাদীছ শরীফ খ.৩ খায়রুন প্রকাশনী, ১০/ই-এ/১ মধুবাগ নয়াটোলা, ঢাকা-১২১৭, এপ্রিল' ১৯৯৭ খৃ. ।

২৮. আস'আদ গীলানী, ড.সায়্যেদ : ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী। আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭, ৩য়- সংস্করণ, ডিসেম্বর' ১৯৯৮ ।

২৯. আবুল আ'লা-মওদূদী (র.),সায়্যেদ : তাফহীমুল কুরআন।

৩০. আবদুল হাই ,শেখ মুহাম্মদ : নারী অধিকার, মাহবুব প্রকাশনী,ঢাকা, ১ম মুদ্রণ-১লা জানুয়ারী' ২০০০ খৃ. ।

৩১. আবুল আ'লা- মওদুদী ,সায়্যেদ (র.): আধুনিক নারী ও ইসলামী শরী'আত, আব্দুস শহীদ নাসিম সংকলিত, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা,১ম প্রকাশ-ডিসেম্বর' ২০০১ খৃ. ।

৩২. আবুল আ'লা মওদুদী ,সায়্যেদ (র.): ইসলামের জীবন পদ্ধতি। আবদুর রহীম অনূদিত আধুনিক প্রকাশনী,২৫-শিরিশদাসলেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। জুন'২০০১ খৃ.।

৩৩. আবুল আ'লা মওদুদী, সায়্যেদ (র.): ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, আবদুর রহীম অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫, শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ১২শ প্রকাশ-আগষ্ট' ২০০০ খৃ.।

৩৪. আবুল আ'লা-মওদুদী ,সায়্যেদ (র.): ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রন, আবদুল খালেক অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫,শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, সেপ্টে' ১৯৯৬ খৃ.।

৩৫. আবুল আ'লা-মওদুদী ,সায়্যেদ (র.): ইসলাম পরিচিতি। অনুবাদঃ ছৈয়দ আবদুল মান্নান। আধুনিক প্রকাশনী, ২৫,শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, জানু'১৯৭৭ খৃ.।

৩৬. আবুল আ'লা-মওদুদী ,সায়্যেদ (র.): পর্দা ও ইসলাম, আব্বাস আলী খান অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫-শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ৫ম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী' ২০০০ খৃ.।

৩৭. আবুল আ'লা-মওদূদী,সায়্যেদ (র.): রাসায়েল মাসায়েল খ.১, আধুনিক প্রকাশনী ২৫-শিরিশদাশলেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৩৮. আবুল আ'লা- মওদুদী, সায়্যেদ (র.): স্বামী স্ত্রীর অধিকার, মুহাম্মদ মুসা অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫-শিরিশদাসলেন বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ৮ম প্রকাশ-আগষ্ট' ২০০১ খৃ.।

ই

৩৯. ইউছুফ আল-কারযাভীর : ইসলামে হালাল-হারামের বিধান। আব্দুর রহিম অনূদিত। খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ, জানুয়ারী' ১৯৯৯ খৃ.।

৪০. ইলমুল আরাবী : আহকামুল কুরআন।

৪১. ইউছুফ ইসলাহী,আল্লামা : মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার, আবদুল কাদের অনূদিত ,আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ প্র.এপ্রিল' ২০০০খৃ. ১ম প্রকাশ- জুন' ১৯৮১ খৃ.।

৪২. ইব্‌ন কুদামাহ : আল-মাকসাদী মিনহাজুল কাসেদীন।

৪৩. ইব্‌ন রুশদ : বিদায়াতুল মুজতাহিদা।

৪৪. ইমাম মালেক (র.) : আল মুয়াত্তা।

৪৫. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ খ.৫। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর' ১৯৯৩ খৃ.।

৪৬. ইমাম তিরমিযী (র.) : জামি তিরমিযী শরীফ।

৪৭. ইমাম বুখারী (র.) : সহীহ বুখারী শরীফ।

৪৮. ইমাম নববী (র.) : রিয়াদুস্ সালেহীন।

৪৯. ইউসুফ ইসলাহী : আসান ফিক্‌হ খ. ১-২, আব্বাস আলী খান অনূদিত ও সম্পাদিত, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, ৫ম মুদ্রণ-রবিউল আউয়াল' ১৪২২ হি.।

৫০. : ইব্‌ন মাযাহ।

এ

৫১. এহতেশাম সারওয়ার (এম,এম), অধ্যাপক : স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন ও মিলন তত্ত্ব;

সোলেমানিয়া বুক হাউস,বায়তুল মুকাররম ঢাকা-১০০০, সেপ্টেম্বর' ২০০০ খৃ.।

ক

৫২. কুদরত উল্লাহ ফাতেমী,সৈয়দ : কুরআনের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা, ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পাকিস্তান।

৫৩. : নাসাই শরীফ।

জ

৫৪. জলীল আহসান নদভী : রাহে আমল, খ.১ ও খ.২ খন্ড, আব্দুল খালেক অনূদিত, মুরাদ পাবলিকেশন্স, ৩৩২-ছনটেক যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪, মে' ১৯৯৭ খৃ.।

৫৫. জালালুদ্দিন আনসার উমরী, সায়্যেদ : ইসলামী সমাজে নারী, মোজাম্মেল হক অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫-শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০, মে'১৯৯৭ খৃ.।

৫৬. জাতিসংঘ বাংলাদেশ মিশন : নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক মর্যাদা হানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন।

ত

৫৭. তমিজুল হক, ব্যরিষ্টার : ইসলামে ব্যক্তি ও গণ আইন। প্রকাশক: সৈয়দ ফারুক আজম, ৮৫- এ, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা। প্রকাশ কাল: জানুয়ারী' ১৯৯৩ খৃ.।

৫৮. তমিজুল হক , ব্যরিষ্টার : ইসলামে নাগরিক ও মানবাধিকার। প্রকাশক: সৈয়দ ফারুক আজম, ৮৫-এ,নিউ ইস্কাটন ,ঢাকা , প্রকাশকাল: মে' ১৯৮১ খৃ.।

৫৯. তমিজুল হক, ব্যারিষ্টার : ইসলাম জাতীয়তাবাদ ও সংবিধানের সার্বভৌমত্ব, প্রকাশক: সৈয়দ ফারুক আজম, ৮৫/এ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-২, মার্চ' ১৯৮৬ খৃ.।

৬০. তমিজুল হক, ব্যারিষ্টার : সেনানায়ক মহানবী (স.) যুদ্ধ ও শান্তি। প্রকাশক সৈয়দ ফারুক আজম, ৮৫/এ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-২, এপ্রিল' ১৯৮২ খৃ.।

৬১. তমিজুল হক ,ব্যারিষ্টার : ইসলাম ও সমকালীন আইন এবং ইহাদের তুলনামূলক বিচার। প্রকাশক: সৈয়দ ফারুক আজম, ৮৫/এ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-২,এপ্রিল '১৯৮৯ খৃ.।

৬২. তমিজ উদ্দিন ,অধ্যাপক : পরিবার কল্যান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০, ১৯৯৭ খৃ.।

দ

৬৩. দেলোয়ার হোসাইন, সাঈদী : ইসলামী সভ্যতায় নারীর মর্যাদা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। মে' ১৯৮১ খৃ.।

ন

৬৪. নুরুল ইসলাম মানিক(সংকলিত): ইসলামী দর্শনের রুপরেখা।
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-
ফেব্রুয়ারী' ১৯৮২ খৃ.।

৬৫. নাসীর হোসাইন নক্শ বন্দী ও আখতার হাকীম : ইসলামী দুলহান বা নব দম্পতির শ্রেষ্ঠ উপহার। মাহবুবুর রহমান অনূদিত, নিউ সুফিয়া লাইব্রেরী, বায়তুল মোকার্‌রম, ঢাকা-১০০০, জানুয়ারী' ১৯৯৭ খৃ.।

প

৬৬. পরিমল ভূষন কর : সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুন' ১৯৮৮ খৃ.।

ফ

৬৭. ফরীদ ওয়াজদী : আল মারআতুল মুসলিমাহ।

৬৮. ফজলুর রশীদ খান : বাংলাদেশের সমাজতত্ত্ব, শিরীন পাবলিকেশন্স, জুলাই' ১৯৭৪ খৃ.।

৬৯. ফজলুর রহমান শেখ : আদর্শ জীবনের নিরীখে ইসলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুলাই' ১৯৮০ খৃ.।

৭০. ফজলুর রহমান,ড.মোহাম্মদ : আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান। রিয়াদ প্রকাশনী, ৭৬৬ - নাখালপাড়া, ঢাকা, মার্চ' ২০০১ খৃ.।

ব

৭১. বদরুদ্দীন আইনি : উমদাতুল কারী-শরহিবুখারী।

৭২. বায়হাকী (র.) : আহকামুল কুরআন।

৭৩. বাংলাদেশ মসজিদ মিশন : আধুনিক বিশ্ব সমস্যার প্রেক্ষাপটে ইসলাম-২, ২৫শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী'২০০২ খৃ.।

ম

৭৪. মাহবুবুর রহমান, সৈয়দ : মা ও শিশু সাস্থ্য পরিচর্যা এবং পরিবার কল্যাণে ইসলাম, রচনা ও সম্পাদনায় : । আই,ই,এম, ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। প্রকাশকাল ১৯৮৯ খৃ.।

৭৫. মুস্তফা আস্ সাবায়ী, ড. : আল-মারয়াতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন।

৭৬. মোহাম্মদ কুতুব : ইসলাম ও নারী। আধুনিক প্রকাশনী, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫- শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০,

৭৭. মুশাহিদ আলী : ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার। উমর আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০, সেপ্টে' ১৯৮০ খৃ.।

৭৮. মোহাম্মদ কুতুব : ধর্ম কি অচল হয়েছে? আখতার ফারুক অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা- ১০০০, মার্চ- ১৯৯৮ খৃ.।

৭৯. মুহাম্মদ শাফী' (র.) মাও.মুফতী : মা'আরেফুল কুরআন, মহিউদ্দিন খান অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০।

৮০. মুহাম্মদ শাফী' (র.) মাও.মুফতী : পবিত্র কুরআনুল কারীম , মহিউদ্দীন খান অনূদিত। সউদী আরবের মহামান্য খাদেমুল হারামাইনিশ শরীফাইন বাদশা ফাহাদ ইব্ন আবদুল আজীজের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। বাদশা ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প। ৩৫৬১ মদীনা মুনাওয়ারা ১৪১৩ হি.।

৮১. মুহাম্মদ নুরুয্যামান : সংগ্রামী নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫-শিরিশদাসলেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ২য়-সংস্করণ জানুয়ারী' ১৯৯৭ খৃ.।

র

৮২. রাগিব-আল ইস্পাহানী : আল কিতাবুল মুফরাদাতু ।

শ

৮৩. শামসুর রহমান, গাজী : ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। জুন'১৯৮৯ খৃ.।

৮৪. শফিকুর রহমান, মোহাম্মাদ : ইসলাম ও পারিবারিক জীবন।

আই,ই,এম,ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা। ৩য় সংস্করণ-মার্চ' ১৯৯৭ খৃ.।

৮৫. শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) : আদর্শ মুছলিম পরিবার ও উহার সুষ্ঠু পরিকল্পনা। ২৭৯/১-এ তিলপাপড়া, খিলগাঁও, ঢাকা-১০০০ ।

৮৬. শাহ্ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (র.) : হজ্জাতুলাহিল বালেগাহ।

৮৭. শামসুন্নহার নিজামী : আদর্শ সমাজ গঠনে নারী। আধুনিক প্রকাশনী ২৫-শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ , আগষ্ট' ২০০০ খৃ.।

৮৮. : আল-মারয়াতু বাইনাল ফিকহী ওয়াল কানুন, ফি বাইতি ওয়াল মুজতামিউ।

স

৮৯. সিদ্দীক হাসান ,নওয়াব : তাফসীর আল -ফতহুল বয়ান।

৯০. : তাফসীর রুহুল মায়ানী।

৯১. : তাফসীর ইব্‌ন কাসীর।

৯২. : তাফসীর মুহাসিনুত্ তায়া'বীল।

৯৩. : তাফসীর বায়জাবী।

৯৪. : তাফসীর কাশ্‌শাফ।

৯৫. : তাফসীরুল আন্‌ওয়ারুত্ তানযীল ও আসরারুত্ তা'বীল।

৯৬. সায়্যেদ কুতুব : কালজয়ী আদর্শ ইসলাম। নাজির আহমদ অনূদিত, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা-১০০০, জুন'১৯৮০ খৃ.।

হ

৯৭. হোসনি আরা মারিয়াহ : ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন'১৯৮১ খৃ.।

৯৮. হাবিবুর রহমান খান, জাষ্টিস : আপন ঘর বাঁচান। মাকতাবাতুল আশরাফ, কুষ্টিয়া জেলা শাখা, প্রকাশকাল: জানুয়ারী ১৯৯৭ খৃ.।

৯৯. : নুরুল ইয়াকীন ফি সীরাতু সায়্যেদুল মুরসালীন ১০/ই- এ/১,মধুবাগ, নয়াটোলা, ঢাকা-১২১৭

১০০. : ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ।

১০১. : ফাতওয়ায়ে শামী- খ.২।

১০২. : বলুগুল আমানী ফি-শরহিল মা'আনী।

১০৩. : ফতহুর রাব্বানী মুসনাদ আহমাদ।

১০৪. : মিসকাতুল মাসাবীহ।

১০৫. : মুয়ালিমুস্ সুনান ফি-শরহি আবু দাউদ

১০৬. : রুদ্দল মুখতার আল দুররুল মুখতার

১০৭. : লুগাতুল কুরআন

১০৮. : সুবুলুস্ সালাম শরহি বুলুগুল মারাম।

১০৯. : সহীহ আল বুখারী ,খ.৫, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫-শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

110. Al-Faraid : Arabic-English Dictionary a.J.G. Have, S.J Fifth Edition.

111. Ahmed Deadest : Muhammed The Natural

Successor To chariest, Abul-Qasim Publishing House.

112. Abdullah Yousuf Ali : Translation of the Holy Quran with commentary.

113. Abdul Aziz Shah Falwa (Cited in Ahmed) : Rabat Proceedings, Vol-1-1974Eng.

114. Abdul wahid Mustafa : Al-Usrah- Fil -Islam 3rd eddition, Darel- itisam, cairo 1980 Eng.

115. Abdullah Sheikh M. Al-Mubarak : Al-Islam watanzim al- wahidiyya, in Rabat Proceedings Vol-2, 1974 Eng.

116. (Al-Azhar unversity) : Academy (High) of Islamic Research Proceeding of conferences 1964, 1965 Eng.cairo.

117. A.S. Horn : Oxford Advanced Learners Dictionary. Calcutta: Oxford University Press. Delhi Bombay Madras. Fourth Edition, 1989 Eng.

118. Board of editors : Encyclopaedia of Britannica International book number 0-85229-633-9, 1901 Eng.

119. Board of editors : Arab central Bureau of statistics and document nation, statistical year book, Amman 1982 Eng.

120. Board of Researchers : Scientific Indications in the Holy Quran. Islamic Foundation Bangladesh, June 1995 Eng.

121. Bangla Academy : English-Bangla Dictionary, Bangla Academy, Dhaka-1000 January`2002 Eng.

122. Elias A Elias : The Dictionary Arabic-English, , Taj Company.

123. Jemes Hesting Edited : Encyclopaedia of Religion and Ethics werles scribrs sours Ny.1901Eng.

124. J Milton Cowan : A Dictionary of modern written Arabic, Third Edition .

125. Leiden E.J. Brill : Encyclopaedia of Islam Vol. IV, Netherlands.

126. Marmaduke pickthall Md.: Holy Quran, English translation, Md. Marmaduke pickthall and Urdu translation Mau. Fateh Md.Jallendary, Kutub khana ishayat- ul- Islam (Regd) 3755, Churiwalan, Delhi- 110006. 10th edition July’ 1981 Eng.

127. Macmillan Publication : Encyclopaedia of Religion Vol.5. 866-Third Avenue. Ny10022. 1987 Eng.

128. Shafiul Haq : An introduction to the ideology

of Islam,Islamic foundation Bangladesh,Dhaka-1000, June' 1985 Eng.

129. : Spoken Language Services, Inc.

130. : Tansim Al-Usrah watanzimal-Nasl. Darul-Fikr Arabi-1976 Eng.

THE END